শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী [দা. বা.]

ইসলাহী খুতুবাত

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ উমায়ের কোব্বাদী
উস্তাযুল হাদীস ওয়াত্‌তাফসীর মাদরাসা দারুর রাশাদ
মিরপুর, ঢাকা।
ইমাম ও খতীব বাইতুল ফালাহ জামে মসজিদ
মধ্যমণিপুর, মিরপুর ঢাকা।

দারুল উলূম লাইব্রেরী
[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

পাপাচারের প্রতি আকর্ষণ ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়

বিষয় .... পৃষ্ঠা

নিজের ভাবনা ভাবুন

পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়

বিষয় .... পৃষ্ঠা

দ্বীনী মাদরাসাসমূহ দ্বীন হেফাযতের সুদৃঢ় কেল্লা

রোগ-শোক, দুঃখ-দুশ্চিন্তাও আল্লাহর নেয়ামত

হালাল উপার্জন ধরে রাখো

সুদি পদ্ধতির করুণ বাস্তবতা এবং তার বিকল্প–পদ্ধতি

আর নয় সুন্নাত নিয়ে উপহাস

তাকদীর : একটি নিরাপদ ঠিকানা

বিষয় .... পৃষ্ঠা

ফেতনার যুগ : চেনার উপায় ও বাঁচার কৌশল

বিষয় .... পৃষ্ঠা

মরার পূর্বে মরো

বিষয় .... পৃষ্ঠা

অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন থেকে বেঁচে থাকুন

আধুনিক লেনদেন এবং উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব

পাপাচারের প্রতি আকর্ষণ ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়

"পশ্চিমাবিশ্বের বর্তমান সমাজে যৌনাবেগকে কাজে লাগানোর সকল অস্বাভাবিক পথ ও পন্থা অবলম্বিত হয়েছে। তবুও ধর্ষণের মত নারকীয় ঘটনা তাদের সমাজেই বেশি ঘটছে। প্রশ্ন হলো, যে দেশে যৌনক্ষুধা মেটানোর সকল পথ উন্মুক্ত, চোখ তুললেই যে দেশের মানুষ উদ্দাম যৌনতা হাতের কাছে পাচ্ছে, সে দেশে ধর্ষণের ঘটনা কেন ঘটবে?

আসল কথা হলো, তাদের মন অস্থির, কোনো কিছুতে স্বস্তি পাচ্ছে না। পারস্পরিক সন্তুষ্টির মাধ্যমে যৌনক্ষুধা মিটিয়েও শান্তি পাচ্ছে না। তাই একটু সুখের জন্য, খানিকটা তৃপ্তির জন্য যৌনতার আরেক বীভৎস রূপ তারা আবিষ্কার করেছে। ধর্ষণ, জোরপূর্বক যৌনক্ষুধা নিবারণ– এ পথেই তারা সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবুও তাদের জীবনে সুখ নেই, স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। এ জন্যই আমরা বলি, মূলত চাহিদার শেষ নেই, আত্মতৃপ্তির অন্ত নেই, কামনা-বাসনার সীমারেখা নেই।"

পাপাচারের প্রতি আকর্ষণ
ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, দোযখকে কামনা-বাসনার বস্তু দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে আর জান্নাতকে ঢেকে দেয়া হয়েয়ে কষ্টদায়ক বস্তু দ্বারা।

পর্দার আড়ালে জান্নাত ও জাহান্নাম

দুনিয়াটা পরীক্ষার হল। আল্লাহ তাকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। বিবেকবান মানুষ আপন বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগাবে, পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করবে। যদি জাহান্নামকে চাক্ষুষ দেখানো হতো আর বলা হতো, দেখো, এটা জাহান্নাম, অগ্নিজিহ্বা লকলক করছে। অনুরূপভাবে জান্নাতকেও যদি সরাসরি দেখানো হতো, তার আকর্ষণীয় নেয়ামতগুলো ও নয়নাভিরাম দৃশ্যগুলো যদি চোখের সামনে মেলে ধরা হতো– তারপর যদি বলা হতো, হে মানুষ! এ দু'টির একটি তোমাদের গ্রহণ করতে হবে। বেছে নাও, কোনটি গ্রহণ করবে। এরপর সে পথে চলতে থাক। তাহলে সেটা তো পরীক্ষা হতো না। সফলতা কিংবা

বিফলতার জন্য আল্লাহ সিস্টেম রেখেছেন পরীক্ষার। তিনি জান্নাত তৈরি করেছেন, জাহান্নামও সৃষ্টি করেছেন। জাহান্নামকে পর্দার আড়ালে রেখেছেন, জান্নাতকেও পর্দার আড়ালে রেখেছেন। জাহান্নামের পর্দাটির নাম 'কামনা-বাসনা'। আর জান্নাতের পর্দাটির নাম অপছন্দনীয় ও পীড়াদায়ক বস্তু। যেমন– লোভ-লাভঘেরা এ পৃথিবীতে মানুষ বিলাসিতা খুঁজে বেড়ায়, এর জন্য অবৈধ পন্থার আশ্রয় নেয়। তখন এর অর্থ হলো, সে জাহান্নামের পর্দা খুলে ফেলেছে। এবার সে ধীরে ধীরে সেখানে চলে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে সকাল-সকাল জাগ্রত হওয়াকে মানুষ কষ্টদায়ক মনে করে। তারপর মসজিদে গিয়ে ফজর নামায পড়া, যিকির-আযকার করা, গুনাহসমূহ থেকে দূরে থাকা, প্রভৃতি বিষয়কে তো আরও কঠিন মনে করে। অথচ জান্নাত এগুলোর ভেতরেই লুকায়িত। এগুলো জান্নাতের পর্দা, এগুলো খুলতে পারলে জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম হয়ে যাবে।

জাহান্নামের স্ফুলিঙ্গ কিনে এনেছ

সুতরাং কামনা-বাসনার সঙ্গে যার সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হবে, জাহান্নামের পথ তার জন্য তত সুগম হবে। কামনা-বাসনায় তাড়িত হয়ে যদি দিশেহারা হয়ে যাও, জাহান্নামের এ পর্দাটা যদি নিজের জন্য উন্মুক্ত করে দাও এবং এজন্য যদি বৈধ-অবৈধের তারতম্য ভুলে যাও, তবে মনে রেখো, জাহান্নাম তোমার দিকে হা করে আছে, তোমাকে সে গিলে ফেলবে। যেমন তোমার মন খেলাধুলাপ্রিয়। তাই বহু কষ্ট স্বীকার করে, টাকা-পয়দা খরচ করে খেলনা-সামগ্রী ছাড়া তুমি ড্রয়িংরুম, বেডরুমসহ গোটা বাসাটা সাজিয়ে তুলেছ। নিজের ছেলে-মেয়ের জন্য এগুলো কিনে এনেছ, তাদেরকে তোমার এ প্রিয় জিনিসের দিকে আকৃষ্ট করে তুলেছ– এজন্য কত কিছুই-না করেছ। মূলত এটা তোমার খেয়ালিপনা। নিজ কামনা পূর্ণ করার জন্য এক অযৌক্তিক মানসিকতা। এর দ্বারা মূলত জাহান্নামের পাথেয় জোগাড় করেছ। জাহান্নামের অঙ্গার খরিদ করে এনেছো। নিজের এবং ছেলেমেয়েকে সেদিকেই ঠেলে দিচ্ছ। যেখানে উচিত ছিলো জান্নাতের চিন্তা করার, সেখানে তুমি জাহান্নামের পাথেয় জোগাড় করে সেদিকেই চলেছো। আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করুন। আমীন।

জান্নাতের পথ

প্রবৃত্তির কামনার বিপরীতে চলা অবশ্যই কষ্টের কাজ। কিন্তু জান্নাত তো এর ভেতরেই রাখা হয়েছে। যেমন মানুষের মন ইবাদত করতে চায় না, আল্লাহর নির্দেশ মানতে চায় না। অথচ এ ইবাদতের পথই জান্নাতের পথ। যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির কামনাকে পিষে ফেলতে পারবে এবং শত বাধাকে দলিত

করে ইবাদতের পথে চলতে পারবে, সে এ পথে সোজা জান্নাতে গিয়ে পৌছুবে।

শিরায়-শোণিতে উপচানো কামনা

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, কখনও নফসের ধোঁকায় পড়ো না। কারণ, নফসের কামনার কোনো অন্ত নেই। লোভ-লাভ ও স্বাদ-আনন্দের জগতে 'নফস' অনেক প্রবল। তার কামনার জগত বিশাল। এ পৃথিবীর বুকে এমন কোনো লোক পাওয়া যাবে না যে, একথা বলতে পারবে– আমি এ বিশাল জগত জয় করেছি, সকল আশা আমার পূর্ণ হয়েছে। কারণ, অবাধ স্বাধীনতা, উপচানো খুশি ও অফুরন্ত আনন্দ একেবারে নিজের মত করে ভোগ করার সাধ্য এ দুনিয়াতে কারও নেই। প্রত্যেক মানুষকেই দুঃখের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। রোগ-শোক, দুঃখ-বেদনা প্রত্যেকের জন্যই অনিবার্য। রাজা-বাদশাহ কিংবা বিত্ত- বৈভবে পরিপূর্ণ মানুষ– যার কথাই বলা হোক না কেন, প্রত্যেকেই সুখই অসম্পূর্ণ। প্রত্যেকের আনন্দই অপূর্ণাঙ্গ। কারণ, প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াটা আরাম ও সুখের স্থান নয়। তাই এখানে কষ্ট ও নিরানন্দ আসবেই। এবার তুমি স্বাধীন। ইচ্ছা করলে এ অনিবার্য কষ্ট কোনো পুরস্কার ছাড়া ভোগ করতে পার। অথবা ইচ্ছা করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কষ্টগুলোকে আপন করে নিতে পার। যদি দ্বিতীয় পথটি অবলম্বন কর, তাহলে সেটা হবে তোমার জন্য মঙ্গলজনক। তখন তোমাকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে হবে এবং নিষিদ্ধ পথ বর্জন করতে হবে। মন যা চায়– সেটাই করতে পারবে না। মনের ডাকে সাড়া না দিতে পারলে উদ্বিগ্ন ও ব্যথিত হওয়ার বদঅভ্যাস ত্যাগ করতে হবে, এ বদঅভ্যাস না ছাড়তে পারলে জাহান্নামের পথেই তোমাকে যেতে হবে।

মানুষের 'নফস' আজ অবাধ স্বাধীনতায় অভ্যস্ত

মানুষের নফস একটি শক্তি। এ শক্তি তাকে কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এর নাম ইচ্ছাশক্তি। কিন্তু আমাদের এ শক্তি আজ আত্মঘাতী পথে পরিচালিত হচ্ছে। পার্থিব মজা ও ফূর্তি আজ আমাদের এ শক্তিকে অধিকার করে বসেছে। ফলে রঙিন স্বপ্নের মাঝে আমরা আজ দৌড়ে বেড়াচ্ছি। যেখানে পার্থিব-মজা পাচ্ছি, সেখানে যাচ্ছি। এক কথায় নফসকে আমরা আজ অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা তাকে পরিচালিত করছি না, বরং সে আমাদেরকে পরিচালিত করছে। যে পথে গেলে 'খাও দাও, ফূর্তি কর' পাওয়া যাবে 'নফস' আমাদেরকে সে পথেই নিয়ে যাচ্ছে। ফলে নফসের গোলাম হয়ে আমরা পশুত্বের স্তরে নেমে এসেছি।

শান্তি নেই, স্বস্তি নেই

নফস আংশিক অর্জনে বিশ্বাসী নয়। তার কামনা দরজা-জানালা মানে না। তার চাহিদা কখনও শেষ হয় না। কাজেই তুমি যতই তার কথা শুনবে, তার পেছনে চলবে, তার গোলামি করবে, তার চাহিদা শেষ হবে না। নির্দিষ্ট একটি স্তরে পৌছার ফুরসত সে তোমাকে দেবে না। সে কারণে শান্তি, স্বস্তি, স্থিরতা তোমার জীবন থেকে বিদায় নিয়ে যাবে। একটি আশা পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোভী নফস তোমাকে আরেকটি স্বপ্ন দেখানো শুরু করবে। স্বপ্নের পর স্বপ্ন, আশার পর আশা, চাহিদার পর চাহিদার আনাগোনা তোমাকে অস্থির করে তুলবে। কাজেই এ সবের পেছনে না পড়ে অল্পেতুষ্টিতে অভ্যস্ত হও। তাহলে সুখ পাবে, শান্তি পাবে।

রস-আনন্দের কোনো সীমা নেই

বর্তমান বিশ্বে বিত্ত-বৈভবে যেসব জাতির জীবন থৈ-থৈ করছে, তারা বলে, 'মানুষের ব্যক্তিগত জীবন স্বাধীন। যে কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করলে অফুরন্ত খেলাধুলা, দুরন্ত আনন্দ ও উদ্দাম ফুর্তির মাঝে নিজের জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে। যার জীবন যেভাবে চালাতে চায়, সেভাবেই চালাতে পারবে। যেখানে সে ফুর্তি দেখবে, সেখানেই অবলীলায় নিজেকে সঁপে দিতে পারবে। এতে তাকে কোনো বাধা দিও না। তার স্বাধীনতার মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করো না।'

আজকের সমাজ যেন এরই প্রতিফলিত রূপ। আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি, রস-আনন্দের মাঝে মানুষ ডুবে আছে। যে যার খুশি মতো খাচ্ছে, ফুর্তি করছে। এ পথে কেউ কোনো বাধা দিচ্ছে না। আইনের সুশাসন, ধর্মীয় অনুশাসন, নৈতিকতাবোধ কিংবা সামাজিক প্রতিবন্ধকতাও আজ এসব উশৃঙ্খল জীবন থেকে ওঠে গেছে। এরপরেও যদি এ জীবনগুলোর কাছে প্রশ্ন রাখা হয়, খুব তো করেছ, এবার বলো তো, তোমার সব আশা পূর্ণ হয়েছে কি? সব উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কি? এরপরেও তোমার কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রয়ে গেছে কি? এর উত্তরে সবাই একটা কথাই বলবে। সংক্ষিপ্ত সে উত্তরটি হবে– না। অনেক আশাই আমার পূর্ণ হয়নি। যদি আরো পেতাম, তাহলে স্বপ্ন পূরণে আরো উন্নতি করতে পারতাম। এভাবে এক চাহিদা আরো চাহিদাকে সুযোগ করে দেয়। এক আকাঙ্ক্ষা থেকে উৎসারিত হয় আরেকটি নতুন আকাঙ্ক্ষা। এ ধারা অব্যাহত থাকে। এর শেষ নেই, সীমা নেই।

খোলামেলা ব্যভিচার

নারী-পুরুষের উষ্ণ আলিঙ্গন পাশ্চাত্য সমাজের জন্য কোনো ব্যাপারই নয়। ব্যভিচারের দরজা-জানালা তাদের সমাজে উন্মুক্ত। এতে বাধা দেয়ার কেউ নেই। তাদের অবস্থা দেখলে মনে হয়, রাসূলুল্লাহ (সা.) যা বলেছিলেন, তারাই তার পরিপূর্ণ বাস্তব রূপ। তিনি বলেছিলেন, একটা সময় আসবে, ব্যভিচার ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে। তখন সবচে সৎ ওই লোকটি হবে, যে ব্যভিচারে লিপ্ত নারী-পুরুষকে বলবে, 'এখানে নয়, বরং একটু আড়ালে যাও। চৌরাস্তায় নয়, বরং বৃক্ষটির ওপাশে চলে যাও, তারপর সেখানে যা করার কর।' পাশ্চাত্য-সমাজের ব্যভিচার সমাচার যেন বাস্তবেই আজ এ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমেরিকাতে ধর্ষণের আধিক্য কেন?

মোটকথা, যৌনাবেগকে নিবারণ করার সকল অস্বাভাবিক পথ ও অবৈধ পন্থা তাদের বর্তমান সমাজে চোখ ধাঁধিয়ে পড়ে আছে। তবুও ধর্ষণের ঘটনা তাদের সমাজেই বেশি ঘটছে। এক্ষেত্রে আমেরিকার অবস্থান সর্ব শীর্ষে। প্রশ্ন হলো, যে দেশে যৌনক্ষুধা মেটানোর সকল পথ উন্মুক্ত, সে দেশটিতে ধর্ষণের ঘটনা ঘটবে কেন? চোখ তুললেই উদ্দাম যৌনতা কাছে টেনে নিচ্ছে, সেখানে ধর্ষণের প্রয়োজনই বা কেন হবে? আসল কথা হলো, তাদের মন আজ কোনো কিছুতে স্বস্তি পাচ্ছে না। পারস্পরিক সন্তুষ্টির মাধ্যমে যৌনক্ষুধা মিটিয়েও স্বস্তি পাচ্ছে না। তাই একটু সুখের জন্য, খানিকটা তৃপ্তির জন্য যৌনতার আরেক বীভৎস রূপ তারা আবিষ্কার করেছে ধর্ষণ– জোরপূর্বক যৌনক্ষুধা নিবারণ। এ পথেই তারা সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবুও সুখ নেই, শান্তি নেই। এজন্যই বলি, আসলে মনের চাহিদার শেষ নেই, আত্মতৃপ্তির অন্ত নেই, কামনা-বাসনার সীমারেখা নেই।

এ তৃষ্ণা নিবারণের নয়

'জুউল বাক্বার' একটি রোগের নাম। আমরা একে 'ক্ষুধারোগ' বলি। এর বৈশিষ্ট্য হলো, রোগীকে সে তীব্র-ক্ষুধায় অস্থির করে তোলে। যত খায় তত যেন সে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। ক্ষুধা শেষ হয় না, কোনো খাবারই তার ক্ষুধা মেটাতে পারে না। 'ইসতিসকা' বা তীব্র পিপাসাও এ ধরনের একটি রোগ। সাগর গিলে ফেললেও এ জাতীয় রোগীর পিপাসা নিবারিত হয় না।

মানুষের প্রবৃত্তির চাহিদা ঠিক অনুরূপ। একে কাবু করা যায় না। 'ইসতিসকা'র রোগীর মত নফস শুধু কামনার জাল বুনে যায়, আশার স্বপ্ন দেখে

যায়। ভোগের পর তৃপ্তির সঙ্গে সে পরিচিত হতে চায় না। শুধু ভোগ, শুধু বিলাস, শুধু মজা, শুধু লাভ সে চায় এবং চায়। একে নিয়ন্ত্রণে আনার পথ একটাই। তাহলো শরীয়ত ও আখলাক। শরীয়তের গণ্ডিতে একে বন্দি করতে হয় এবং আখলাকের নীতি দ্বারা একে দমন করতে হয়। তারপর সে নিস্তেজ হয়।

গুনাহর স্বাদ এবং একটি দৃষ্টান্ত

গুনাহর মাঝে একটা নগদ লাভ আছে। আনন্দ পাওয়া এবং মজা অনুভূত হওয়াই হলো নগদ লাভ। মূলত পরীক্ষাটা এখানেই। গুনাহ মানুষকে টানে। তার রূপ-রস ও গন্ধে মানুষ আকর্ষিত হয়। ক্ষণিকের জন্য হলেও মজা পাওয়া যায়। হযরত থানবী (রহ.) এ সুবাদে চমৎকার দৃষ্টান্ত দিতেন। তিনি বলেছেন, এ যেন খুজলি রোগ। খুজলিতে যতই নখ চালাবে, ততই স্বাদ পাবে। এ স্বাদে অভ্যস্ত রোগীকে বাধা দিলেও কাজ হয় না। কিন্তু এ স্বাদ আসলেই কি স্বাদ? বরং এ তো রোগ। যত চুলকাবে, রোগও তত বাড়বে। চুলকানির এ স্বাদ সাময়িক। সাময়িক এ স্বাদের পরই বোঝা যায়, কত ধানে কত চাল। তারপরই টের পাওয়া যায়, জ্বালা-পোড়া ও ব্যথা। গুনাহর মজাও অনুরূপ। এ মজা সাময়িক। এর ঘোর ক্ষণিকের। বরং প্রকৃত মজা গুনাহ ছেড়ে দেয়ার মধ্যেই। নিয়মিত আল্লাহর স্মরণ ও যিকিরে মাধ্যমেই লাভ করা যায় আসল মজা, যে মজা চিরস্থায়ী। গুনাহর সাময়িক স্বাদের তুলনায় এর স্বাদ অনেক বেশি। এর সঙ্গে গুনাহর সাময়িক স্বাদের কোনো তুলনা হয় না।

একটু কষ্ট সয়ে নাও

তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন যে, মনের কামনা-বাসনার বিপরীতে চলো। কেননা, এর অনুকরণ তোমাকে পতনের গভীর গর্তে ছুঁড়ে মারবে। কাজেই একে প্রশ্রয় দিও না। শরীয়তের গণ্ডির ভেতরে একে বন্দি করে রেখো। অবশ্য প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে। টিভির চোখ ধাঁধানো আকর্ষণ থেকে, অশ্লীলতার যৌনতামাখা আবেদন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা নফসের জন্য কি চাট্টিখানি কথা! তাই প্রথম প্রথম একটু-আধটু কষ্ট হবে বৈ কি! কিন্তু থেমে থাকলে তো চলবে না; বরং তোমাকে নফসের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। কারণ, আল্লাহর বিধান হলো, যদি নফসের সামনে নেতিয়ে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলে, তাহলে মনে রাখবেন, সে তোমার সামনে বাঘ হয়ে দাঁড়াবে। আস্তে আস্তে তোমাকে সে গিলে ফেলবে। পক্ষান্তরে যদি দৃঢ়চেতা মনোভাব নিয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও, তাহলে দেখবে, সে একটি বিড়ালও নয়। বরং তখন সে তোমার সদিচ্ছা ও শরীয়তের নিশ্ছিদ্র জালে

আটকে পড়ে তোমারই সামনে নেতিয়ে যাবে। এতে প্রথম প্রথম একটু-আধটু কষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিজের কল্যাণের জন্য এই কষ্টটুকু সয়ে নাও। দেখবে, একদিন এই কষ্টটুকুও পুরোপুরি দূর হয়ে যাবে এবং স্থায়ী ও অনিবার্য স্বাদ চিরদিনের জন্য লাভ করতে পারবে।

নফস দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত

আল্লামা বুসিরী (রহ.) নামক একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রশংসায় 'কাসীদায়ে বুরদাহ' নামক সুদীর্ঘ একটি কিতাব রচনা করেছিলেন। তিনি তাতে নফস সম্পর্কে একটি জ্ঞানগর্ভ ও বিস্ময়কর কবিতা লিখেছেন। তিনি বলেন–

اَلنَّفْسُ كَا لطِّفْلِ اِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَىٰ - حُبِّ الرَّضَاعِ وَاِنْ تُفْطِمْهُ يَنْفَطِمُ

অর্থাৎ– নফস বা প্রবৃত্তি দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত। তাকে দুধপানের সুযোগ দিলে সে বড় হয়েও দুধ পানে অভ্যস্ত থেকে যাবে। আর যদি দুগ্ধপান বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে প্রথমদিকে সে কান্নাকাটি করবে। অবশেষে দুগ্ধপান ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

এখন যদি কোনো ব্যক্তি এই চিন্তা করে যে, দুধ ছাড়ালে আমার সন্তান কান্নাকাটি করবে, তার কষ্ট হবে; সুতরাং তার দুধপান বন্ধ করা যাবে না, তাহলে শিশুটি বড় হয়েও দুগ্ধপান করতে চাইবে। তার সামনে রুটি বা সাধারণ খাবার এলে সে বলবে, আমি খাবো না। আমাকে দুধ দিতে হবে। কিন্তু কোনো সচেতন মা-বাবা তাদের শিশুসন্তানটিকে সাময়িক কান্নাকাটি ও কষ্টের ভয়ে আজীবন মায়ের দুগ্ধপানে অভ্যস্ত রাখে না। তারা জানে, শিশুর দুগ্ধপান বন্ধ করলে সে স্বাভাবিকভাবেই কিছুদিন কান্নাকাটি করবে, রাতে ঘুমোতে চাইবে না, মা-বাবাকে ঘুমোতে দিবে না। তবুও শিশুর বৃহত্তর স্বার্থ ও কল্যাণের কথা ভেবে তারা দুধ ছাড়িয়ে নেয়। যদি শিশুর দুধ ছাড়ানো না হয়, সারা জীবনেও সে স্বাভাবিক খাবারের উপযোগী হবে না।

গুনাহর স্বাদ তাকে পেয়ে বসেছে

আল্লামা বুসিরী (রহ.) বলেন, মানুষের নফসও এই ছোট শিশুটির মত। তার অন্তরে গুনাহর মজা জেঁকে বসেছে। যদি তাকে বল্গাহীন ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে সে নানা রকম গুনাহর কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে। তাকে তখন ফেরানো বড়ই মুশকিল হবে। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা, গীবত করা, সুদ ও ঘুষ খাওয়ায় অভ্যস্ত, তার এসব বদ স্বভাব দূরীভূত করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। এখন যদি নফসের এই সাময়িক কষ্ট দেখে পিছিয়ে থাকে বা ঘাবড়ে যায়, তাহলে সারা

জীবনেও সে গুনাহর কাজ ছাড়তে পারবে না এবং সে আন্তরিক স্থিরতা ও প্রশান্তিও লাভ করতে পারবে না।

প্রশান্তি রয়েছে আল্লাহর যিকিরে

মনে রাখবে, নাফরমানির মাঝে প্রশান্তি নেই। এ পৃথিবীর যাবতীয় উপায়-উপকরণও যদি একত্রিত করা হয়, তবুও প্রশান্তির ঠিকানা খুঁজে পাবে না, স্থিরতা লাভ হবে না। আমি এর আগে পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টান্ত দিয়েছি। সেখানে অর্থ- বৈভবের পাহাড় রয়েছে, শিক্ষার আলো রয়েছে, আমোদ-প্রমোদ, চিত্ত-বিনোদন ও ভোগ-বিলাসের যাবতীয় সুযোগ চোখ ধাঁধিয়ে পড়ে আছে। এরপরেও তাদের মনে শান্তি ও স্থিরতা কেন নেই? কারণ, তারা শান্তি খুঁজে গুনাহ ও পাপাচারের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থেকে। এভাবে প্রশান্তির গন্ধও পাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ -

'আল্লাহর যিকিরের মাঝেই রয়েছে প্রশান্তি ও স্থিরতা।'

নাফরমানি আর পাপাচারে আকণ্ঠ ডুবে থাকবে আর শান্তিও কামনা করবে– এটা হতে পারে না। মনে রেখো, কখনও এভাবে শান্তি মিলবে না। বরং তার ধারে-কাছেও পৌঁছুতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেই প্রশান্তি ও স্থিরতা দিয়ে থাকেন, যাদের অন্তর আল্লাহর যিকির ও ভালোবাসায় সজীব ও সদা জাগ্রত থাকে। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে হয়তোবা তাদেরকে নিঃস্ব মনে হয়।

অতএব, দুনিয়াতে শান্তি ও সুখের ঠিকানা খুঁজে পেতে হলে অবশ্যই গুনাহ ছাড়তে হবে। নফস বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠোর মুজাহাদা করতে হবে।

আল্লাহর ওয়াদা মিথ্যা হয় না

আল্লাহ তাআলা অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا -

"যারা আমার রাস্তায় কষ্ট-ক্লেশ ও মুজাহাদা করবে, পরিবার-সমাজ ও নফসের অন্যায়-আবেদন পদদলিত করে আমার পথে চলবে, অবশ্যই তাদেরকে আমি আমার পথে পরিচালিত করবো।"

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا -

হযরত থানভী (রহ.) আয়াতের এ অংশের অর্থ এভাবে করেছেন– আমি তাদেরকে হাত ধরে আমার পথে পরিচালিত করবো। এমন নয় যে, শুধু দূর

থেকে পথ দেখাবো। তবে প্রথমে তাকে একটু অগ্রসর হতে হবে। তারপরই আল্লাহর সাহায্যের আগমন ঘটবে। এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, যা কখনও মিথ্যা হওয়ার নয়।

কাজেই মুজাহাদা করতে হবে। দৃঢ়তার সঙ্গে অঙ্গীকার করতে হবে যে, আমি গুনাহর কাজ করবো না। চাই মনে ব্যথা আসুক, নফসের চাহিদা পদদলিত হোক, মন-মস্তিষ্কের ওপর ঝড় বয়ে যাক, তবুও গুনাহ করবে না।

আল্লাহ বলেন, যখন বান্দা এভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে, সেদিন থেকে সে আমার প্রিয় বান্দায় পরিণত হবে। আমি নিজে তার হাত ধরে আমার পথে নিয়ে আসবো।

হৃদয় তোমার জন্য প্রাচুর্যময় করে গড়ে তুলবো

আত্মশুদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ হলো মুজাহাদা ও দৃঢ়ভাবে সংকল্প করা। ডা. আব্দুল হাই (রহ.) আবৃতি করতেন–

ارزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں

اب تو اسکو دل بنانا ہے مرے قابل مجھے

'মনের কামনা-বাসনা খুন হোক, আফসোসগুলোও ভূলুণ্ঠিত হোক, তবুও এ হৃদয়কে তোমার উপযোগী বানাতেই হবে আমাকে।'

অর্থাৎ– মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা সমূহ কামনা-বাসনা ধূলিসাত হয়ে গেলেও আমি সংকল্প করলাম যে, অন্তর আজ থেকে আল্লাহর জন্য তৈরি করবো। কেবল এমনটি হলেই হৃদয়ে আল্লাহর মারিফতের আলো জ্বলে উঠবে। মহব্বত ও ভালোবাসায় অন্তর পূর্ণ হয়ে যাবে। একটি সুখসম্পন্ন ও আলোকিত জীবন লাভ করতে পারবে। তখন তোমার থেকে আর গুনাহ প্রকাশ পাবে না। দেখতে পাবে আল্লাহর রহমত তোমার দিকে তরঙ্গায়িত জোয়ারের মত ছুটে আসছে।

মা এত কষ্ট সহ্য করেন কেন?

একজন মায়ের প্রতি লক্ষ্য কর, তার কেমন অবস্থা হয়। হাড়কাঁপানো শীতের রাতে লেপের নিচে মা ঘুমিয়ে আছেন। পাশেই তার শিশু সন্তান। এমনি সময় সন্তান প্রস্রাব করে দিল। এখন নফসের আবেদন হলো, আরামের বিছানায় ছেড়ে কোথাও যাবো না। কনকনে এ শীতের ভেতর আরামে ঘুমিয়ে থাকি। আদরের সন্তানের শরীর ও কাপড়-চোপড় ভেজা থেকে যাবে, সন্তানের গায়ে ঠাণ্ডা লাগবে। অসুস্থ হয়ে পড়বে যে, মমতাময়ী মা এ চিন্তা করে নিজের

মনের এ আবেদন দূরে সরিয়ে দেয়। এ প্রচণ্ড শীতের রাতেও বিছানা থেকে ওঠে যায়। বরফের মত ঠাণ্ডা পানি দিয়ে সবকিছু পরিষ্কার করে। মায়ের হৃদয় থেকে কত মমতা, কত মায়া ঝরে পড়ে। এটা কী সাধারণ কষ্ট! মমতাময়ী মা এসব কষ্ট অকুণ্ঠচিত্তে সহ্য করে নেয়। কারণ, মায়ের একমাত্র কাম্য হলো, সন্তানের কল্যাণ ও সুস্থতা।

ভালোবাসা কষ্টকে মিটিয়ে দেয়

এক মহিলার কোনো সন্তান নেই। ডাক্তরের কাছে গিয়ে বলল, ভাই! যে কোনো উপায়ে চিকিৎসা করুন, যাতে আমি 'মা' হতে পারি। এজন্য সে দু'আ, তাবিজ-কবজ, মন্ত্র-তন্ত্রসহ আরও কত কিছুর দ্বারস্থ হলো। তার এ ব্যাকুলতা দেখে অপর মহিলা তাকে বললো, শোনো, তুমি সন্তানের আশা ছেড়ে দাও। এটা অনেক নির্মম কষ্টের ব্যাপার। সন্তানের লালন-পালনসহ কত ঝামেলা যে তোমাকে পোহাতে হবে। সন্তানপ্রত্যাশী নিঃসন্তান মহিলাটি তখন কী উত্তর দেবে? সে তো এটাই বলবে যে, আমি একটি সন্তানের জন্য হাজারো কষ্ট বিসর্জন দেবো। এ জাতীয় উত্তর সে কেন দেবে? কারণ, সন্তানের মূল্য ও গুরুত্ব তার হৃদয়ের গভীরে গেঁথে আছে। সন্তানের মুখ দেখে সে সব কষ্টের কথা ভুলে যাবে। যদিও কষ্ট তাকে করতেই হবে– এটা সে জানে, তবুও সন্তানের মাঝেই রয়েছে মায়ের হৃদয়ের প্রশান্তি। হৃদয়ের প্রশান্তির জন্যই এত কষ্ট সে বরণ করে নেয়। আল্লামা রুমী (রহ.) এ কথাটি এভাবে তুলে ধরেছেন–

از محبت تلخہا شیریں شود

'ভালোবাসার কারণে তিক্ত বস্তুও মিষ্ট হয়ে যায়।'

মাওলার ভালোবাসা যেন লায়লার ভালোবাসার চেয়ে কম না হয়

মাওলানা রুমী (রহ.) মসনবী শরীফে প্রেম-ভালোবাসার অনেক বিরল ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। লায়লা-মজনুর প্রেমের বিবরণও সেখানে স্থান পেয়েছে। মজনু লায়লার ভালোবাসায় আসক্ত। এজন্য সে দুধের নহর খনন শুরু করেছিলো। তার এ করুণ অবস্থা দেখে কেউ কেউ তাকে বলেছিলো, তোমার এসব কাজ তো নিদারুণ কষ্টের। ছেড়ে দাও এসব। মজনু উত্তর দিয়েছিলো, শত-সহস্র কষ্ট-ক্লেশ কুরবান হোক তার জন্য, যার প্রেমে আমি আসক্ত। নহর খনন বিশাল কষ্টসাধ্য ব্যাপার অবশ্যই। কিন্তু এর মাঝেই তো আমি আনন্দ ও প্রশান্তির ছোঁয়া পাই। মাওলানা রুমী (রহ.) বলেন–

عشق مولیٰ کے کم از لیلیٰ بود ✪ گوئے گشتن بہر اواولے بود

'মাওলার ভালোবাসার মাত্রা লায়লার মজনুর ভালোবাসার চেয়ে কম হয় কিভাবে? মাওলার জন্য গোলাকার বল হয়ে যাওয়াই তো আনন্দের ব্যাপার।'

বোঝা গেলো, ভালোবাসার জন্য অনেক কিছুই করা যায়। তাই আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার খাতিরে একটু কষ্ট সহ্য কর।

বেতনের প্রতি আসক্তি

এক লোক অপরের অধীনে চাকুরি করে। কনকনে শীত কিংবা গনগনে রোদ উপেক্ষা করেও তাকে চলে যেতে হয় চাকুরিস্থলে। কখনও বা এমন হয় যে, কাকডাকা ভোরে আদরের সন্তানদেরকে ঘুমে রেখে অফিসে হাজির হয়, আবার রাতে ফিরে এসেও তাদেরকে ঘুমের ঘোরে পায়। এখন যদি কেউ তাকে বলে, 'ভাই, তোমার চাকুরিটা দেখছি অনেক কষ্টের। চলো, আমি তোমার চাকুরিটা ছাড়িয়ে দিই। এত ভোরে ওঠা, স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে চলে যাওয়া, সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করা, তাও অন্যের অধীনে– এসবই তোমার মনের চাহিদা পরিপন্থী। কাজেই এসব কিছুর দরকার নেই। চলো, তোমার চাকুরিটা ছাড়িয়ে আনি।'

একথার উত্তরে লোকটি তখন কী বলবে? লোকটি নিশ্চয় বলবে যে, ভাই! আপনি এ কী বলছেন! চাকুরিত তো সোনার হরিণ! বহু কষ্ট-তদবিরের পর এটা ভাগ্যে জুটেছে। এখন আপনি এ কী বলছেন! প্রশ্নই উঠে না। চাকুরি ছাড়ার কল্পনাই আমি করতে পারি না।

কেন এ উত্তর দেবে? কারণ, কাকডাকা ভোরে স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে চাকুরিস্থলে ইঁদুরের মত ছুটে যাওয়ার মাঝেই তার প্রশান্তি। যেহেতু এসব কষ্টের পেছনে রয়েছে বেতন-ভাতার প্রতি তার আসক্তি। মাস শেষে নগদ টাকা হাতে পেলে এসব কষ্ট তার মনেই থাকে না। তাই কোনো সময় চাকুরি চলে গেলে বরং সে কাঁদবে। সুপারিশের জন্য কর্তাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াবে। চাকুরি উদ্ধারের জন্য জুতা ক্ষয় করবে।

তদ্রূপ গুনাহর কাজ বর্জন করাও স্ত্রী-সন্তানকে ছেড়ে চাকুরিতে যাওয়ার মত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু গুনাহর কাজ ছাড়ার পর আল্লাহর আনুগত্যের মাঝে যে মজা আসে, তা নগদ বেতন-ভাতার মতই আনন্দদায়ক ব্যাপার। গুনাহ বর্জনের কষ্টের মাঝেই লুকিয়ে আছে আল্লাহর মহব্বত লাভের আনন্দ।

ইবাদতের স্বাদের সঙ্গে পরিচিত হও

এ প্রসঙ্গে হযরত ডা. আব্দুল হাই (রহ.) একটি স্বারগর্ভ কথা বলেছেন যে, নফস তো তৃপ্তি ও আনন্দের প্রতি তীব্রভাবে লালায়িত থাকে। তার খোরাকই

হলো রস, মজা, আনন্দ, ভোগ, বিলাস, বিনোদন। এসবের নির্দিষ্ট কোনো পরিসীমা নেই। কিন্তু তাকে এগুলো দিতেই হবে। এখন যদি তাকে পাপাচার ও অন্যায় আকঙ্ক্ষায় অভ্যস্ত করে তোলে, তাহলে সে এতেই আনন্দিত হবে। পক্ষান্তরে যদি তাকে আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধের আওতায় জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তোলো, তাহলে এর মধ্যেই সে আনন্দ পাবে, মজা পাবে।

হযরত সুফয়ান ছাওরি (রহ.) এর বাণী

হযরত সুফয়ান ছাওরি (রহ.) ছিলেন একজন প্রতিভাধর মুহাদ্দিস ও বুযুর্গ। তিনি বলেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে ইলমের দৌলত, ইবাদতের স্বাদ, যিকির-আযকারের মজা দান করেছেন। এটা শুধু তাঁরই দয়া, তাঁরই দান। আমাদের এসব দৌলত ও স্বাদের সংবাদ যদি দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও সম্পদশালীদের কানে যায় এবং বিশ্বাস করে, তাহলে তারা তরবারি হাঁকিয়ে ছুটে আসবে এবং দাঁত কটমট করে বলবে যে, এগুলো আমাদের হাতে দিয়ে দাও। এগুলোর পেছনেই তো আমরা ছুটে বেড়াচ্ছি। অথচ তোমরা দখল করে বসে আছো। আসলে এসব রাজা-বাদশাহ জানে না, আমাদের এসব সম্পদের তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত অস্থা কী। তারা মনে করে, পাপাচারের মাঝে শান্তি। তারা ধোঁকায় পড়ে আছে। সুখ-শান্তি তো আমাদেরই কাছে– তাদের কাছে নয়।

দিবা-নিশি আত্মহারা হয়ে থাকা উচিত

কবি গালিবের একটি প্রসিদ্ধ চরণ রয়েছে। আল্লাহ ভালো জানেন, লোকেরা এর কী অর্থ করে। কিন্তু আমাদের শায়েখ চরণটির চমৎকার অর্থ করেছেন। চরণটি হলো–

مے سے غرض نشاط ہے کس روسیاہ کو

اک گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہئے

অর্থাৎ– মদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি চাই, দিন-রাত আত্মহারা হয়ে থাকবো। তোমরা আমাকে মদের স্বাদের সঙ্গে সখ্য গড়ে দিয়েছ। তাই এতেই আমি আত্মহারা হই। যদি তোমরা আমাকে আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর ভালোবাসার সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ করে দিতে পারতে, তাহলে আমি তাতেই মজা পেতাম, আত্মহারা হতাম। তোমাদের ভুল এটাই যে, তোমরা আমার পথ ঘুরিয়ে দিয়েছ।

নফসকে অবদমিত করে মজা পাবে

আবারও বলছি, মুজাহাদা প্রথম প্রথম তো কষ্টের মনে হবে। গীবতের মজলিসে বসে চায়ের কাপে ঝড় তোলা ছেড়ে দাও– এ জাতীয় নির্দেশনা মানা

প্রথমদিকে কষ্টসাধ্য মনে হবে। এখন এ মুজাহাদারই সবক দেয়া হচ্ছে। একটিবার মাত্র এ সবক গ্রহণ কর, দেখবে, আসল স্বাদ এখানেই পড়ে আছে। নফসকে অবদমিত করার স্বাদ নফসের গোলামি করার স্বাদ অপেক্ষা বহুগুণ বেশি।

ঈমানে মজা নাও

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তির মন চাইলো যে, সে কুদৃষ্টির মজা নেবে। আর এমন কে-ই বা আছে, যার মনে এরূপ আগ্রহ আনাগোনা করে না। এ ব্যক্তির মনেও এরূপ কামনা জাগলো। তাই নফস তাকে প্ররোচিত করছে কুদৃষ্টির স্বাদ নেয়ার জন্য। কিন্তু আল্লাহর প্রতি ভক্তি এবং তারই ভয়ের কারণে সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো। কুদৃষ্টি সে দেয়নি। এর ফলে আল্লাহ তাআলা এ ব্যক্তির মনে ঈমানের এমন স্বাদ দান করেন যে, তখন তার কাছে মনে হয়; এর তুলনায় কুদৃষ্টির স্বাদ তো একেবারে তুচ্ছ, নগণ্য। (মুসনাদে আহমদ খ. ৫, পৃ. ৫৬)

যে কোনো গুনাহ ত্যাগ করার ব্যাপারেই হাদীসটি প্রযোজ্য। যেমন গীবতের মাঝে মজা পাওয়া যায়। কিন্তু একবার যখন আল্লাহর কথা স্মরণ করে গীবত ছেড়ে দেবে কিংবা গীবত করতে করতে থেমে যাবে, তখন দেখবে, কী রকম স্বাদ ও আত্মতৃপ্তি অনুভূত হয়। মানুষ তখন গুনাহর স্বাদের পরিবর্তে গুনাহ বর্জনের স্বাদ আস্বাদনে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তার গভীর ভালোবাসা ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি হবে।

তাসাউফের সারকথা

এ প্রসঙ্গে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) চমৎকার বলেছেন। প্রত্যেকেই ভালোভাবে স্মরণ রাখার মত কথা। তিনি বলেছেন, তাসাউফের মূলকথা হলো, যখন কারো অন্তরে শরীয়তের বিধিবিধান পালনের ব্যাপারে উদাসীনতা সৃষ্টি হয়, তখন তার বিরোধিতা করা। যেমন নামাযের সময় হয়েছে, নামাযে উপস্থিত হতে অলসতা লাগছে। এ অলসতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে নামাযের বিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। তদ্রূপ গুনাহ-বর্জনের ব্যাপারেও যদি খামখেয়ালিপনা আসে, তখন গুনাহ বর্জন করে নফসের বিরোধিতা করা। এরপর তিনি বলেন, এভাবে করতে পারলে আল্লাহর সঙ্গে মিতালী গড়ে ওঠবে। এর মাধ্যমেই সম্পর্ক উন্নত ও গভীর হতে থাকবে।

অন্তর তো ভাঙার জন্যই

আব্বাজান মুফতি শফি (রহ.) একটি দৃষ্টান্ত দিতেন। তিনি বলতেন, আগের যুগে ইউনানী চিকিৎসক পাওয়া যেতো। তারা কুশতাহ নামক এক

প্রকার ভিটামিন বা টনিক বানাতো। সোনার কুশতাহ, রুপার কুশতাহসহ বহু কুশতাহ তারা বানাতো। এটা বানানোর জন্য তারা স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি মূল্যবান পদার্থ আগুনে জ্বাল দিতো। তাদের থিউরি ছিলো, এসব ধাতব যত বেশি জ্বালানো হবে, ততবেশি শক্তিবর্ধক হবে। বাস্তবেই তা দারুণ শক্তিবর্ধক হতো। নফসও যেন কুশতাহ। নফসকে অবদমিত করার মাধ্যমে যত বেশি জ্বালাবে, ততবেশি শক্তিবর্ধক হবে। তখন আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির যোগ্যতা তার মাঝে চলে আসবে। তাতে ভালোবাসার শক্তি লাভ হবে। এক পর্যায়ে তাঁর নূর ও তাজাল্লির উপযুক্ত বনে যাবে। অন্তরকে যত ভাঙা হবে, ততই আল্লাহ তাআলার প্রিয় হবে।

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ

جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں (اقبال)

"এটি আয়না আর এটিও আয়না বলে আগলে রেখো না। কারণ, ভাঙা আয়নাই তো আয়না প্রস্তুতকারীর কাছে অধিক প্রিয়।'

কাজেই নফসকে যত আঘাত করবে, তত বেশি নফসের স্রষ্টার কাছে প্রিয় হবে। কারণ, ভাঙার জন্যই স্রষ্টা তাকে সৃষ্টি করেছেন। নফসকে শাস্তি দিতে পারলে নফস কী হয়ে যাবে– এ সম্পর্কে তো আব্দুল হাই (রহ.) বলেছেন–

یہ کہہ کے کاسہ ساز نے پیالہ پٹک دیا

اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے

'এই বলে পেয়ালা-প্রস্তুতকারক পেয়ালা হাত থেকে ফেলে দিলো যে, এখন সে এটি ভাঙবে এবং এ দিয়ে অন্য কিছু বানাবে। সুতরাং ভেবো না যে প্রবৃত্তি দমনের কারণে যে দুঃখ-কষ্ট হবে তা বিফলে যাবে। বরং এরপর আল্লাহর প্রিয় পাত্র হবে এবং তার যিকিরের তাওফীক পাবে। এমন প্রশান্তি ও তৃপ্তি পাবে যে, আল্লাহর কসম! সেই স্বাদের কাছে গুনাহর স্বাদ তুচ্ছ মনে হবে। গুনাহকে মনে হবে অসাড়। আল্লাহ আমাদেরকে এ মূল্যবান সম্পদ নসীব করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

নিজের ভাবনা ভাবুন

"যার পেটে ব্যথা, পেট মোচড়ে ওঠে, ভীষণ অস্থির লাগে, সে অপরের সর্দি–কাশির প্রতি কী খেয়াল করবে? বরং এমন ব্যক্তি তো নিজের চিন্তায় অস্থির থাকবে। নিজের কষ্ট লাঘব করা ও ব্যথা নিরাময়ের ফিকিরেই তো সে ব্যস্ত থাকবে। বরং অনেক সময় দেখা যায়, নিজের কষ্ট সাধারণ এবং অপরের কষ্ট মারাত্মক হওয়া সত্ত্বেও নিজের কষ্ট তাকে এতটাই ব্যস্ত করে রাখে যে, অপরের মারাত্মক কষ্টের প্রতি সে চোখ তুলেও তাকায় না।

যদি দ্বীনের বিষয়েও আমরা এভাবে ভাবতাম, যদি নিজের আত্মিক ব্যাধিগুলোর ফিকিরে লেগে থাকতে পারতাম, তাহলে আর অপরের দোষ খুঁজে বেড়াতাম না।"

নিজের ভাবনা ভাবুন

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ـ اَمَّابَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَآاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ (سورة المائدة ، ايت ـ ٥)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِ يْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

হামদ ও সালাতের পর!

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের কথা চিন্তা কর, তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তাহলে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তাদের ভ্রষ্টতা তোমাদের কোনো অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। তোমাদের সকলকেই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। (সূরা মায়েদাহ, ১০৫)

এক আয়াতের উপর আমল

আলোচ্য আয়াতটি পবিত্র কুরআনের একটি সংক্ষিপ্ত আয়াত। কুরআন মজীদের বিস্ময়কর মুজিযাসমৃদ্ধ আয়াত এটি। শুধু এই একটি আয়াতের ওপর আমল করলে মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে। বাস্তবতা-ঘনিষ্ঠ এক আশ্চর্যজনক আয়াত এটি। এতে রয়েছে আমাদের জীবনের জন্য আলোকিত নির্দেশনাও। আয়াতটির বিচ্ছুরিত সৌন্দর্যালোক গোটা মুসলিম উম্মাহকে ক্ষুরধার করতে সক্ষম। আমি বলবো, শুধু এ আয়াতটির উপর আমল করতে পারলেই বর্তমানের মুসলিম উম্মাহর যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবত ঘুচে যাবে। মুসলিম উম্মাহ পুনরায় তার রূপ-রস নিয়ে জেগে উঠবে।

আজ মুসলমানদের দুর্দিন কেন?

সর্বপ্রথম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করছি। তারপর আয়াতের মর্মার্থ যথাযথভাবে বুঝে আসবে। প্রশ্নটি আমাদের অনেকেরই মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাহলো– মুসলমানরা আজ নির্যাতিত, প্রতিটি জনপদে তারা আজ নিপীড়িত। মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি রাষ্ট্র আজ বহন করে চলেছে দুঃশ্চিন্তা, বেদনা ও হতাশা। বসনিয়া, কাশ্মির ও সোমালিয়াতে চলছে অমানবিক নির্যাতন। আফগানিস্তানের মুসলমানরা আত্মকলহে লিপ্ত। মোটকথা, বিমর্ষ হৃদয়ের অনিবার্য আর্তনাদ মুসলিম উম্মাহর সবখান থেকেই উচ্চারিত হচ্ছে। তারা আজ তীব্র সমস্যায় জর্জরিত। এর কারণ কী?

এর কারণ অনুসন্ধানে যখন আত্মনিয়োগ করি, তখন যে কারণটি চোখ ধাঁধিয়ে বেরিয়ে আসে, তাহলো– ইসলামের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আজ শিথিল হয়ে গেছে। প্রিয়নবী (সা.)-এর শিক্ষামালা থেকে আমরা ছিটকে পড়ে গেছি। ইবাদতের শক্তিমত্তালাভে আমরা অক্ষম হয়ে পড়েছি। বদ-আমলের প্রবলতা আমাদেরকে অধিকার করে বসেছে। কথাগুলো তিক্ত হলেও সম্পূর্ণ বাস্তব। শুধু আমি নই, বরং যার মনে একতিল পরিমাণও ঈমান আছে, সেও এ কারণটি আজ অবলীলায় টের পাচ্ছে। কারণ, কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

مَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ.

'তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন।' (সূরা শূরা, আয়াত ৩০)

চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না কেন?

এ অবস্থার কারণ ও পরিবর্তনের কথা বর্তমানে যেখানে- সেখানে শোনা যায়। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এর জন্য কত দল, কত পার্টি, কত সংস্থা ও সংগঠন তৈরি হচ্ছে। অথচ পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি ঘোরালে এবং বাস্তবজীবনকে একটু কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে অনুভূত হয়, সংস্কার, শুদ্ধি ও দিনবদলের সকল প্রচেষ্টা একদিকে, সকল পাপাচারের সয়লাব আরেক দিকে। মানুষের মাঝে এতসব প্রচেষ্টার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। বরং মনে হয় কিশতি বাঁকা পথেই চলছে। অগ্রগতি হচ্ছে কেবল অন্যায়, অপরাধ, পাপাচার ও অনিষ্টতার।

কবির ভাষায়-

یہ کیسی منزل ہے کیسی راہیں ۞ کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے
مگر وہی فاصلہ ہے قائم ۞ جو فاصلہ تھا سفر سے پہلے

'এ কোন অদ্ভুত মঞ্জিল ও পথ। পথ চলতে চলতে পা নিথর হয়ে গিয়েছে। অথচ দূরত্ব এখনও কমেনি, বরং ভ্রমণের পূর্বে যেমনটি ছিল, তেমনই রয়ে গিয়েছে।'

প্রশ্ন হলো, সংশোধনের এত সব প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে না কেন?

সংশোধনের শুরুটা অপর থেকে হয়

এ প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতের মাধ্যমে দিয়েছেন। সংশোধনের এ সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কারণ হলো, প্রত্যেকেই সংস্কারের পতাকা হাতে নিয়ে চায়, সংশোধনটা যেন অপর থেকে শুরু হোক। অর্থাৎ- প্রত্যেকের মনে একটা ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, মানুষ নষ্ট হয়ে গেছে, পাপাচারের মাঝে ডুবে আছে, ঘুষ খাচ্ছে, সুদ খাচ্ছে, নগ্নতার বাজার চরম গরম হয়ে আছে। সুতরাং মানুষকে শোধরাতে হবে, এসব কাজ থেকে তাদেরকে বাধা দিতে হবে।

নিজের সংশোধনের ভাবনা নেই

কিন্তু কেউ কখনও নিজের অবস্থাটা খতিয়ে দেখার ফুরসত পায় না, কতটা পরিবর্তন ঘটেছে নিজের মধ্যে, কত করুণ হয়েছে নিজের অবস্থা, কতটা ভুল-ভ্রান্তির শিকার আমি নিজে, কতটা সংস্কার আমার নিজের মধ্যে প্রয়োজন- এদিকে কোনোই ভ্রূক্ষেপ নেই। অথচ প্রত্যেকে নিজেকে শুদ্ধ করাই হচ্ছে সর্বপ্রধান কর্তব্য। আগে নিজের চিন্তা, তারপর অপরের ফিকির।

কথায় ওজন নেই

মোটকথা, আমরা নিজেকে শোধরানোর চিন্তা থেকে উদাসীন। অথচ অপরের দোষচর্চা ও তাকে শোধরানোর কসরত আমরা করি। ফলে আমার আমল বা কর্মপন্থা আল্লাহর সন্তুষ্টিমতে হয় না। নিজের শোধরানোর ফিকির নেই, অথচ অপরকে শোধরানোর চিন্তা– এটা তো দ্বৈতনীতি। এর কারণে আমাদের কথার আজ কোনো ওজন নেই, উপদেশের কোনো সার নেই, ওয়াজ-নসীহতের কোনো বরকত নেই, নূর নেই, প্রভাব নেই, প্রতিক্রিয়াও নেই। বরং আমাদের এ সকল প্রচেষ্টা পরিণত হচ্ছে সভা-সেমিনারের শোভা বৃদ্ধি ও কানের সুখের উপকরণে।

প্রত্যেকেরই নিজ আমল সম্পর্কে জবাব দিতে হবে

এ ক্ষেত্রে কুরআন মজীদের বক্তব্য হচ্ছে, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আত্মশুদ্ধির ফিকিরে প্রথমে নিজেকে শোধরাও। যদি এমনটি করতে পার এবং হিদায়াতের পথে চলতে পার, তবে যারা ভ্রষ্টপথে চলেছে, পাপাচারের স্রোতে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে, তাদের অন্যায়-অপরাধ তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ, সবাইকেই তো একদিন যেতে হবে আল্লাহর কাছে। প্রত্যেককেই তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। একজনের অপকর্মের জবাবদিহি অন্যজনকে করতে হবে না। কাজেই তুমি নিজের কথা ভাবো। যাচাই করে দেখ, তোমার আমল কেমন। অন্যের ব্যাপারে চিন্তা করার আগে নিজের অবস্থাটা তলিয়ে দেখ। অপরের দোষত্রুটি খুটিয়ে খুটিয়ে বের করা আর নিজের সম্পর্কে উদাসীন থাকা তোমার জন্য উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

مَنْ قَالَ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ اَهْلَكُهُمْ - (كتاب البر والصلة ٢٦٢٣)

'যে বলবে, মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে। নষ্ট হয়ে গেছে, অপরের উপর আপত্তি করে চলবে, বলবে, তারা অশ্লীলতা, অবৈধতা ও পাপাচারের গড্ডালিকা-প্রবাহে নিজেদের জীবন তরি ভাসিয়ে দিয়েছে– সর্বাধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত ওই ব্যক্তি নিজেই। কারণ, অন্যের উপর আপত্তি করার অর্থ বাস্তবেই সে যা বলছে, তার ভয় যদি নিজের অন্তরে থাকতো, তাহলে সর্বপ্রথম নিজেকে সংশোধন করার ফিকির করত।

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহ.)

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহ.) একজন মর্যাদাসম্পন্ন বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর মর্যাদার উর্ধ্বতা ছিলো আমাদের কল্পনারও বাইরে। তাঁর সম্বন্ধে একটি ঘটনা

আছে। একবার তাঁর শহরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলো। লোকজন ভীষণ দুশ্চিন্তায় কাটাচ্ছিলো। মানুষ বৃষ্টির জন্য দুআ করতে লাগলো। কিছু লোক এ মহান বুযুর্গের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো, হযরত! দেশের দুর্ভিক্ষের কথা তো আপনার অজানা নয়। খানা নেই, বৃষ্টিও নেই। জমি-জিরাত সব শুকিয়ে খাঁ-খাঁ করছে। জীবজন্তুগুলো ক্ষুৎপিপাসার তীব্রতায় চেঁচামেচি করছে। আপনি একটু হাত উঠান। আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন বৃষ্টি দান করেন। হযরত যুন্নুন মিসরী (রহ.) উত্তর দিলেন, দুআ তো 'ইনশাআল্লাহ' অবশ্যই করবো। তবে একটি কথা শোন, কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল।' সুতরাং এ অনাবৃষ্টির কারণ আমরা নিজেরাই। আমাদের গুনাহর কারণে আল্লাহ বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছেন। এখন সর্বপ্রথম দেখা দরকার, আমাদের মধ্যে কে সবচে বড় গুনাহগার? আমি ব্যক্তিগতভাবে যখন নিজের কথা ভাবি, মনে হয়, এ গোটা এলাকায় আমার চেয়ে খারাপ কেউ নেই, আমার মত গুনাহগার দ্বিতীয়জন নেই।

আমার প্রবল ধারণা, আমার কারণেই বৃষ্টি হচ্ছে না। তাই আল্লাহ চাহেন তো এ এলাকা থেকে আমি চলে গেলেই আল্লাহর রহমত আসবে। এজন্য আমি চললাম, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালো রাখুন, বৃষ্টি দান করুন।

দৃষ্টি ছিল নিজ গুনাহর প্রতি

দেখুন, যুন্নুন-মিসরী (রহ.) এর মতো মহান বুযুর্গের ভাবনা কত পবিত্র ছিলো। তিনি কি মিথ্যা বলেছেন? না-কি এর মাধ্যমে তিনি বিনয় প্রকাশ করেছেন? বস্তুত তাঁর মত বুযুর্গ মিথ্যা বলতে পারেন না। বরং বাস্তবেই নিজেকে তিনি এমনটিই ভাবতেন। এরাই আল্লাহর ওলী। আল্লাহর ওলীগণ নিজেকে অন্যের চেয়ে পাপী মনে করতেন।

অপরের দোষ তখন চোখে পড়ে না

যুগের মহান পুরুষ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) ছিলেন আমল ও তাকওয়ার এক জীবন্ত ব্যক্তিত্ব। তাঁরই এক খলিফার বক্তব্য। তিনি বলেন, 'হযরত! আপনার মজলিসে যখন বসি, আপনার উপদেশ যখন শুনি, তখন মনে হয়, এ মজলিসে সবচে খারাপ ব্যক্তি আমি। আমার চেয়ে পাপী, আমার চেয়ে বড় অপরাধী যেন এখানে আর কেউ নেই। সোজা কথা হলো, আমার কাছে মনে হয়, আমি পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। হযরত উত্তর দিলেন, 'এ তো তোমার অবস্থা। আর আমার অবস্থা কী জানো? সত্য কথা হলো, আমার অবস্থাও তোমার মতই। আমি যখন বয়ান করতে থাকি, তখন মনে হয়

এখানকার সব উপস্থিতি আমার চেয়ে উত্তম। আমি সবার তুলনায় অধম। আমি সবচে গুনাহগার, সকলেই আমার চেয়ে বেশি নেককার।'

এতো গেলো হযরত থানভী (রহ.)-এর নিজের কথা। আসলে বুযুর্গ এদেরকেই বলে। তাঁদের মনে শুধু একটাই চিন্তা– আমার মধ্যে কি কোন দোষ আছে? কোন কোন গুনাহতে আমি লিপ্ত? এসব আমি কিভাবে দূর করবো? কেমন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবো? মরহুম বাহাদুর শাহ জা'ফর বলেছিলেন–

تھے جو اپنی برائی سے بے خبر ✪ رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر

پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر ✪ تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

'যারা নিজেদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে উদাসীন ছিলো, তারাই অন্যের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলো। আর যারা নিজেদের দোষের প্রতি নযর দিলো, তাদের দৃষ্টি থেকে অন্যের দোষ সরে গেলো।

মনে রাখবেন, মানুষ নিজের সম্পর্কে যতটুকু জানে, অন্যের সম্বন্ধে ততটুকু জানে না। নিজের চিন্তা-ইচ্ছা, কল্পনা, কাজ-কর্মসহ সবকিছুই নিজের কাছে স্পষ্ট। তাই নিজের দোষগুলোর প্রতি যার দৃষ্টি পড়লো, তার অপরের দোষ খুঁজে বেড়ানোর অবকাশ কোথায়?

নিজেই রোগী; অপরের চিকিৎসা কিভাবে করবে?

যার পেটে ব্যথা, পেট মোচড়ে ওঠে, অস্থির লাগে, সে অপরের সর্দি-কাশির প্রতি কী খেয়াল করবে? বরং এমন ব্যক্তি তো নিজের চিন্তায়ই অস্থির থাকবে। নিজের কষ্ট লাঘব করা ও ব্যথা নিরাময়ের ফিকিরেই তো সে ব্যস্ত থাকবে। অন্যের অসুখ, অন্যের সাধারণ কষ্টের দিকে তাকানোর তার অবকাশ কোথায়? বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নিজের কষ্ট সাধারণ আর অন্যের কষ্ট মারাত্মক হওয়া সত্ত্বেও নিজের কষ্ট তাকে এতটা বিচলিত রাখে যে, অন্যের মারাত্মক কষ্টের প্রতি চোখও তুলে তাকায় না।

একটি মেয়ের উপদেশমূলক ঘটনা

আমার এক প্রিয় সহধর্মিনী ছিলো। তার পেটে ব্যথা ছিলো। ব্যথা খুব মারাত্মক ছিলো না। ডাক্তার দেখানোর জন্য তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। লিফটে চড়ার সময় হুইল চেয়ারে বসা এক মহিলা দৃষ্টিগোচর হলো। যার হাত-পা ভাঙ্গা হলেও পেটে তো আর ব্যথা নেই। আসলে আমার সহধর্মিনীর অনুভূতি ও বিশ্বাসে একথা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো যে, সবচে

মারাত্মক কষ্টের রোগ হচ্ছে পেটের ব্যথা। তাই অপরের পুড়ে যাওয়া চামড়া, ভাঙ্গা হাত-পা দেখেও নিজের কষ্টের কথা ভুলে যায়নি। কারণ, নিজের কষ্টের অনুভূতি পুরোপুরি তার অন্তরে আছে।

এ ঘটনার পর আমি ভাবলাম, যদি দ্বীনের বিষয়েও আমরা এভাবে ভাবতাম, যদি আত্মিক ব্যধিগুলোর ফিকিরে লেগে থাকতে পারতাম, তাহলে অপরের দোষ আর খুঁজে বেড়াতাম না।

হযরত হানযালা (রা.)-এর নিজের ফিকির

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হানযালা (রা.) কাঁপতে কাঁপতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এলেন। আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হানযালা তো বরবাদ হয়ে গেছে– মুনাফিক হয়ে গেছে।' নবীজী (সা.) বললেন, 'আচ্ছা, হানযালা আবার মুনাফিক হলো কী করে?' হানযালা উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যখন আপনার দরবারে থাকি, বেহেশত-দোযখের কথা শুনি, আখেরাতের কথা স্মরণ করি, তখন আমাদের অন্তরটা আখেরাতের চিন্তায় একেবারে কোমল হয়ে যায়। আমরা তখন পবিত্র হয়ে ওঠি। কিন্তু যখন বাড়িতে যাই, স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে ওঠা-বসা করি, তখন আমাদের সবকিছুই বদলে যায়। ভেতরটা আবার অন্ধকার হয়ে যায়। সুতরাং এই যে আপনার দরবারে এলে এক অবস্থা এবং বাইরে গেলে অন্য অবস্থা– এর নামই তো মুনাফেকি। এটাই তো মুনাফেকির আলামত।

উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, يَاحَنْظَلَةُ سَاعَةٌ سَاعَةٌ (হানযালা) ভয়ের কিছু নেই। এ অবস্থা সব সময় তো সৃষ্টি হয় না। বরং মাঝে মাঝে সৃষ্টি হয়। অন্তর মাঝে মাঝে আখেরাতের ভয়ে গলে যায়। আবার মাঝে মধ্যে একটু শক্ত হয়ে যায়। তবে মানুষের পরিণাম নির্ভর করে তার আমলের উপর। তাই মানুষের অনিবার্য কর্তব্য হলো, শরিয়ত পরিপন্থী কোনো কাজ না করা। (সহীহ মুসলিম, তওবা অধ্যায়)

হযরত উমর (রা.) এবং নিজের ফিকির

হযরত উমর (রা.) মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় খলিফা। যাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

لَوْكَانَ مِنْ بَعْدِىْ نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ۔

'যদি আমার পরে কোনো নবী হতো, তাহলে উমর হতো।'

সর্বোপরি যিনি নিজ কানে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মুখে শুনেছেন– عمرفى الجنة 'উমর জান্নাতী', সেই তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তেকালের পর হযরত

হুযায়ফা (রা.) এর কাছে হাজির হলেন। হুযায়ফা (রা.) কে রাসূলুল্লাহ (সা.) মুনাফেকদের তালিকা দিয়েছিলেন। তাই উমর (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'নবীজী (সা.) মুনাফেকদের যে তালিকাটি আপনাকে দিয়েছেন, সেখানে আমার নাম নেই তো?'

দেখুন, উমর (রা.) এর মত সাহাবীর নিজের ব্যাপারে শংকা কোন পর্যায়ের। নবী (সা.) তাঁকে বেহেশতি বলেছেন তাতে কি! তাঁর ভয় হলো, নবীজী (সা.) এর ইন্তেকালের পর আমার বদ-আমলের কারণে হয়ত সেই সৌভাগ্যটি ধরে রাখতে পারিনি। আসলে একেই বলে নিজের ফিকির। যে নিজেকে যতখানি চিনেছে, তাঁর ফিকিরও তত দূরন্ত হয়েছে। বস্তুত এটা ছাড়া মানুষ গুনাহমুক্ত জীবন কাটাতে পারে না। (আল বিদওয়াহ, আন্নিহায়াহ খণ্ড ৫, পৃ. ১৯)

দ্বীন সম্পর্কে চূড়ান্ত অজ্ঞতা

আমাদের অবস্থা আজ উল্টোপথে ধাবমান। আমরা দ্বীনের কথা বলি ঠিক, কিন্তু নিজেকে শুদ্ধ করার ফিকির করি না। দলাদলি, কাদা ছোঁড়াছুড়ি ও অনর্থক বাচালতা ছাড়া বাস্তবঘনিষ্ঠ কার্যকলাপ আমাদের দ্বারা হয় না। এর ফলে দ্বীন সম্পর্কে উদাসীনতা সমাজে বাড়ছে বৈ কমছে না। একটা সময় ছিলো, যখন আমাদের শিশু-কিশোররাও দ্বীন সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা রাখতো। অথচ আজ? আজ বড়রাও এমনকি শিক্ষিতরাও দ্বীন সম্পর্কে খুব অজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছে। যদি বলা হয়, এটা দ্বীনের কথা, তখনই বিস্ময়ঝরা কণ্ঠে বলে ওঠে, আচ্ছা, তাহলে এটাও দ্বীনের কথা! দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতারও একটা সীমা থাকা উচিত। সেই সীমা আজ কোথায়? এমন করুণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার কারণই বা কি? আসলে এর একমাত্র কারণ হলো, মানুষ আত্মশুদ্ধির কথা ভাবে না, নিজেকে সংশোধনের চিন্তা করে না, ব্যক্তি সংশোধনের ওপরেই নির্ভর করে সমাজশুদ্ধির কার্যকারিতা। তাই কুরআন মজীদ আমাদেরকে সর্বপ্রথম ব্যক্তি-সংশোধনেরই নির্দেশ দিয়েছে।

এই হলো আমাদের অবস্থা

মনে করুন, যদি আমি পতাকা উড়িয়ে, বাহুতে ব্যাজ লাগিয়ে সমাজ সংস্কারের আওয়াজ তুলি, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অবস্থা হচ্ছে, ঘুষ নেয়ার সুযোগ পেলে খুশিতে টগবগ করি, অন্যকে ধোঁকা দেয়ার সুযোগ পেলে তাও নিপুণভাবে কাজে লাগাই। অথচ সুদবিরোধী আন্দোলনে আমার পতাকা থাকে আকাশছোঁয়া। দুর্নীতিবিরোধী অপারেশনে আমার পদক্ষেপ হয় দৃঢ় ও কঠিন। বলুন, সমাজসংস্কার কিভাবে হবে? সমাজশুদ্ধির পথ কিভাবে রচিত হবে? এভাবে তো সমাজসংস্কার হবে না; হতে পারে না।

সংস্কারের পথ

যে কথা বলবো, সেই কাজ আমি করবো, গীবতের বিরুদ্ধে বলবো, নিজেও গীবত ছাড়বো। ঘুষের বিরুদ্ধে স্লোগান দিবো, নিজেও ঘুষ থেকে দূরে থাকবো। সুদবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবো, নিজেও এ থেকে দূরে থাকবো। দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে সক্রিয় থাকবো, নিজেও এ থেকে বেঁচে থাকবো। নগ্নতা, উলঙ্গপনা ও অন্যায়-অপরাধের বিরুদ্ধে বজ্রকঠিন হবো, নিজেও এগুলো বর্জন করবো। এভাবে চলতে পারলে এটা হবে সমাজশুদ্ধির জন্য সঠিক পথ। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে শোধরানোর চিন্তা করবো না, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজশুদ্ধির পথ খুঁজে পাবো না। কুরআন মজীদের উল্লিখিত আয়াতটির প্রতি পুনরায় লক্ষ্য করুন–

عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ -

'তোমরা নিজেদের কথা চিন্তা কর। তোমরা নিজেরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তাহলে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষাপদ্ধতি

দেখুন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এ দুনিয়ারই মানুষ ছিলেন। নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর মাত্র তেইশ বছর দুনিয়াতে জীবিত ছিলেন। তিনি যখন এসেছিলেন, তখন গোটা দুনিয়া ছিলো অন্ধকারাচ্ছন্ন। আশার আলো তাদের থেকে ছিলো অনেক দূরে। বিশেষ করে আরব বিশ্বের অবস্থা ছিলো বেশি করুণ। এমন স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে তিনি এসেছিলেন। তখন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ তিনি। কেউ নেই তাঁকে সহযোগিতা করার। তখনই তিনি নির্দেশপ্রাপ্ত হলেন গোটা সমাজকে পরিবর্তন করার। সমাজবিপ্লবের পথে এগুলেন তিনি। মাত্র তেইশ বছরে সফলও হলেন। যখন তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, তখন গোটা আরব ছিলো কুফর ও শিরকমুক্ত। যে জাতি ছিলো সম্পূর্ণ পথহারা জাতি, সেই জাতিকে তিনি শুধু পথই দেখাননি, বরং পথপ্রদর্শকেও পরিণত করেছেন। এত বড় বিপ্লব কিভাবে সম্ভব হলো?

এ তেইশ বছর জীবনে তিনি মক্কাতে ছিলেন তের বছর। যে তের বছরে জিহাদ করার অনুমতি তিনি পাননি। নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও বিধিবিধান প্রয়োগ তখনও শুরু করেননি তিনি। বরং এ দীর্ঘ তের বছরে শুধু সবর করেছেন। নির্যাতনের ঝড়েও তিনি ছিলেন অবিচল। প্রতিশোধের পরিবর্তে শুধু মার খেয়েছেন। কারণ, তাঁর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ছিলো– وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ

لِاللهِ। শুধু আল্লাহর দিকে চেয়ে সব নির্যাতন তিনি মুখ বুজে সহ্য করেছিলেন। অথচ প্রতিশোধের কোনো শক্তি তাঁর কাছে ছিলো না এমন নয়। দশের পরিবর্তে একটা প্রতিশোধ হলেও নেয়ার ক্ষমতা তাঁর হাতে ছিলো। কিন্তু দেখুন তাঁর প্রিয় অনুসারী বেলাল হাবশী (রা.) এর প্রতি। তাওহীদের ডাকে সাড়া দেয়ার অপরাধে তপ্ত বালুতে তাঁকে টানা-হেঁচড়া করা হয়েছে। বুকে ভারি পাথর উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তখন তো ইচ্ছা করলে তিনি অন্তর তো একটা চড় হলেও দিতে পারতেন। কিন্তু দেননি। কারণ, তখনকার নির্দেশ এটা ছিলো না। তরবারি উঠাবার অনুমতি তখনও তাঁরা পাননি।

মানবীয় সোনার খনি

এতসব নির্যাতনের তোপের মুখে তাদের পড়তে হয়েছে কেন? কারণ, উদ্দেশ্য ছিলো, তাদেরকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাঁটি সোনা হিসাবে গড়ে তোলা। তেরটি বছর তারা তৈরি হয়েছেন। তারপরেই শুরু হয়েছে মদীনার জীবন। সুতরাং প্রথম কাজ হলো, নিজেকে তৈরি করা, নিজেকে শুদ্ধ করার পর অপরকে শুদ্ধ করার চিন্তা করলে তখন তা ফলপ্রসূ হবে। সাহাবায়ে কেরাম যেমনিভাবে সর্বপ্রথম আত্মশুদ্ধির পেছনে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন, তারপর মদীনা রাষ্ট্র কায়েম করেছেন, এমন রাষ্ট্র কায়েম করেছেন, যার নজির বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। তেমনিভাবে আমাদেরকেও সর্বপ্রথম আত্মশুদ্ধির পথে চলতে হবে, এরপরেই আসবে আল্লাহর সহায়তা ও বিজয়।

নিজেকে যাচাই করুন

আজকের আলোচনার মাধ্যমে আমি আপনাদের সামনে আরজ করতে চাই যে, আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেকে যাচাই করা। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যস্ত জীবনটা আমাদের কেমন কাটছে? আল্লাহর হুকুম কতটুকু মেনে চলেছি এবং কতটুকু অমান্য করেছি? ইসলাম পাঁচটি জিনিসের সমষ্টির নাম। প্রতিদিন অন্তত একবার হলেও যাচাই করা প্রয়োজন এ পাঁচটি বিষয়ে আমাদের অবস্থাটা কেমন? পাঁচটি বিষয় হল–

১. আকীদা-বিশ্বাস শুদ্ধ হওয়া চাই।

২. ইবাদাত অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি সঠিক ও যথাযথ হওয়া চাই।

৩. মুআমালাত তথা বেচা-কেনা, লেনদেন, আয়-উপার্জন ইত্যাদি হালাল-পদ্ধতিতে হওয়া চাই।

৪. মুআমালাত তথা দৈনন্দিন চলাফেরার সময় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর হুকুমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আনুগত্যশীল হওয়া চাই।

৫. আখলাক তথা চরিত্র পরিশীলিত হওয়া চাই। অর্থাৎ– মন্দ চরিত্র। যেমন হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার ও সহিংস মনোভাব বর্জন করা চাই এবং উত্তম চরিত্র যেমন, বিনয়, শোকর ও সবর অর্জন করা চাই।

এ পাঁচটি বিষয়ের প্রতি যত্নশীল হতে পারলে প্রকৃত মুসলমান হওয়া যাবে। প্রত্যেকের উচিত এ পাঁচটি বিষয়কে নিজের মাঝে নেড়ে- চেড়ে দেখা। যেমন, আমার আকীদা শুদ্ধ আছে কিনা? ফরয নামাযগুলো যথাযথভাবে আদায় করি কিনা? আমার আয়-উপার্জন হালাল পদ্ধতিতে হচ্ছে কিনা? লেনদেন ইত্যাদি সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা? আমার চরিত্র পরিশীলিত কিনা? মিথ্যা, গীবত, অপরকে কষ্ট দেয়ার মত বদস্বভাব আমার মাঝে আছে কিনা? অপরের দুঃখে দুঃখী হওয়ার গুণ আমি অর্জন করেছি কিনা? এভাবে এ পাঁচটি বিষয়কে সামনে রেখে নিজেকে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এভাবে চলতে থাকলে বর্জনযোগ্য বিষয়গুলো ধীরে ধীরে বর্জন করতে পারলে এবং অর্জনীয় বিষয়গুলো অর্জন করতে পারলে 'ইনশাআল্লাহ' আলোকিত মানুষ হিসাবে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারবেন। তখন আপনার অন্তর আলোকিত হয়ে উঠবে এবং আলো দ্বারা অপরকেও উপকৃত করতে সক্ষম হবেন।

বাতি থেকে বাতি জ্বলে

মনে রাখবেন, ব্যক্তির সমষ্টিকেই সমাজ বলে। এক ব্যক্তি পরিশীলিত হলে, গুনাহ ছেড়ে দিলে এবং আল্লাহর হুকুম ও নবীর তরিকার সঙ্গে আন্তরিকতা গড়ে তুললে এর অর্থ হলো, একটি বাতি জ্বলে উঠলো। আর বাতি যতই ছোট হোক, তার আলো থাকবেই। সে তার চারিদিককে আলোকিত করবেই। এ আলোকিত মানুষটি থেকে তখন অন্যজনও আলোকিত হবে। এভাবে বাতি থেকে বাতি জ্বলবে এবং এক সময় গোটা সমাজই আলোকিত হয়ে উঠবে। আল্লাহ তাআলা দয়া করে আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে আত্মশুদ্ধির ফিকির সৃষ্টি করে দিন। আমীন।

এ ফিকির সৃষ্টি হবে কিভাবে?

এই যে আমরা এতক্ষণ আলোচনা শুনলাম, ইসলাহের কথা বললাম, এর ফলে আশা করি, সামান্য ফিকির হলেও আমাদের অন্তরে জেগেছে। এভাবেই সৃষ্টি হয় আত্মশুদ্ধির ফিকির। এবার এ আলোচনাটা অপরকে শুনিয়ে দিন। নিজেও বারবার ইসলাহী মজলিসে শরিক হোন। বুযুর্গানে দ্বীনের কিতাব পড়ুন।

দেখবেন, তখন আপনার মাঝেও চলে আসবে আত্মশুদ্ধির চিন্তা, ইসলামের ফিকির। দেখুন, কুরআন মজীদে اقيموا الصلوٰة তথা নামায কায়েম করার নির্দেশ একবার দেয়া হয়নি বরং বাষট্টিবার দেয়া হয়েছে। অথচ যদি আল্লাহ তাআলা একবার নির্দেশ দিতেন, তাহলেও আমাদের উপর নামায ফরয হত। প্রশ্ন হলো, তাহলে তিনি বারবার নির্দেশ দিলেন কেন? এর কারণ হলো, মানুষের স্বভাবটাই এমন যে, একটা কথা বারবার বলা হলে তখন অন্তরে রেখাপাত করে। শুধু একবার বললে তেমন একটা ফায়দা হয় না। কাজেই আত্মশুদ্ধির ফিকির সৃষ্টি করতে হলে ইসলাহী মজলিসগুলোতে যেতে হবে এবং বারবার যেতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাকে, আপনাকে, সকলকে আমল করার তাওফীক দিন। প্রত্যেকের অন্তরে আত্মশুদ্ধির ফিকির তৈরি করে দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়

"পাপকে ঘৃণা করতে হবে, পাপীকে নয়। বরং পাপী ব্যক্তি তো সমবেদনা পাওয়ার পাত্র। কেননা, সে তো রোগী। নফসের ব্যাধিতে সে করুণভাবে আক্রান্ত। শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি যেমনিভাবে সেবা-যত্ন ও সমবেদনার পাত্র, তেমনিভাবে নফসের রোগীও কোমলতা ও করুণার পাত্র। রোগ ঘৃণ্য হতে পারে, রোগী ঘৃণিত হতে পারে না। শরীরের রোগী বা নফসের রোগী— সব রোগীর প্রতিই সহমর্মিতা দেখাতে হবে।"

পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًاكَثِيْرًا ـ اَمَّابَعْدُ!

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَيَّرَاَخَاهُ بِذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَعْمَلَهٗ ـ (ترمذی ـ كتاب صفة القيامة باب ٥٤)

হামদ ও সালাতের পর।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ মুসলিম ভাইয়ের বিরুদ্ধে দোষ চাপাবে, তার উপর গুনাহর অপবাদ দিবে, যে গুনাহ থেকে সে তাওবা করেছে, তাহলে সে ব্যক্তি ওই গুনাহতে লিপ্ত হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না।

যেমন, এক মুসলমান একটি গুনাহতে লিপ্ত ছিলো। আপনি সেটা জানলেন এবং এও জেনেছেন যে, উক্ত ব্যক্তি এখন আর গুনাহটি করে না; বরং সে তাওবা করে নিয়েছে। অথচ আপনি সেই গুনাহ সম্পর্কে বলে বেড়াচ্ছেন, নিজেও ওই ব্যক্তিকে ছোট মনে করছেন, তাহলে আলোচ্য হাদীসের ভাষ্যমতে, একদিন আপনাকেও পড়তে হবে এ গুনাহর জালে। কারণ, আপনি আপনার মুসলিম ভাইয়ের এমন একটা গুনাহ নিয়ে হৈচৈ করেছেন, যে গুনাহটা আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন, বরং তাওবার বরকতে আমলনামা থেকে সম্পূর্ণভাবে মিটিয়েও দিয়েছেন।

গুনাহগার তো একজন রোগী

যে ব্যক্তি তাওবা করেছে, তার গুনাহ নিয়ে নাড়াচাড়া করার অধিকার যেমনিভাবে আপনার নেই, তেমনিভাবে যে ব্যক্তি এখনও তাওবা করেনি, তার গুনাহটা নিয়ে ছুটে বেড়ানোর অধিকারও আপনার নেই। কেননা, সে এখনও তাওবা করেনি ঠিক; কিন্তু ভবিষ্যতে করবে না– এমনটি তো নিশ্চিত নয়। কাজেই তাকে হীন ও নীচু ভাববার কোন কারণ নেই। পাপকে ঘৃণা করতে হবে, পাপীকে নয়। বরং পাপী ব্যক্তি তো সমবেদনা পাওয়ার পাত্র। কারণ সে রোগী, নফসের ব্যাধিতে সে করুণভাবে আক্রান্ত। শারীরিক ব্যধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি যেমনিভাবে সেবা-যত্ন ও সমবেদনার পাত্র, তেমনিভাবে নফসের রোগীও কোমলতা ও করুণার পাত্র। রোগ ঘৃণ্য হতে পারে, কিন্তু রোগী ঘৃণিত হতে পারে না। তাই যে-কোনো রোগীর জন্য দুআ করতে হবে। শরীরের রোগী কিংবা নফসের রোগী সব রোগীর প্রতি সহমর্মিতার আচরণ দেখাতে হবে।

কুফর ঘৃণ্য বিষয়, কিন্তু কাফের ঘৃণ্য ব্যক্তি নয়

কোন কাফেরকে ঘৃণা করা যাবে না। হ্যাঁ, কুফরকে ঘৃণা করতে হবে অবশ্যই। কাফেরের জন্য দুআ করতে হবে, হে আল্লাহ! তার কুফর দূর করে দিন। দেখুন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর কাফেররা কত নির্যাতন করেছে। তাদের তূনিরের প্রতিটি তীর তাঁর প্রতি নিক্ষেপ করেছে। তাঁর উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। তাঁর রক্ত ঝরিয়েছে। মোটকথা, নির্যাতন-নিপীড়নের প্রতিটি পন্থা তারা প্রিয়নবী (সা.) এর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে। এতদসত্ত্বেও তিনি তাদেরকে বদদুআ দেননি, বরং দরদমাখা কণ্ঠে দুআ করেছেন– اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ হে আল্লাহ! আমার জাতিকে হেদায়াত দান করুন, তারা তো জানে না আমি আপনার রাসূল।'

বোঝা গেল, প্রিয়নবী (সা.) ব্যক্তিকে ঘৃণা করেননি, বরং দরদ ও ব্যথা প্রকাশ করেছেন। ঘৃণা করেছেন গুনাহ, জুলুম, শিরক ও কুফরকে। কাজেই পাপীকে নয়; বরং পাপকে ঘৃণা কর। পাপীর প্রতি সমবেদনা জানাও। তার থেকে পাপ দূর হওয়ার দুআ কর।

হযরত থানবী (রহ.) অপরকে উত্তম মনে করতেন

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) এর একটি বাণী আমি আব্বাজান মুফতি শফী (রহ.) ও ডা. আবদুল হাই (রহ.) এর মুখে বহুবার শুনেছি। তিনি বলতেন–

'আমার অবস্থা হলো, আমি প্রত্যেক মুসলমানকে ফিলহাল আমার চেয়ে ভালো জানি আর প্রত্যেক কাফেরকে ভবিষ্যতের হিসাবে উত্তম জানি। মুসলমান সে তো মুসলমান, তার হৃদয়ের আছে ঈমান। তাই সে আমার চেয়ে উত্তম। কাফের তো হতে পারে ভবিষ্যতের ঈমানদার, আল্লাহর তাওফীক সাথী হলে ঈমান তার নসিব হবে। তাই সম্ভাবনার উপর ভর করে বলতে পারি, সে আমার চেয়ে উত্তম, আমি তার চেয়ে অধম।'

এ রোগে আক্রান্ত কারা?

অপরকে তুচ্ছ মনে করার রোগে তারাই আক্রান্ত, যাদের কাছে দ্বীনের জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে নেই এবং যারা নতুন করে দ্বীনমুখী হচ্ছে। যেমন, এক ব্যক্তি প্রথম প্রথম দ্বীনের উপর চলতো না, এখন সে দ্বীনমুখী হয়েছে, নামায-রোযা পালন করছে, পোশাক-পরিচ্ছদও পরিশীলিত করে নিয়েছে, মসজিদে নিয়মিত আসা-যাওয়া করছে, জামাতে নামায পড়াকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছে, এ ব্যক্তির মনে শয়তান একথা গেঁথে দিলো যে, তুমি তো সোজা পথে চলে এসেছো, কিন্তু দেখো, গুনাহর ভেতর আকণ্ঠ নিমজ্জিত মানুষগুলো তো নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে এ ব্যক্তি নিজেকে ছাড়া অবশিষ্ট সবাইকে 'নীচু' ভাবতে শুরু করলো। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ-অনুযোগ উত্থাপন শুরু করে দিলো। এর অনিবার্য পরিণতিতে শয়তান তাকে আরো অগ্রসর করে নিলো। এবার অহঙ্কার, গোয়ার্তুমি, হঠকারিতা, স্বার্থপরতার মত বদঅভ্যাস তাকে পেয়ে বসলো। ধীরে ধীরে তার সকল সাধনা, মুজাহাদা ও ইবাদত ধ্বংসের গর্তে হারিয়ে গেলো। কারণ, অহঙ্কারমিশ্রিত ও লোকদেখানো কোনো আমল তো আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বিধায় এ ব্যক্তির আমলও সফলতার মুখ দেখে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ জাতীয় আমল থেকে রক্ষা করুন। ইসলামপূর্ণ ও শোকরসমৃদ্ধ আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন। অপরকে তুচ্ছ মনে করার রোগ থেকে মুক্তি দান করুন। আমীন।

রোগী দেখলে এ দুআ পড়বে

হাদীস শরীফে এসেছে, তখন এক মানুষ অপর মানুষকে রোগে ভুগতে দেখবে, তখন এ দুআটি পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّاابْتَلَاهُ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا - (ترمذى , كتاب الدعوات , باب مايقول اذا راى مبتلا)

'হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনার জন্য। যেহেতু আপনি এ লোকটিকে যে রোগে ভোগাচ্ছেন, আমাকে তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং অনেক লোক

থেকে আমাকে সম্মানিত করেছেন। অর্থাৎ– অনেকেই অসুস্থতায় ভুগছে আর আপনি আমাকে দান করেছেন সুস্থতা।'

রোগী দেখলে এ দুআটি পড়া সুন্নাত। দুআটি রাসূলুল্লাহ (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন। ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, আমি কোনো হাসপাতালের কাছ দিয়ে যখন যাই, তখন 'আলহামদুলিল্লাহ' এ দুআটি পড়ি এবং মনে মনে এ দুআ করি যে, হে আল্লাহ! এসব রোগীকে আপনি সুস্থ করে দিন।

গুনাহগারকে দেখলেও উক্ত দুআ পড়বে

আমাদের এক উস্তাদ বলতেন, 'রোগী দেখলে উক্ত দুআটি পড়ার শিক্ষা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে পেয়েছি। অনুরূপভাবে কোনো গুনাহগারকে দেখলেও উক্ত দুআটি পড়বে। আমি এমনটি করি। যেমন, পথে-ঘাটে সিনেমার প্রতি উৎসাহী মানুষের লাইন দেখা যায়। তখন আমি এ দুআটি পড়ি। সাথে সাথে শুকরিয়া আদায় করি এজন্য যে, আল্লাহ আমাকে এ গুনাহটি থেকে দূরে রেখেছেন।'

দেখুন, যেমনিভাবে একজন রোগী সহমর্মিতা পাওয়ার যোগ্য, তেমনিভাবে একজন গুনাহগারও সহমর্মিতা পাওয়ার যোগ্য। কারণ, অসুস্থ ব্যক্তি হচ্ছে শরীরের রোগী এবং গুনাহগার ব্যক্তি হচ্ছে আত্মার রোগী। গুনাহগারকে দেখে ঘৃণা করবে না, তাকে তুচ্ছ মনে করবে না। বরং তার জন্য হেদায়াতের দুআ করবে। হতে পারে, আল্লাহ তাকে তাওবার সুযোগ করে দিবেন। তখন সে নিষ্পাপ হয়ে যাবে এবং তোমার চেয়েও পবিত্র হয়ে যাবে।

মোটকথা, পাপীকে নয়, বরং পাপকে ঘৃণা করবে। কাফেরকে না, বরং কুফরকে ঘৃণা করবে। ব্যক্তিকে না, বরং তার অপকর্মকে ঘৃণা করবে। ব্যক্তির সঙ্গে কোমল ও সহমর্মিতার আচরণ করবে। দরদমিশ্রিত ভাষায় তাকে বুঝানোর চেষ্টা করবে। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের কর্মকৌশল এমনই ছিলো যে, তাঁদের অন্তরে ব্যথা ছিলো, ফিকির ছিলো। হৃদয়ের সবটুকু দরদ ঢেলে দিয়ে তারা মানুষকে আল্লাহর প্রতি ডেকেছেন।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) চুমো দিয়েছেন চোরের পা

ঘটনাটি শুনেছি আব্বাজান মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.) থেকে। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একজন মানুষকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলন্ত দেখতে পেলেন। লোকটির একটি হাত ও একটি পা কর্তিত। লোকদের কাছে তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা উত্তর দিলো, চুরি করা এ ব্যক্তির স্বভাবে পরিণত হয়েছিলো। প্রথমবার ধরা খাওয়ার পর তার

হাত কাটা হয়েছিলো। দ্বিতীয়বার ধরা খাওয়ার পর তার পা কেটে দেয়া হয়েছিলো এবং এবার তৃতীয়বার তাকে একেবারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। লোকদের মুখে এ চোরের বৃত্তান্ত শোনার পর জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) অগ্রসর হলেন এবং চোরের অবশিষ্ট পায়ে চুমো দিলেন। লোকেরা এ কাণ্ড দেখে খুবই বিস্মিত হলো এবং জুনাইদ বাদগাদী (রহ.)-কে বললো, আপনি এ কী করলেন! জানেন, এ লোকটি কত বড় চোর!

জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ জানি। তবে যদিও সে মহাপাপী, যার কারণে আজ তার এ পরিণতি, কিন্তু তার মধ্যে একটি ভালো গুণও আছে। এই গুণটি হলো, 'ইসতেকামাত' তথা লেগে থাকার গুণ, কাজের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার গুণ। চুরি করার দায়ে তার হাত কাটা গেছে, তবুও সে চুরি ছাড়েনি, পা কাটা গেছে, তবুও সে চুরিতে অটল, অবশেষে এই চুরির জন্য সে নিজের জীবনটিও দিয়ে দিয়েছে। এ লেগে থাকার গুণ এত বড় গুণ, যদি সে এটিকে অপাত্রে ব্যবহার না করে যথাক্ষেত্রে ব্যবহার করতো, না জানি সে কত বড় অলী হতো! আমি চুমো দিয়েছি এজন্য যে, আল্লাহ যেন লোকটির ইসতেকামাতের গুণ আমার ইবাদাত ও আমলে সৃষ্টি করে দেন।

সারকথা হলো, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ কোনো মানুষকেই ঘৃণা করতেন না। বরং তার গুনাহ ও নাফরমানীকে ঘৃণা করতেন। তাঁরা বলতেন, একজন খারাপ লোকের কাছেও যদি কোনো ভালো গুণ থাকে, তাহলে সেটাকেও গ্রহণযোগ্য মনে করতে হবে। সাথে সাথে তার খারাপ গুণগুলো দূর করার ফিকির করতে হবে। তাকে কোমলতা ও ভালোবাসা মিলিয়ে উপদেশ দিতে হবে। অপরের কাছে তার সমালোচনা করা যাবে না।

এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়নাস্বরূপ

হাদীস শরীফে এসেছে–

اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ۔ (ابوداؤد, كتاب الادب, باب فى ال)

'একজন ঈমানদার অপর ঈমানদারের জন্য আয়নার মতো।'

মানুষের চেহারায় দাগ বা ময়লা পড়লে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তখন আয়না নীরবে বলে দেয় যে, তোমার চেহারায় এ দাগটি আছে। অনুরূপভাবে একজন ঈমানদার ব্যক্তিও অপর ঈমানদার ব্যক্তির জন্য আয়নার মতো। একজন অপরজনের দোষ-ত্রুটি নীরবে বলে দিবে। দরদমাখা কথা দিয়ে অপরজনের দোষটি ধরিয়ে দেবে। যেমন কারো গায়ের উপর বিষাক্ত কোনো পোকা বা পতঙ্গ বসলে যেমনিভাবে অপরজন চুপ করে বসে থাকে না,

বরং মহব্বতের সঙ্গে বলে দেয়। অনুরূপভাবে একজন অপরজনের দোষ-ত্রুটির কথা বলবে। তবে মহব্বতের সঙ্গে বলতে হবে এবং শুধু তাকেই বলতে হবে।

একজনের দোষের কথা অপরজনকে বলো না

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, এক মুমিন অপর মুমিনের দোষ ধরিয়ে দিবে, কিন্তু এটা কেবল দোষী ব্যক্তিকেই। এ দোষের কথা দ্বিতীয় কারো কাছে মোটেও বলা যাবে না। কারণ, এ হাদীসে মুমিনকে আয়নার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর আয়না শুধু ওই ব্যক্তির দাগ বা ময়লা ধরিয়ে দেয়, যার চেহারায় দাগ বা ময়লা আছে। আয়না অন্য কাউকে একথা বলে না যে, অমুকের চেহারায় দাগ আছে।

একজনের দোষের কথা অপরের কাছে বললে বুঝতে হবে, সেখানে স্বার্থ জড়িত আছে। সুতরাং সেখানে ইখলাসের অভাব আছে। আর ইখলাসশূন্য আমল কখনও কবুল হয় না। পক্ষান্তরে দরদ ও ইখলাসপূর্ণ কথায় স্বার্থপরতার গন্ধ থাকে না এবং তা আল্লাহর দরবারে কবুলও হয়।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে বুঝবার ও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

দ্বীনী মাদরাসাসমূহ দ্বীন হেফাযতের সুদৃঢ় কেল্লা

"একটি গোষ্ঠি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, আলেম-উলামা ও মাদরাসার ছাত্রদের গায়ে দুর্গন্ধ লেপনের জন্য। মাদরাসা-সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয় মানুষের সামনে হেয়-প্রতিপন্ন করে উপস্থাপনা করাই যেন এদের একমাত্র কাজ। জেনে রাখুন, এরা ইসলামের দুশমন। এ দুশমনেরা একথা ভালো করেই জানে যে, এ পৃথিবীর বুকে আজও যাঁরা ইসলামের পক্ষে ঢাল হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁরা এ মাদরাসা -পড়ুয়াই। যতদিন এ জমিনের বুকে এসব মোল্লা-মৌলভীর অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন পর্যন্ত 'ইনশাআল্লাহ' এ জমিনের বুক থেকে ইসলামের নিশানা তারা মিটিয়ে দিতে পারবে না।"

দ্বীনী মাদরাসাসমূহ দ্বীন হেফাযতের সুদৃঢ় কেল্লা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًاكَثِيْرًا ـ اَمَّابَعْدُ!

হামদ ও সালামের পর!

হযরত উলামায়ে কেরাম, সুপ্রিয় ছাত্রবৃন্দ, সম্মানিত উপস্থিতি,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু।

ভূমিকা

আমার মুহতারাম উসদাত শাইখুল হাদীস মাওলানা সাহবান মাহমূদ (দা. বা.) এর দরসের পর আমার কথা বলা সাজে না। কারণ, তাঁর দরসের পর নতুন করে কিছু বলার অবকাশ নেই। তবুও হযরতের নির্দেশে কিছু কথা বলতে হচ্ছে। তাছাড়া খতমে বুখারী অনুষ্ঠানে আমার মুহতারাম ভাই, দারুল উলূমের সদর হযরত মাওলানা মুফতি রফী' উসমানী (দা. বা.) কিছু কথা বলে থাকেন। বর্তমানে তিনি সফরে আছেন, তাই আমার মুহতারাম উসতাদ নির্দেশ দিলেন মুহতারাম ভাইয়ের পরিবর্তে আমাকে কিছু কথা বলার। সে সুবাদে আপনাদের সামনে কিছু বলতে চাই।

আল্লাহর অসীম দয়া ও করুণা, যার শোকর কোনোভাবেই আদায় করা যাবে না যে, তিনি আজ দারুল উলূমের শিক্ষাবর্ষ পূর্ণতায় পৌছানোর তাওফীক দান করেছেন। আজ শেষ দরস, মুবারক দরস। আল্লাহ আমাদের অংশগ্রহণের সৌভাগ্য দান করেছেন। সহীহ বুখারীর আখেরি দরস এটি।

এ জমিনের বুকে আল্লাহর কিতাবের পর সবচে' বিশুদ্ধ গ্রন্থ হলো ইমাম বুখারী (রহ.) এর এ গ্রন্থটি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছাত্রদেরকে এর দরস দ্বারা বরকতওয়ালা ফয়েযসিক্ত করেছেন। আজ আলহামদুলিল্লাহ এ পবিত্র ধারার সমাপনী দরস। এরই সঙ্গে দারুল উলূমের শিক্ষাবর্ষও আজ সমাপ্তিতে পৌঁছেছে। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে এটা জানার উপায় ছিলো না যে, কে আজ এর আখেরি দরসে শরিক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে। আল্লাহ তাআলা নিজ দয়ায় ও মহিমায় আজ আমাদের সেই সুযোগ দিয়েছেন। এজন্য যতই শোকর করি না কেন, তা অপ্রতুলই হবে বৈ কি।

আল্লাহর নেয়ামত অফুরন্ত

এ বিশ্ব চরাচরের অফুরন্ত নেয়ামত মানুষকে আল্লাহ দিয়েছেন। শুধু নিঃশ্বাস নামক নেয়ামতটির প্রতি দেখুন। কত মহান নেয়ামত এটি। হযরত শায়খ সা'দী (রহ.) একেবারে সরল ভাষায় এর গুরুত্ব এভাবে বুঝিয়েছেন যে, প্রত্যেক মানুষের প্রতিটি নিঃশ্বাসে রয়েছে আল্লাহর দু'টি নেয়ামত। শ্বাস নেয়া একটি নেয়ামত। নিঃশ্বাস ত্যাগ করা আরেকটি নেয়ামত। নিঃশ্বাস ভেতরে না গেলে মৃত্যু আসবে। ভেতর থেকে বের না হলেও মরণ চলে আসবে। এভাবে যেন একটি নিঃশ্বাসের মাঝে রাখা হয়েছে দু'টি নেয়ামত। প্রতি নেয়ামতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব। কাজেই একটিমাত্র নিঃশ্বাসে আল্লাহর দু'টি শোকর আদায় করা বান্দার ওপর ওয়াজিব। অন্যান্য নেয়ামত তো দূরের কথা, মানুষ শুধু এ নিঃশ্বাসের শোকরও আদায় করতে পারবে না। এভাবেই আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি আমাদের ওপর বর্ষিত হচ্ছে। তাঁর নেয়ামত অফুরন্ত, অগণিত।

সবচে' বড় নেয়ামত

এতসব নেয়ামতের মধ্যে সবচে' বড় নেয়ামত, সবচে' শানদার নেয়ামত, যে নেয়ামতের সামনে অন্যসব নেয়ামত গৌণ, তাহলো ঈমানের নেয়ামত। আল্লাহ নিজ দয়া ও মহিমায় আমাদের দান করেছেন এ ঈমানের নেয়ামত। এ মহান নেয়ামতের মূল্য আজ আমাদের কাছে নেই। কারণ, পিতৃ ও মাতৃসূত্রে আমরা এটি লাভ করেছি। এ নেয়ামত পাওয়ার জন্য কোনো দৌড়-ঝাপ করতে হয়নি, কষ্ট-ক্লেশ পোহাতে হয়নি কিংবা কোনো কুরবানি পেশ করতে হয়নি। এজন্য এর কদর আমাদের কাছে নেই। এর মূল্যও আমাদের জানা নেই।

এর মূল্য কত তা বেলাল হাবশী (রা.), সুহাইল রুমী (রা.) ও যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) কে জিজ্ঞেস করুন। যাঁরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-কে অর্জন করার জন্য হাজারো কষ্ট মাথা পেতে নিয়েছেন, রক্তের নজরানা পেশ করেছেন, তারপর এ দৌলত অর্জন করেছেন। আর আমরা তো

ঘরে বসে এ দৌলত পেয়েছি, তাই এর কদর আমাদের জানা নেই। অন্যথায় এ নেয়ামত হলো সবচে' বড় নেয়ামত।

ঈমানের পর সবচে' মূল্যবান নেয়ামত হলো ঈমানের দাবী সম্পর্কে ইলম লাভ করার নেয়ামত। ঈমান মানুষের কাছে কী দাবী করে, এর কারণে কোন কোন ফরয ও ওয়াজিব আরোপিত হয়– এ বিষয়গুলো জানা হলো ঈমানের পর সবচে' বড় নেয়ামত।

দ্বীনি মাদরাসা এবং প্রোপাগাণ্ডা

বর্তমানে বিভিন্ন স্লোগান, প্রোপাগাণ্ডা ও অভিযোগ এসব দ্বীনি মাদরাসার বিরুদ্ধে ফেনায়িত করা হচ্ছে। বাঁধভাঙ্গা অভিযোগ ও তিরস্কারের মাধ্যমে এসব মাদরাসাকে দমিয়ে দিতে চাচ্ছে। এসব অভিযোগ ও অপবাদ যেমনিভাবে ইসলামের দুশমন, ইসলামের উত্থানের দুশমন ও পৃথিবীর বুকে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হওয়ার কথা শুনলে যাদের গাত্রদাহ শুরু হয় তাদের পক্ষ থেকে আসছে, তেমনিভাবে মাঝে মাঝে সেসব লোকও এসব অপপ্রচারের জালে আটকা পড়েন, যারা দ্বীনের সঙ্গে নিজেদের জুড়ে রাখতে ভালোবাসেন। সচেতন কিংবা অসচেতনভাবে তারাও বিভিন্ন নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করে বসেন।

মাওলানাদের প্রতিটি কাজের ওপর অভিযোগ

আব্বাজান মুফতি শফী (রহ.) মাঝে মাঝে হাস্যচ্ছলে বলতেন, 'এসব মাওলানা তিরস্কারাক্রান্ত দল'। অর্থাৎ বিশ্বের কোথাও কোনো কুকর্মকাণ্ড ঘটলেই আলেমসমাজকে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। আলেমসমাজ কোনো কাজ করলে তার মধ্যে খুঁত বের করার কসরত করা হয়। যদি তাঁরা চারদেয়ালের ভেতর বসে 'আল্লাহু-আল্লাহু' জপেন, 'ক্বালাল্লাহ-ক্বালার রাসূলে'র দরসে ব্যস্ত থাকেন, তখন অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, মৌলভীরা দুনিয়া সম্পর্কে সচেতন নন। দুনিয়ায় যেদিকেই যাক, তারা তাদের বিসমিল্লাহ'র ঝুপড়ি থেকে বের হওয়ার ফুরসত পান না। অপরদিকে তারা যদি সমাজশুদ্ধি নিয়তে বের হন, তখন অভিযোগ তোলা হয়, মৌলভীদের কাজ তো ছিলো মাদরাসার চার দেয়ালের ভেতর বসে থাকা, 'আল্লাহ-আল্লাহ' করা, অথচ এখন তারা রাজনীতি করছে, রাষ্ট্রযন্ত্রে হস্তক্ষেপ করছে।

যদি কোনো আলেম অভাবগ্রস্ত হন, তখন প্রশ্ন ওঠে, মোলভীরা মাদরাসার ছাত্রদেরকে না খাইয়ে মারতে চান। আর যদি কোনো আলেম সম্পদশালী হন, তখন অভিযোগ ওঠে, মাওলানা সাহেবের কাছে এত টাকা থাকবে কেন? মোটকথা এ মৌলভী-মাওলানারা কোনোভাবেই যেন নিষ্কলুষ নন,

কোনোভাবেই তারা অভিযোগমুক্ত নন। এজন্যই মুফতী শফী (রহ.) এর ভাষায়– এরা 'তিরস্কারাক্রান্ত দল'।

এরা ইসলামের ঢাল

একটি গোষ্ঠি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, আলেম-উলামা ও মাদরাসার ছাত্রদের গায়ে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য। মাদরাসা-সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয় মানুষের চোখে হেয়প্রতিপন্ন করে উপস্থাপনা করাই যেন তাদের একমাত্র কাজ। জেনে রাখুন, এরা ইসলামের দুশমন। ইসলামের দুশমনেরা একথা ভালো করেই জানে যে, আজও এ পৃথিবীর বুকে যাঁরা ইসলামের পক্ষে ঢাল হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁরা এ মাদরাসা-পড়ুয়া লোকেরাই। যতদিন এ জমিনের বুকে এসব মোল্লা-মৌলভীর অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন পর্যন্ত 'ইনশাআল্লাহ' আবারও বলছি– 'ইনশাআল্লাহ' এ জমিনের বুক থেকে ইসলামের নিশানা তারা মিটিয়ে দিতে পারবে না। আমরা এ অভিজ্ঞতা বারবার অর্জন করেছি যে, পৃথিবীর যেখানেই ইসলামের অবকাঠামো নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে এবং ইসলামবৈরী শক্তির ষড়যন্ত্র ষোলকলায় পূর্ণ করা হয়েছে, সেখানেই সর্বপ্রথম এ মাওলানাদের নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়েছে। তারপর তাদের ষড়যন্ত্র সফলতার মুখ দেখেছে।

আল্লাহ তাআলা আমাকে বিশ্বের বহু রাষ্ট্র দেখিয়েছেন। মুসলিম বিশ্বের এমন অঞ্চলেও আমি গিয়েছি, যেখানে এসব মাদরাসার বীজ নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর পরিণাম কত করুণ ও ভয়াবহ হয়েছে, তাও আমি দেখেছি। রাখালকে হত্যা করার পর বকরির পালের যেমন কোনো রক্ষাকারী থাকে না, বরং হিংস্র বাঘ যখন যেভাবে মনে চায় পালের ওপর হামলে পড়ে, বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সেসব অঞ্চলের অবস্থাও প্রকৃতপক্ষে এর থেকে ভিন্ন নয়।

বাগদাদে দ্বীনি-মাদরাসার খোঁজে

আমি বাগদাদেও গিয়েছি। এ সেই বাগদাদ, যেখানে কয়েক শতাব্দীব্যাপী মুসলিম বিশ্বের রাজধানী ছিলো। আব্বাসি খেলাফতের শৌর্য-বীর্য দুনিয়ার মানুষ সেখান থেকেই দেখেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বকে উষ্ণ করেছিলো এ বাগদাদ। সেখানে যাওয়ার পর একজনকে জিজ্ঞেস করি, এখানে কোনো মাদরাসা আছে কিনা? এমন কোনো প্রতিষ্ঠান আছে কিনা, যেখানে দ্বীনি-ইলম শিক্ষা দেয়া হয়? আমি একটু দেখতে চাই।

তখন আমাকে জানানো হলো, এখানে এ জাতীয় কোনো মাদরাসা বা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই নেই। মাদারাসাগুলো স্কুল কিংবা কলেজে পরিণত হয়েছে। দ্বীনি-শিক্ষার জন্য এখন রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি। সেসব

ফ্যাকাল্টিতে দ্বীনিয়াতও শেখানো হয়। তাদের শিক্ষকদের দেখে আলেম তো দূরের কথা, মুসলমান কিনা– এ সন্দেহ হবে। এসব প্রতিষ্ঠানে এখন সহশিক্ষার প্রচলন আছে। নারী-পুরুষ একই সঙ্গে পড়ালেখা করে। ইসলাম শিক্ষা দেয়া হয় বটে, তবে তা শুধু একটি মতবাদ হিসাবে শিক্ষা দেয়া হয়। ঐতিহাসিক দর্শন হিসাবে ইসলাম সম্পর্কে শেখানো হয়, বাস্তবজীবনে যার কোনো কার্যকারিতা নেই। ওরিয়েন্টালিস্টরা যেমনিভাবে ইসলামের ওপর ডিগ্রি নেয়, তেমনিভাবে এখানকার ছাত্ররাও নেয়।

বলাবাহুল্য, বর্তমানে আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতেও ইসলাম শিক্ষা রয়েছে। হাদীস, ফিকাহ ও তাফসীরশাস্ত্রও তাদের সিলেবাসভুক্ত। তাদের প্রবন্ধ নিবন্ধ পড়লে আপনি এমন সব কিতাবের নামও পাবেন, যেগুলোর নাম আমাদের বহু আলেম মোটেও শোনেন নি। এসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ দৃশ্যত খুবই গবেষণা-সমৃদ্ধ। কিন্তু যে ইসলামী-শিক্ষা তাদেরকে ঈমানের দৌলত দিতে পারে না, সেই শিক্ষা অন্তসারশূন্য নয় কি? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইসলাম শিক্ষার সমুদ্রে ডুবে থাকার পরেও যারা ব্যর্থতার গ্লানি দূর করতে পারে না এবং সেই সমুদ্রের পানি কণ্ঠনালীর নীচে নামাতে পারে না, সেই শিক্ষার মূল্যই বা কী? পাশ্চাত্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শরীয়া-ফ্যাকাল্টি আছে, উসূলুদ্দীন ফ্যাকাল্টি আছে, কিন্তু এর কোনো প্রভাব বাস্তব-জীবনে নেই। মূলত এসব ইলম ও শিক্ষার রুহ মিটিয়ে দেয়া হয়েছে।

যাক, তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোনো মাদরাসা যখন নেই, কী আর করা, তাহলে আমাকে এমন কোনো আলেমের সন্ধান দিন, যিনি সনাতন-পদ্ধতির অনুসারী, আমি তার সঙ্গে দেখা করবো। আমার আগ্রহ দেখে তারা আমাকে বললো, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) এর মাজারের কাছে একটি মসজিদ আছে। সেই মসজিদ-সংলগ্ন একটি মক্তব আছে। সেখানে একজন পুরাতন শিক্ষক আছেন, যিনি পুরাতন পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এ তথ্য পেয়ে আমি সেই শিক্ষকের খোঁজে বের হলাম এবং খুঁজতে খুঁজতে তাঁর খেদমতে পৌঁছে গেলাম। তাঁকে দেখেই বুঝলাম, বাস্তবেই ইনি একজন বুযুর্গ আলেম। আমার মনে হলো, আমি কোনো আল্লাহ ওয়ালা আলেমের সংস্পর্শে এসে পৌঁছেছি। লক্ষ্য করলাম, তিনি চাটাইয়ের ওপর বসে পড়ান। পরিধানে মোটা-সোটা কাপড়। জুতোও সাধারণ। চেহারার ওপর আল্লাহর ফযলে ইলমের ঝলকও দেখতে পেলাম। কিছুক্ষণ তাঁর খেদমতে বসার পর মনে হলো। আমি এক বেহেশতি-পরিবেশে এসে পড়েছি।

মাদরাসা বিলুপ্তি বরদাশত করো না

সালাম দু'আর পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোত্থেকে এলেন? বললাম, আমি পাকিস্তান থেকে এসেছি। তারপর তিনি দারুল উলূম সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন যে, যে মাদরাসায় আপনারা পড়েন- পড়ান সেই মাদরাসাটি কী ধরনের মাদরাসা? আমি তাঁকে বিস্তারিত উত্তর দিলাম। জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে কী পড়ানো হয়? কি কি কিতাব আপনাদের সিলেবাসে আছে? আমি যেসব কিতাব আমাদের মাদরাসাগুলোতে পড়ানো হয়, সেগুলোর নাম বললাম। কিতাবগুলোর নাম শুনে তিনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন এবং অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। চোখের পানি টপটপ করে পড়ছে আর তিনি বলে যাচ্ছেন, এসব কিতাব এখনও তোমাদের মাদরাসাগুলোতে পড়ানো হয়? আমি বললাম, 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়ানো হয়। বললেন, আহ্, আমরা তো আজ এসব কিতাবের নাম শোনা থেকে মাহরুম হয়ে গিয়েছি। এখন যখন নাম শুনলাম, আমার কান্না চলে এসেছে। এসব কিতাব আল্লাহওয়ালা সৃষ্টি করতো। সত্যিকারের মুসলমান তৈরি করতো। আমাদের দেশ থেকে আজ এসব কিতাব উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি আপনাকে নসিহত করছি, আমার এ পয়গাম আপনি আপনার দেশে আলেমসমাজ ও জনগণের কাছে পৌঁছিয়ে দিবেন। তাদেরকে বলবেন, আল্লাহর ওয়াস্তে সবকিছু বরদাশত করলেও এসব মাদরাসা বিলুপ্ত হওয়া কখনও বরদাশত করো না। ইসলামের দুশমনেরা এ কথা খুব ভালোভাবেই জানে যে, যতদিন এসব সাদা-সিধে মৌলভীরা সমাজের মাঝে থাকবে, ততদিন মুসলমানদের অন্তর থেকে ঈমানের বাতি নিভিয়ে দিতে পারবে না। এজন্যই ইসলামের দুশমনেরা এসব মাদরাসার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর জন্য নিজেদের সকল মিশনারিকে লাগিয়ে রেখেছে।

ধর্মীয় চেতনাবোধ বিলুপ্ত হওয়ার চিকিৎসা

প্রাচ্যের কবি আল্লামা ইকবাল সম্পর্কে একথা প্রসিদ্ধ যে, তিনি মোল্লা-মৌলভীকে তিরস্কারমূলক বাক্য বলেছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি এমন কথাও বলেছেন যে, যা মানুষকে বাস্তবতার ভুবনে নিয়ে যায়। এক জায়গায় ইংরেজ তথা ইসলামের দুশমনদের মুখপাত্রের ভূমিকায় তিনি আফগানিস্তানের ব্যাপারে বলেছিলেন–

افغانیوں کی غیرت دین کا یہ علاج

ملا کو ان کو کوہ و دمن سے نکال دو

'যদি আফগানিদের ধর্মীয় চেতনাবোধ বিলুপ্ত করতে চাও, তবে একটাই পথ। তাহলো মোল্লা-মৌলভীদের সমাজ থেকে বের করে দাও। যতদিন এরা সমাজে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আফগান জনসাধারণের অন্তর থেকে ধর্মীয় চেতনাবোধ বের করতে পারবে না।'

মাদরাসাগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ

সেকেলে, চৌদ্দশ বছর পূর্বের লোক, দুনিয়া সম্পর্কে অসচেতন, দুনিয়াতে বসবাসের উপযোগী নয়, এদের কাছে জাগতিক কোনো জ্ঞান-বুদ্ধি নেই, মুসলিম-উম্মাহকে এরা উল্টো পথে নিয়ে যাচ্ছে– এ জাতীয় প্রোপাগ্রাণ্ডা বিভিন্নভাবে ধূমায়িত করা হচ্ছে। এসব অপপ্রচার চলছে মাদরাসা-শিক্ষিতদের বিরুদ্ধে।

এমনকি এ অপবাদও দেয়া হচ্ছে যে, দ্বীনী মাদরাসা হলো, সন্ত্রাস সৃষ্টির কারখানা, প্রগতির পথে অন্তরায়, উন্নতির দুশমন, মৌলবাদের আড্ডাখানা, সঙ্কীর্ণমনাদের প্রতিষ্ঠান। মোটকথা অপবাদের বৃষ্টি, অভিযোগের ঝড়– সবই এসব বেচারা মৌলভীদের ওপর, তবুও যেন এরা বিলুপ্ত হতে চায় না।

মৌলভীদের প্রাণ বড়ই শক্ত

আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) বলতেন, মৌলভীদের প্রাণ বড়ই শক্ত। তাদের ওপর অপবাদের ঝড় যতই তীব্র হোক, তারা সব সহ্য করতে পারে, কারণ এরা এ দলে, এ পরিবেশে আসার পূর্বেই 'আলহামদুলিল্লাহ' কোমর শক্ত করে আসে। তাদের এটা জানা থাকে যে, এসব অপবাদ আমাকে সহ্য করতে হবে। দুনিয়া আমাদের খারাপ বলবে। তাই এসব তিরস্কার মাথা পেতে নিয়ে, এসব অপবাদকে সাধুবাদ জানিয়ে তারা মৌলভীদের জগতে প্রবেশ করে–

جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں

এ গলিতে তো তারাই আসে, যারা জানে, আমাকে অনেক কষ্ট পোহাতে হবে। আল্লাহ যাকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন, সে ভালো করেই জানে যে, এসব অপবাদ তার জন্য গলার মালা, তার মাথার মুকুট। এটা আম্বিয়ায়ে কেরাম থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ। কেয়ামত পর্যন্ত এ সম্পদ মৌলভীদেরই বহন করতে হবে। আম্বিয়া কেরামও এ পথে কষ্ট সহ্য করেছেন। অপবাদের ঝড় তাদের ওপরও বয়েছিলো।

আল্লাহ আমাদেরকে ইখলাস দান করুন। সঠিক পথে পরিচালিত করুন। তাঁরই সন্তুষ্টির ফিকির দান করুন। আমীন।'

মূলত এসব অবজ্ঞা ও পরিহাস ক্ষণস্থায়ী। এগুলোর কোনো হাকীকত নেই। 'ইনশাআল্লাহ' মৌলভী সাহেবরা, একদিন এমন অবস্থানে আসবে যে–

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ

'তারা কাফেরদেরকে উপহাস করবে।' (আততাতফীফ-৩৪)

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

'প্রকৃতপক্ষে মর্যাদা, আভিজাত্য ও শক্তি তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরই।' (সূরা আল মুনাফিকূন-৮)

কাজেই তুফান আসবে, এতে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। যতদিন এ পৃথিবীর বুকে এ দ্বীনের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন 'ইনশাআল্লাহ' এসব মাদরাসাও আল্লাহ টিকিয়ে রাখবেন।

মৌলভীদের রিযিকের ফিকির তোমাদের করতে হবে না

বর্তমানে আওয়াজ তোলা হচ্ছে, বারবার কান গরম করা হচ্ছে যে, এসব মাদরাসা বন্ধ করে দাও। এগুলো মিটিয়ে দাও। এমন লোকও আছেন, যারা শত্রুতাবশত নয় বরং দরদ ও মায়াবশত এসব স্লোগানের সঙ্গে নিজেদের জুড়ে দিচ্ছে। কখনও তারা সংস্কারের তাগিদও দেখাচ্ছে।

কখনও তারা বলছে, মৌলভীদের রুযি-রোজগারের কোনো ব্যবস্থা নেই, তাই তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরি শিক্ষাও রাখা জরুরি। দর্জির কাজ, কামারের কাজ কিংবা এমন কোনো হাতের কাজ তাদের শেখানো প্রয়োজন, যদ্বারা তারা ইনকামের পথ খুঁজে নিতে পারে। লোকেরা প্রস্তাব নিয়ে আসে যে, মৌলভীদের জন্য কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থার দ্বার উন্মুক্ত করা হোক।

আমার আব্বাজান বলতেন, আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা এসব ফিকির ছেড়ে দাও। মৌলভীদের রিযিকের ফিকির তোমাদের করতে হবে না। তাদের ফিকির তারা করবে। তাদের ইনকামের পথ তারা খুঁজে নিবে। এমন একজন মৌলভীর সন্ধান দাও, যে না খেয়ে মারা যাচ্ছে। ক্ষুধার তাড়নায় আত্মহত্যা করেছে। আমি বহু ডিগ্রিধারী দেখাতে পারবো, পিএইচডি করেছে, মাস্টার্স করেছে অথচ চাকুরির খোঁজে জুতা ক্ষয় করছে। এমনকি চাকরি না পেয়ে আত্মহত্যাও করেছে। কিন্তু এমন একজন মৌলভী দেখাও, যাকে বেকার বলা যাবে। আল্লাহর রহমতে মৌলভীদের কাছে সুখ আছে, শান্তি আছে, কর্মব্যস্ততা আছে, রিযিকেরও ব্যবস্থা আছে এবং অন্যদের তুলনায় ভালোই আছে।

দুনিয়াটাকে পরাজিত কর

আমার তালিবে ইলম বন্ধুগণ! এ দুনিয়ার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, খুবই বিশ্রী ও বিরক্তির বৈশিষ্ট্য। তাহলো, মানুষ এ দুনিয়ার পেছনে যত বেশি দৌড়াবে,

দুনিয়া তত বেশি দূরে সরতে থাকবে। আর দুনিয়া থেকে যত বেশি পালাবে, দুনিয়া তত বেশি আঁকড়ে ধরবে। কোনো ব্যক্তি এর চমৎকার উদাহরণ দিয়েছে এভাবে যে, দুনিয়াটা হলো, মানুষের ছায়ার মতো। কেউ যদি ছায়াটাকে ধরার জন্য তার পেছনে দৌড়ায়, তাহলে ছায়া তার চোখের সামনে নেচে নেচে পালায়। কিন্তু কেউ যদি ছায়াটাকে ফেলে রেখে উল্টোভাবে দৌড়ায়, তাহলে ছায়াও তার পেচনে দৌড়াতে থাকে। এ দুনিয়াটাও ঠিক অনুরূপ। তার রূপ-রস, গন্ধ যত বেশি কামনা করবে, সে তত বেশি পালাবে। কিন্তু কেউ যদি হৃদয়ের দীপ্তি নিয়ে দুনিয়াটাকে ছাড়তে পারে, তাহলে দুনিয়া তার কাছে আপন খোলস ফাটিয়ে দুর্বল হয়ে ধরা দিবে। মূলত দুর্বলতাই হলো দুনিয়ার আসল রূপ।

আল্লাহর যেসব বান্দা আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখেছে, দ্বীনের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছে এবং এজন্য দুনিয়াকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, সেসব বান্দার মর্যাদা ও সমৃদ্ধির প্রতি একটু নজর বুলিয়ে দেখুন; ঈর্ষা জাগবে। কারণ, আল্লাহ তাদেরকে সুখে রেখেছেন। প্রাণের দীপ্তিতে তাঁরা ঝলমল থাকেন সারাক্ষণ। মর্যাদা, গৌরব ও উচ্চ মনুষ্যত্বের জীবন্ত নমুনা তো তারাই, যারা দুনিয়াকে দূরে ঠেলে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁদের মত সদাপ্রাচুর্য দান করেন। আমীন।

এই জন্যই বলি, মোল্লা-মৌলভীর রুটি-রুজির ফিকির তোমাদের করতে হবে না। মুফতি শফী (রহ.) বলতেন, আল্লাহ তাআলার কত মানুষকে রিযিক দান করেন। এমনকি গাধা ও শূকরের রিযিকের ব্যবস্থাও তিনি করেন। তাহলে তাঁর দ্বীনের ধারক-বাহকদেরকে তিনি রিযিক দান করবেন না কেন? সুতরাং এদের জন্য তোমাদের এ মায়াকান্নার তো প্রয়োজন নেই।

মৌলভীদেরকে কামার ও ছুতার বানিও না

হৃদয়ে রেখাপাত করো, এ আন্দাযে মানুষের কাছে দ্বীনের পয়গাম পৌছাতে হলে জাগতিক শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। একজন ফকিহর যুগ ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি। এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জাগতিক শিক্ষা দান ও গ্রহণও দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মনে রাখবেন, একবার যদি মৌলভীদেরকে কামার ও ছুতার বানান, তাহলে তারা প্রকৃত সফলতা থেকে দূরে সরে যাবে। আমার আব্বাজান মুফতি শফী (রহ.) বলতেন, একজন মৌলভী কর্মকারের কাজ শিখেছে। সে ভেবেছে, এ কাজের মাধ্যমে আমি রুটি-রুজির ব্যবস্থা করবো। অবশিষ্ট সময়গুলোতে দ্বীনের খেদমত করবো, পারিশ্রমিক নিবো না। মনে রাখবেন, এ ধরনের মৌলভী সাহেব আজীবন কর্মকারই থেকে যায়, দ্বীনের খেদমত করার ভাগ্য তাদের জোটে না।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

এ সুবাদে আব্বাজান একটি ঘটনাও বলেছেন যে, দারুল উলূম দেওবন্দের এক প্রসিদ্ধ উস্তাদ ছিলেন মুফতি মুহাম্মদ মাহূল উসমানী (রহ.)। ইনি ছিলেন হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান (রহ.) এর খাছ শাগরিদ। ইলমে ও সাহিত্যে ছিলেন যথেষ্ট দক্ষ। দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষকতা করতেন। এ সময়ে তার মনে এলো, আমরা মাদরাসায় পড়িয়ে বেতন গ্রহণ করি। এটা তো শ্রমিকের শ্রমের মত হলো। দ্বীনের খেদমত তো হলো না। বিনিময়মুক্ত খেদমতই তো প্রকৃত খেদমত। অথচ আমরা বেতন গ্রহণ করি। আল্লাহ জানেন, এর কোনো সাওয়াব আমাদের নসিব হচ্ছে কিনা? অতএব, উপার্জনের ভিন্ন পথ বের করা দরকার। বিকল্প উপায়ে হালাল উপার্জন করতে পারলে অবসর সময়ে মাদরাসায় পড়াব। তখন মাদরাসা থেকে আর বেতন নিবো না।

এ জাতীয় চিন্তা তাঁর মনের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছিল। এরই মধ্যে একটি সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের প্রস্তাব তিনি পেলেন। তিনি ভাবলেন, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তো দু-একটা ক্লাস থাকে, সুতরাং দ্বীনের খেদমত করার পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে। তাই তিনি হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর কাছে এলেন এবং নিজের মনের কথা খুলে বললেন।

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) উত্তর দিলেন, ঠিক আছে যাও। তোমার অন্তরে যখন এ ধরনের খেয়াল চেপেছে, তাহলে যেতে পার। গিয়ে দেখ। হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) তাঁকে অনুমতি দিলেন। কারণ, মুফতি মাহূল (রহ.) এর মনের প্রচণ্ড ঝোক ওই দিকেই ছিলো। তাই শাইখুল হিন্দ (রহ.) বুঝলেন যে, বাধা দিলেও কাজ হবে না। সুতরাং অনুমতিই দিয়ে দেয়াই শ্রেয়।

যাক, অবশেষে মুফতি মাহূল (রহ.) দেওবন্দ থেকে চলে গেলেন। ছয়মাস পর এক ছুটিতে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে এলেন। তখন প্রথম সাক্ষাতেই হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মুফতি সাহূল! তোমার মাথা থেকে এ চিন্তা কী দূর হয়েছে যে, সরকারি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে গেলে দ্বীনের খেদমত করার ব্যাপক সুযোগ পাবে? বল তো, এই ক'মাসে কতটি কিতাব লিখেছ? কতটি ফতওয়া দিয়েছ? কত জায়গায় ওয়াজ করেছ?

শাইখুল হিন্দ (রহ.) এর প্রশ্ন শুনে তিনি চোখের পানি ছেড়ে দিলেন এবং উত্তর দিলেন, হযরত! এটা ছিলো শয়তানের ধোঁকা। কারণ, দারুল উলূমে থাকাকালীন যে খেদমত আল্লাহ আমাকে করার তাওফীক দিয়েছিলেন, এখান থেকে যাওয়ার পর এর অর্ধেক পরিমাণও খেদমত করার তাওফীক আমার হয়নি, অথচ সময় পেয়েছি বহুগুণ বেশি।

উক্ত ঘটনা শোনানোর পর আব্বাজান বলতেন, আল্লাহ তাআলা মাদরাসার পরিবেশে বিশেষ রহমত, বরকত ও নূর রেখেছেন। এ পরিবেশে থাকলেই দ্বীনের খেদমত করার তাওফীক হয়।

আল্লাহ সকলের মাঝে ইখলাস তৈরি করে দিন। এই যে বেতন দেয়া হয়– মূলত এটা বেতন নয়, বরং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু হাতখরচ। এতেই সন্তুষ্ট থাক, তাহলে ইনশাআল্লাহ দ্বীনের খেদমত করার সুযোগ হয়ে যাবে।

দরস-তাদরীসের বরকত

আমি নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলি, আশা করি আমার কথাটা সকলেই সমর্থন করবেন যে, দারুল উলূম যখন খোলা থাকে– সে সময়টা এবং বন্ধের সময়টার মাঝে একটু তুলনা করে দেখুন। দেখবেন, শত পরিকল্পনা সত্ত্বেও ছুটিকালীন সময়টা অযথাই চলে যায়। দরসের কারণে আল্লাহ বরকত দান করেন।

আখিরাত সাজানোই একজন তালিবে-ইলমের ক্যারিয়ার

প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত মারুফ কারখী (রহ.)। বাগদাদে তাঁর কবর রয়েছে। আমি 'আলহামদুলিল্লাহ' সেখানে গিয়েছি। একবারের ঘটনা। এ প্রসিদ্ধ বুযুর্গ নদীর পাড় ধরে বন্ধুদের সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। ওই সময়ে দজলা নদীর বুক চিরে একটি নৌকা যাচ্ছিলো, যার অধিকাংশ আরোহী ছিলো স্বাধীনচেতা যুবক। তারা নাচ-গান করছিলো। তারা যখন হযরত মারুফ কারখী (রহ.)-কে দেখলো, তখন তাদের দুষ্টুমি আরো বেড়ে গেলো। দু-একজন এ বুযুর্গকে লক্ষ্য করে দু-একটি কটু কথাও বললো।

এ অবস্থা হযরত মারুফ কারখী (রহ.) এর সাথী তাঁকে বললো, হযরত! এ স্বাধীনচেতা যুবকগুলো কত বড় বেয়াদব! নিজেরা নাচ-গানে মেতে আছে, আবার আল্লাহর ওলীদের শানেও গোস্তাখি করছে। আপনি এদের জন্য বদদুআ করুন। হযরত মারুফ কারখী (রহ.) হাত উঠালেন এবং আল্লাহর দরবারে দুআ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি এসব যুবককে এ দুনিয়াতে কত আনন্দ দান করেছেন, আখেরাতে এরূপ আনন্দ এদেরকে দান করুন।

এ দুআ শুনে সঙ্গের লোকটি বলে উঠলো, হযরত! আপনি তো বদদুআর স্থলে দুআ করে দিলেন। মারুফ কারখী (রহ.) উত্তর দিলেন, এতে আমার কী ক্ষতি? আমি তাদের জন্য আখেরাতের আনন্দ লাভের দুআ করেছি। আর আখেরাতের আনন্দ তখনই তো লাভ হবে, যখন এরা প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে।

মোটকথা, মাদরাসার শিক্ষার্থীরা মূলত হযরত মারুফ কারখী (রহ.) এর মত চেতনা নিয়েই বেড়ে ওঠে। অপর মুসলমানের কল্যাণকামিতা ও আখেরাতের মুক্তির কথাই ভাবে তারা। তাদের ক্যারিয়ার এটাই। এটাই তাদের ভবিষ্যত। সুতরাং এদেরকে নিয়ে কাউকে ভাবতে হবে না। আল্লাহই এদেরকে রক্ষা করবেন ইনশাআল্লাহ।

মাদরাসার আয় ও ব্যয়

মাদরাসায় লাখ লাখ টাকা ব্যয় হয়। অথচ এর কোনো বাজেট নেই। দ্বীনী মাদরাসা ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে এরূপ নজীর খুঁজে পাবেন না যে, এত বিশাল ব্যয়ের জন্য কোনো বাজেট নেই। আসলে বাজেট তো সেসব প্রতিষ্ঠানের জন্য, যেগুলোর আয়ের উৎস ও সূচি নির্দিষ্ট। আয় অনুপাতেই ব্যয়-বাজেট নির্ধারিত হয়। আর আমাদের মাদরাসাগুলো তো এমন যে, এগুলোর কোনো নির্দিষ্ট আয়ের উৎস নেই। লোকেরা আমাকে জিজ্ঞেস করে, এত টাকা পান কোথায়? আসলে কোথায় পাই– তা তো জানা নেই। বছরের শেষে দেখি, প্রয়োজনীয় সব কাজই 'আলহামদুলিল্লাহ' সম্পন্ন হয়ে গেছে। এসব কথা মোটেও বাড়াবাড়ি নয়। তবে আব্বাজান মুফতি শফী (রহ.) একটা শিক্ষা আমাদেরকে দিয়েছেন। তাহলো, যখন কোনো প্রয়োজন দেখা দিবে, তখন আল্লাহর দরবারে হাত উঠাও। তাঁর কাছে চাও, এতেই সব সমাধান হয়ে যাবে। 'আলহামদুলিল্লাহ' বাস্তবেই সমাধান হয়। আল্লাহ পূরণ করেন। এখানে আমাদের নিজস্ব কোনো কৃতিত্ব নেই। বুযুর্গদের দু'আ ও ইখলাসের বরকতে 'আলহামদুলিল্লাহ' সব কাজই সুন্দরভাবে চলছে। আল্লাহ নিজেই আমাদের অভিভাবক।

মাদরাসা দোকান নয়

আব্বাজান দারুল উলূম সম্পর্কে বলতেন, 'আমি কোনো দোকান খুলিনি যে, এটা সবসময় চলতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সহীহ উসূলের আওতায় চালাতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত চালাবে। অন্যথায় তালা লাগিয়ে দিবে। এর দ্বারা দ্বীনের ক্ষতি হলে তালা ঝুলিয়ে দিবে।' এ অসিয়ত করে আব্বাজান আমাদের থেকে বিদায় হয়ে গেছেন।

অতএব, কেউ যদি দ্বীনী মাদরাসাকে তার আপন লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়– 'ইনশাআল্লাহ' এটা হতে দেয়া হবে না। আমাদের নিঃশ্বাস যতদিন আছে, ইনশাআল্লাহ দ্বীনী মাদরাসার কায়া-কাঠামো কেউ পাল্টাতে পারবে না। 'ইনশাআল্লাহ' এগুলো এ মেজাজ নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত চলবে।

তোমরা নিজেদের কদর বোঝো

আমার তালিবুল-ইলম ভাইয়েরা! আপনারা ফারেগ হওয়ার পর এমন এক জগতে যাবেন, যেখানে তিরস্কারের তীরগুলো আপনাদের দিকে তাক হয়ে আছে। সুতরাং এ জগতের প্রতিটি অঞ্চলে এ তীরের আঘাত আপনারা পাবেন। তীর বৃষ্টি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে সর্বত্র। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনারা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সিপাহী।

আমাদের বুযুর্গ হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) এ মসজিদে বসেই একটি কথা বলেছিলেন। কথাটি হৃদয়ে গেঁথে নিন। তিনি বলেছিলেন, 'হে তালিবে ইলম! নিজের পরিচয় জানো।' আমিও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করছি। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে ইলমের দৌলত দ্বারা সম্মানিত করেছেন। তাঁর দ্বীনের খেদমতের জন্য নির্বাচিত করেছেন। এ মর্যাদা ও নেয়ামত দুনিয়ার সকল নেয়ামত ও সম্মানের চেয়েও অধিক মর্যাদাপূর্ণ। কাজেই তিরস্কারের দৃষ্টির মাঝেও তোমাদেরকে অবিচল থাকতে হবে। এ প্রত্যয় নিয়ে তোমরা বিশ্বের যেখানেই যাবে, 'ইনশাআল্লাহ' মাথা উঁচু করে থাকতে পারবে। তবে শর্ত হলো, যে ইলম তোমরা অর্জন করেছ, সে অনুযায়ী আমলও করতে হবে এবং দুনিয়ার বুকে তা ছড়িয়ে দেয়ার কোশেশ অব্যাহত রাখতে হবে। আল্লাহ প্রতিটি কদমে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, তোমাদের জন্য সফলতার বন্ধ দরজাগুলোও উন্মুক্ত করে দিবেন।

'আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সর্বদা দ্বীনের উপর অবিচল থাকা এবং ইলমের কদর করার তাওফীক দান করুন। আমীন। আল্লাহই আমাদের রক্ষক ও অভিভাবক।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

রোগ-শোক, দুঃখ-দুশ্চিন্তাও আল্লাহর নেয়ামত

"মানুষ বিভিন্ন ধরনের পেরেশানিতে থাকে। অসুস্থতার যন্ত্রনা, ঋনের বোঝা, সহায়-সম্বলহীনতার চাপ, বেকারত্বের বিস্বাদ কিংবা পারিবারিক টানাপড়েনসহ বিভিন্ন দুশ্চিন্তায় প্রায় প্রত্যেকেই জর্জরিত থাকে। এসব পেরেশানি দু'প্রকার। এক প্রকার পেরেশানি মূলত অভিশাপ। আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব ও গযব। অপরদিকে দ্বিতীয় প্রকার পেরেশানি, রহমত, যার মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ দু'প্রকার পেরেশানির মাঝে মানুষ পার্থক্য করবে কিভাবে? কিভাবে নির্ধারন করা হবে, এটা হচ্ছে প্রথম প্রকারের পেরেশানি আর ওটা দ্বিতীয় প্রকারের পেরেশানি?"

রোগ-শোক, দুঃখ-দুশ্চিন্তাও আল্লাহর নেয়ামত

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - اَمَّابَعْدُ!

فَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ' اَشَدُّالنَّاسِ بَلَاءً اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ -

পেরেশান অবস্থার জন্য সুসংবাদ

উক্ত হাদীসে সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ রয়েছে, যে ব্যক্তি বিভিন্ন পেরেশানিতে জর্জরিত, তবুও তাঁর সম্পর্ক আল্লাহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। যে আল্লাহর কাছে সর্বদা দু'আয় মগ্ন। দুআর মাধ্যমে সে এসব পেরেশানি থেকে মুক্ত পাওয়ার ফিকিরে মত্ত। এমন ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ তাআলা তাকে যদিও পেরেশানি দিয়েছেন, কিন্তু এর দ্বারা বান্দার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ উদ্দেশ্য নয়।

দু'প্রকারের পেরেশানি

মানুষ বিভিন্ন ধরনের পেরেশানিতে থাকে। অসুস্থতার কষ্ট, ঋণের বোঝা, সহায়-সম্বলহীনতার চাপ, বেকারত্বের বিস্বাদ কিংবা পারিবারিক টেনশনসহ

বিভিন্ন পেরেশানিতে প্রায় প্রত্যেকেই জর্জরিত থাকে। এসব পেরেশানি দু'প্রকার। এক প্রকার পেরেশানি মূলত অভিশাপ, আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব ও গযব। গুনাহর প্রকৃত শাস্তি যদিও আখেরাতের জন্য নির্ধারিত, কিন্তু কখনও কখনও তার কিঞ্চিত নমুনা এ পার্থিব জগতেও আল্লাহ দিয়ে থাকেন। যেমন কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ-

'আমি মহা শাস্তির পূর্বে অবশ্যই তাদেরকে মৃদু শাস্তি আস্বাদন করাব, যেন তারা সৎপথে ফিরে আসে।' (সূরা সিজদাহ ২১)

আর দ্বিতীয় প্রকার পেরেশানি হলো, যাঁর মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য হয়। তাই মাঝে মাঝে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এবং তাকে সাওয়াব তথা প্রতিদান প্রদানের জন্য এসব কষ্ট-দুর্দশায় পতিত করা হয়।

পেরেশানি আল্লাহর আযাব

কিন্তু উক্ত দু'প্রকার কষ্ট-ক্লেশ ও পেরেশানির মাঝে পার্থক্য করবে কিভাবে? কিভাবে নিরূপণ করা হবে, এটা হলো প্রথম প্রকার পেরেশানি এবং এটা হলো দ্বিতীয় প্রকার পেরেশানি?

মূলত এ দু'প্রকারের পেরেশানির আলামত ভিন্ন ভিন্ন। আর তাহলো, মানুষ যদি এসব কষ্টের চাপে, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার তাড়নায় আল্লাহকে ছেড়ে দেয়, তাকদীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ-অনুযোগ উত্থাপন করা শুরু করে। যেমন যদি বলে যে, এসব পেরেশানির জন্য শুধুই কি আমি? আমার ওপর এত মুসিবত কেন আসে? আর কাউকে কি পাওয়া যায় না? এ জাতীয় সমূহ অভিযোগ, হা-হুতাশ শুরু করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব বিধিবিধান তার ওপর ন্যস্ত, সেগুলো যদি ত্যাগ করে বসে। যেমন আগে নামায পড়তো, এখন পেরেশানির চাপে নামায ছেড়ে দিলো অথবা যিকির-আযকার ও বিভিন্ন আমলের গুরুত্ব তার কাছে খুব ছিলো, এখন সব ত্যাগ করে বসলো। অথচ পেরেশানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ছোটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি যথারীতি করে যাচ্ছে, কিন্তু তাওবা ও ইসতেগফার ছেড়ে দিয়েছে। দুআ-আমলের গুরুত্বও এখন তার কাছে নেই, তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, পেরেশানি তার ওপর আল্লাহর আযাব। আল্লাহ তাআলা সকল মুমিনকে এ জাতীয় পেরেশানি থেকে নিরাপদে রাখুন, আমীন।

পেরেশানি আল্লাহর রহমত

পক্ষান্তরে মানুষ যদি পেরেশানি আসার পর আল্লাহর দরবারে ফিরে যায়, তাঁর কাছে দুআ করে যে, 'হে আল্লাহ! আমি দুর্বল, এত কষ্ট সহ্য করার শক্তি আমার নেই। হে আল্লাহ! আমি বেদনা থেকে পরিত্রাণ চাই, আপনি দয়া করুন। যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট আমার দূর করে দিন।' এভাবে যদি সে দু'আ করে, আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে, যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট আল্লাহর কাছে প্রকাশ করে, পূর্বের তুলনায় আল্লাহর প্রতি তার আস্থা, ভক্তি, বিশ্বাস আরো বেড়ে যায়, তবুও তাকদিরের ওপর তার কোনো অভিযোগ নেই, বরং ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার, নামায-দু'আ যেন তার আরো জীবন্ত হয়ে ওঠে, তাহলে বুঝে নিতে হবে, এ প্রকারের পেরেশানি তার জন্য আল্লাহর রহমত, এর মাধ্যমে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে সাওয়াবের অধিকারী হচ্ছে, কারণ, আল্লাহর প্রতি তার অগাধ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ এ ধরনের পেরেশানি। আর আল্লাহও এ ব্যক্তিকে ভালোবাসেন।

কেউই পেরেশানমুক্ত নয়

প্রশ্ন হয়, মহব্বত ও ভালোবাসা শান্তি চায়, আরাম চায়। কেউ কাউকে ভালোবাসলে ভালোবাসার মানুষকে দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত রাখাই হলো প্রকৃত ভালোবাসার দাবি। কাজেই আল্লাহ তাঁর এ বান্দাকে পেরেশানমুক্ত রাখাটাই ছিলো যুক্তির কথা। তবুও আল্লাহ তাকে পেরেশানিতে রাখছেন কেন?

এর উত্তর হলো, এ জগতে কেউ পেরেশানমুক্ত থাকার আশা করতে পারে না। দুঃখ-কষ্ট, বেদনা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এমন কাউকে পাওয়া যাবে না। এমনকি নবী-রাসূল, ওলি, সূফি, রাজা, বাদশাহ কিংবা সম্পদশালী– সকলেই এ পেরেশানির সঙ্গে খুবই পরিচিত। কারণ, এ দুনিয়াটাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এভাবেই। এখানে সুখ-দুঃখ, আনন্দ- বেদনা, সুস্থতা-অসুস্থতা হাত ধরাধরি করে চলে। শুধু সুখ-আনন্দের ঠিকানা এ দুনিয়া নয়। শুধু সুখ-আনন্দের ঠিকানা হলো জান্নাত। যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন–

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ -

'ভয় উদ্বেগ কিংবা হতাশা ও পেরেশানি জান্নাতে নেই।'

সুতরাং জান্নাতই হলো আসল সুখের ঠিকানা। আর এ দুনিয়া হলো, সুখ-দুঃখের মধ্যবর্তী ঠিকানা। বসন্ত যেমনিভাবে তার উপর আনন্দের ঝর্না ঝরায়, তেমনিভাবে হেমন্ত তাকে শোকগাঁথা সঙ্গীত শুনিয়ে দেয়। বসন্ত আর

হেমন্ত, সুখ আর দুঃখ, আনন্দ আর নিরানন্দ একই সঙ্গে এখানে বসবাস করে। এজন্য দুঃখ- বেদনা থেকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে কেউ এখানে চলতে পারে না।

একটি উপদেশমূলক ঘটনা

হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) তাঁর 'মাওয়ায়েজ'-এ একটি ঘটনা লিখেছেন। হযরত খিযির (আ.) এর সঙ্গে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঘটে। সে খিযির (আ.) কে দেখে বললো, হযরত! আমার জন্য দুআ করুন, যেন সুখী হতে পারি। গোটা জীবন যেন দুশ্চিন্তামুক্তভাবে কাটিয়ে দিতে পারি। অসুস্থতা ও দুশ্চিন্তা যেন আমার নাগাল না পায়। খিযির (আ.) উত্তর দিলেন, এ জাতীয় দুআ করা সম্ভব নয়। কারণ, এ জগতে তো রোগ-শোক এক অনিবার্য ব্যাপার। তবে একটা কাজ করতে পার। তাহলো এমন একজন মানুষ খুঁজে বের কর, যে তোমার দৃষ্টিতে সুখী। পাওয়ার পর আমাকে জানাবে। তাহলে আল্লাহর কাছে আমি এ দুআ করবো যে, তিনি যেন তোমাকে তোমার স্বপ্নের মানুষের মত করে দেন।

খিযির (আ.) এর কথা শুনে তো লোকটি মহাখুশী। সে ভাবলো, এমন কত মানুষই তো আছে, কত মানুষ রস-আনন্দের মাঝে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। সুখী জীবন কাটাচ্ছে। এরপর লোকটি বের হয়ে পড়লো সুখী মানুষের সন্ধানে। কখনও এক ব্যক্তির বিত্ত-বৈভব সে দেখে আর ভাবে, এ লোকটি তো দেখি মহাসুখী। সুতরাং এর মত হওয়া যায়। পরক্ষণেই তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো আরেক ব্যক্তির ওপর। তার ব্যাপারেও একই রকম করে ভাবলো। বরং একে তার কাছে আরো বেশি সুখী মনে হলো।

এভাবে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে দৃষ্টি পড়লো এক জহুরীর উপর। সোনা-রুপা, মণি-মুক্তা ও দামী পাথরের ব্যবসায়ী এ জহুরী। জাঁকজমপূর্ণ দোকান, আলীশান বাড়ি, চারিদিকে চাকর-নওকরের সরব উপস্থিতি– মোটকথা ভোগ-বিলাসের সবই আছে এ জহুরীর কাছে। সুন্দর, সুদর্শন একটি ছেলেও আছে তার। জহুরীর বাহ্যিক অবস্থা দেখে লোকটি ভেবে নিলো যে, বোধ হয় এর চেয়ে সুখী এ পৃথিবীতে নেই। তাই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো, খিযির (আ.)-কে এ জহুরীর কথাই জানাবে এবং এর মতই হওয়ার দুআ করতে বলবে।

খিযির (আ.) কে জানানোর উদ্দেশ্যে সে রওয়ানা হলো। আর তখনি তার মনে হলো, এ জহুরীর বাহ্যিক চাকচিক্য ও সুখ-আনন্দ তো দেখা হলো, কিন্তু ভেতরগত অবস্থা তো জানা হলো না। যদি এমন হয় যে, ভেতরগত অবস্থা আমার চেয়ে খারাপ, তবে এর মত হওয়ার দু'আ করা হলে আমি মহা অশান্তিতে পড়ে যাবো। অতএব জহুরীকে জিজ্ঞেস করা দরকার যে, তার হাল-হকীকত কী?

অবশেষে অনেক ভেবে-চিন্তে সে জহুরীর কাছে গিয়ে বললো, জনাব, মনে হচ্ছে আপনি বেশ সুখী মানুষ। কারণ অঢেল ধন-সম্পদের মালিক আপনি। চাকর-নওকরেরও অভাব নেই। তাই ভাবলাম, আমি আপনার মত হবো। তবে একটু জানতে এসেছি, ভেতরকার কোনো রোগ- শোকে কিংবা দুশ্চিন্তা জাতীয় কিছু আপনার মাঝে আছে কি?

জহুরী তাকে নির্জনে নিয়ে গেলো এবং বললো, ভাই কে সুখী আর কে দুঃখী– বাহ্যিক অবয়ব থেকে তা নির্ণয় করা যায় না। তুমি ভেবেছ আমি খুব সুখী। না, আমি সুখী নই। বরং পর্বতপ্রমাণ দুঃখ, অসহনীয় বেদনা আমার রক্তকণিকায় বহন করে চলেছি। বাস্তবে আমার মত দুঃখী পৃথিবীতে সম্ভবত দ্বিতীয়জন নেই। ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। দুঃখে-ক্ষোভে, বেদনায় আমি ছাই হয়ে যাচ্ছি। এ এমন এক দুঃখ, যা কারো কাছে বলতেও পারি না, সইতেও পারি না। এই যে সুদর্শন ছেলেটি দেখছ, জানো এটা আমার স্ত্রীর সন্তান হলেও আমার সন্তান নয়। আমার স্ত্রী চরিত্রহীনা। তারপর সে চোখের পানি ফেলে নিজ স্ত্রীর চরিত্রহীনতার কারণ ও বিবরণ তুলে ধরলো এবং বললো, ভাই! কাজেই তুমি এ ভুল করো না, আমরা মত হতে চেয়ো না। খিযির (আ.)-কে দিয়ে এ জাতীয় দুআ করালে তুমি দগ্ধ হয়ে যাবে। দুঃখের আগুনে ধীরে ধীরে ছাই হয়ে যাবে।

উক্ত অভিজ্ঞতার পর সুখ-দুআপ্রার্থী লোকটি বুঝতে পারলো যে, আসলে পৃথিবীতে কোনো মানুষই সম্পূর্ণ সুখী নয়। বাহ্যিক সাফল্য, আরাম-আয়েশের নান্দনিক ঝুমঝুম এবং লোভ জাগানিয়া চিত্তবৈভব-প্রকৃত সুখের মাপকাঠি নয়। বরং প্রতিটি সুখের ভেতরেই লুকিয়ে আছে দুঃখ, প্রতিটি আনন্দের ভেতরেই ঘুমিয়ে আছে নিরানন্দ। সুখ আর দুঃখ, আনন্দ আর নিরানন্দ– এরই নাম পৃথিবী।

দ্বিতীয়বার যখন হযরত খিযির (রা.) এর সঙ্গে লোকটির সাক্ষাত হলো, খিযির (আ.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর বান্দা! এবার বলো, তুমি কার মত হতে চাও? সে উত্তর দিলো, দুঃখ-বেদনামুক্ত মানুষের সন্ধান তো পেলাম না। সুতরাং কী বলবো? কার মত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করবো?

খিযির (আ.) বললেন, এটা তো আমি আগেই বলেছি। এ জগতে দুঃখ-দুশ্চিন্তমুক্ত মানুষের সন্ধান তুমি দিতে পারবে না। তবে তোমার জন্য এ দুআ করে দিচ্ছি যে, আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ জীবন দান করুন।

প্রত্যেককে এক ধরনের নেয়ামত দেয়া হয়নি

মানুষ দুঃখ-বেদনাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতে পারে না। দুঃখ-বেদনা আঘাত করবেই। জীবনের কোনো অঙ্গনে, কোনো মুহূর্তে তার নির্মম উপস্থিতি ঘটবেই।

হ্যাঁ, হয়ত এর মাঝে কম-বেশি থাকতে পারে। কারো হয়ত বিপদ-আপদ কম, কারো তার তুলনায় বেশি। কারো এক ধরনের সমস্যা, কারো অন্য ধরনের সমস্যা। কাউকে ধন-সম্পদ দান করা হয় আর কারও কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। কাউকে সুস্থতা দান করা হয়, কিন্তু সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়। আবার কারো পারিবারিক অবস্থা সচ্ছল হলেও সামাজিক অবস্থা খুব বেশি শোচনীয়। মোটকথা, এ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের অবস্থা ও অবস্থান এক নয়। প্রত্যেকেই সুখ-দুঃখে লিপ্ত। এটাই আল্লাহর নিয়ম। কিন্তু যদি মুসিবত হয় প্রথম প্রকারের, তাহলে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব। দ্বিতীয় প্রকারের হলে সেটা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও নেয়ামত।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ওপর মুসিবত কেন আসে?

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন–

اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا صَبَّ عَلَيْهِ الْبَلَاءَ صَبًّا ـ

অর্থাৎ– আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তার ওপর পতিত হয় নানা রকম মুসিবত ও পরীক্ষা।

হাদীসে এসেছে তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ! অমুক তো আপনার নেক বান্দা, আপনার প্রিয় বান্দা, আপনার প্রতি তার হৃদয়ভরা ভালোবাসা রয়েছে। এরপরেও আপনি তার জন্য এত অধিক পরীক্ষা ও দুঃখ-বেদনা পাঠাচ্ছেন কেন? আল্লাহ উত্তর দেন, আমার এ বান্দাকে এভাবেই থাকতে দাও। কারণ, দু'আ-প্রার্থনা, প্রেমঝরা মিনতি, বিমর্ষ হৃদয়ের অনিবার্য আকুতি আমার কাছে ভালো লাগে। খুব ভালো লাগে।

হাদীসটি যদিও সনদের দিক থেকে দুর্বল, কিন্তু এর অনুকূলে আরও হাদীস রয়েছে। যেমন আরেক হাদীসে এসেছে, আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার অমুক বান্দর কাছে যাও, তাকে পরীক্ষার মাঝে ফেলে দাও। কারণ, তার কাকুতি-মিনতি, আহাজারি আমার কাছে খুব ভালো লাগে।

এসব হাদীস থেকেও প্রতীয়মান হলো, পৃথিবীতে বাস করতে হলে দুঃখ-অশান্তির মুখোমুখি হতেই হবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ চান, তার প্রিয় বান্দাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিতে। এই ক্ষণিকের পেরেশানির বিনিময়ে চিরস্থায়ী শান্তি দান করবেন। গুনাহগুলো থেকে পবিত্র করিয়ে নিজের দরবারে পরিশীলিত মানুষ হিসাবে উপস্থিত করবেন।

ধৈর্যশীলদের পুরস্কার

আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহর সবচে প্রিয় বান্দা। তাঁদের চেয়ে প্রিয় মানুষ আল্লাহর কাছে অন্য কেউ নেই। অথচ তাঁদের সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে–

اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ -

পৃথিবীর বুকে সবচে বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হন হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুসসালাম। তারপর যারা যত বেশি তাদের নিকটবর্তী হন, যত বেশি তাদের সঙ্গ রাখেন, তারা তত বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হন।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দেখুন, 'খলিলুল্লাহ'– 'আল্লাহর বন্ধু' উপাধি ছিলো তাঁর। অথচ আগুনে নিক্ষেপণ, প্রিয় সন্তানকে কোরবানীকরণ, প্রিয়জন স্ত্রী-পুত্রকে বিজন প্রান্তরে রেখে আসাসহ অবর্ণনীয় মুসিবত তো তিনিই সয়েছেন। এত মুসিবত তাঁর ওপর কেন দেয়া হলো? কারণ, এগুলোর মাধ্যমেই আল্লাহ তাঁর এই প্রিয় বান্দার মাকাম বুলন্দ করেছেন। এর মাধ্যমেই তিনি তাঁকে 'বন্ধু' বানানোর যোগ্য হিসাবে গড়ে তুলেছেন। এভাবে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরীক্ষা করবেন।

কেয়ামত দিবসে এগুলোর প্রতিদান তিনি দিয়ে দেবেন। সেদিন প্রতিদান ও পুরস্কারের চমক দেখে বান্দা ভুলে যাবে তার দুঃখ-কষ্টের কথা।

অপর হাদীসে এসেছে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন বিশেষ পুরস্কার দিবেন। দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণকারীদের এই পুরস্কার দেবেন। তখন অন্যরা এই পুরস্কার দেখে আফসোস করবে, হায়! যদি দুনিয়াতে আমাদের চামড়া কাঁচি দিয়ে কাটা হতো এবং আমরা ধৈর্যধারণ করতাম। তাহলে আজ আমরাও পুরস্কারের অধিকারী হতাম।

দুঃখ-কষ্টের উৎকৃষ্ট উদাহরণ

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেছেন, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের উদাহরণ এমন, যেন এক ব্যক্তির রোগ হলো। সুস্থতার জন্য ডাক্তার সিদ্ধান্ত নিলেন অপারেশনের। রোগী ভালো করেই জানে এতে কষ্ট হবে, কাটাকাটি হবে। তবুও সে ডাক্তারের নিকট বলল, আমার অপারেশনটা একটু তাড়াতাড়ি করুন। অনেক সময় এই অপারেশনের জন্য রোগী অন্যদের মাধ্যমে সুপারিশও করায়। ডাক্তারকে খুশি করার চেষ্টা করে। মোটা অংকের ফি দেয়। উদ্দেশ্য একটাই, অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা তার জন্য জলদি করা হোক। কেমন যেন নিজের ওপর অস্ত্রোপচারের জন্য সে ডাক্তারকে ফি দেয়। এতসব কেন করে? কারণ, সে ভালো করেই জানে, অপারেশনের এ কষ্ট সাময়িক ও

সাধারণ। কদিন পরেই শুকিয়ে যাবে, সে ভালো হয়ে যাবে। তখন যে স্থায়ী সুস্থতা লাভ হবে, তা এতই মূল্যবান যে তার তুলনায় এ কষ্ট সাময়িক ও তুচ্ছ। আর ডাক্তার সাহেব অপারেশনের সময় যে কাটা-ছেঁড়া করেছেন, দৃশ্যত যদিও মনে হয় তিনি রোগীকে কষ্ট দিয়েছেন, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হলো, রোগীর জন্য অন্তত এ মুহূর্তে ডাক্তারের চেয়ে দরদী ও প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ নন। কারণ, তিনি অপারেশন করেছেন, তার সুস্থতার ব্যবস্থা করেছেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

মনে করুন, আপনার এক প্রিয় বন্ধু, দীর্ঘদিন তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত নেই। তাকে একনজর দেখার জন্য আপনার মনটা আনচান করছে। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন এসে সে উপস্থিত। এসেই সে আপনাকে পেছন দিক থেকে ঝাপটে ধরলো, খুব জোরে চাপ দিলো, এত জোরে চাপ দিতে লাগলো যে, আপনি কোমরে ব্যথা পাচ্ছেন। এবার আপনার বন্ধুটি আপনাকে চমকে দিয়ে বললো, কেমন আছ বন্ধু? আমার এ আচরণের কারণে তুমি মনে কষ্ট নাওনি তো? মনে কষ্ট নিলে আর কোনোদিন এমন করবো না।

যদি আপনি বাস্তবেই তার বন্ধু হন, তাহলে নিশ্চয় বন্ধুটিকে একথাই বলবেন যে, আরে বন্ধু! এ কী বলছো? এতে মনোকষ্টের কী আছে! কতটুকুই বা ব্যথা পেয়েছি? মনটা দীর্ঘদিন থেকে ভালো যাচ্ছে না। শুধু তোমার জন্যই ছটফট করছিলো। এখন তুমি এলে– এ সামান্য কষ্ট তো কিছুই না। হয়ত ভাবাবেগে এ কবিতাটি বলে বসতে পারেন–

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت

سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

'তোমার অস্ত্রাঘাতে পতন হওয়ার সৌভাগ্য যেন কোনো শত্রুর না হয়। তোমার বন্ধুর মস্তক এখনও অক্ষত, সুতরাং তুমি খঞ্জরের পরীক্ষা চালাও।

দুঃখ-মুসিবতের সময় যে ব্যক্তি 'ইন্নালিল্লাহ' পড়ে

কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ـ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَّاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ـ

'আর আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা নেবো, কিছুটা ভয়, কিছুটা ক্ষুধা, মান-ইজ্জতের ক্ষতি ও ফল-ফসল নষ্ট করার মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যধারণকারীদের। যখন তারা বিপদে পড়ে তখন বলে, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন। এরাই তারা, যাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত। এসব লোকই হেদায়াতপ্রাপ্ত। (সূরা বাকারা, ১৫৫-১৫৭)

মোটকথা, এটা আল্লাহর স্বভাব। তিনি বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঝে-মধ্যে দুঃখ-কষ্ট দান করেন।

বন্ধু, এ কষ্ট আমি দান করি

মুফতি শফী (রহ.) এর আবেগঝরা কবিতাটি শুনুন, মাঝে-মাঝে তিনি এটি বলতেন—

ما پروریم دشمن و ما می کشیم دوست

کس را رسد نہ چوں و چرا در قضاء ما

'কখনও আমি দুশমনকে লালন করি, পার্থিব জগতে তাকে উন্নতির রঙিন স্বপ্ন দেখাই, পক্ষান্তরে আমার দোস্তকে দান করি কষ্ট-মুসিবত, তাকে আমি শাসন করি।'

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

ঘটনাটি লিখেছেন হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)। চমৎকার ঘটনা। এক শহরের দুই ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মৃত্যুর দুয়ারে তারা উপনীত। একজন মুসলমান, অপরজন ইহুদী। এ অন্তিম মুহূর্তে ইহুদীর মনে মাছ খাওয়ার সাধ জাগলো। কিন্তু কাছ-কিনারে কোথাও মাছের ব্যবস্থা ছিলো না। অপরদিকে মুসলমান লোকটির অন্তরে সাধ জাগলো যাইতুন তেল খাওয়ার। ইতোমধ্যে আল্লাহ দু'জন ফেরেশতাকে ডাকলেন। একজনকে বললেন, অমুক শহরে একজন ইহুদী মরণ-বিছানায় পড়ে আছে। তার মাছ খাওয়ার ইচ্ছা জেগেছে। তুমি এক কাজ কর, একটি মাছ নিয়ে তার বাড়ির পুকুরে ছেড়ে দিয়ে আস। জীবনের শেষ আশাটি যেন সে পূর্ণ করে নিতে পারে।

দ্বিতীয় ফেরেশতাকে বললেন, অমুক শহরে একজন মুসলমান জীবনের শেষ মুহূর্তে উপনীত। সে যাইতুন তেল খেতে চায়। তার আলমারিতেই যাইতুন তেল আছে। তুমি এক্ষুণি যাও, তেলগুলো নষ্ট করে দাও, যাতে জীবনের শেষ আশাটি তার অপূর্ণ থেকে যায়।

উভয় ফেরেশতা নির্দেশ পালনে বের হয়ে পড়লো। পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাত ঘটলো। একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী কাজে যাচ্ছো? উত্তর দিলো, অমুক শহরের এক ইহুদী মৃত্যুশয্যায় শায়িত, আমি তার বাড়িতে যাচ্ছি, তার বাড়ির পুকুরে একটি মাছ ছাড়বো। কারণ, জীবনের শেষ সময়ে তার মাছ খেতে মন চেয়েছে। এবার বলো, তুমি কোনদিকে যাচ্ছো? উত্তরে দ্বিতীয়জন বললো, আমিও সেদিকেই যাচ্ছি। কারণ, সে শহরেরই এক মুসলমান মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পড়ে আছে। তার যাইতুন তেল খেতে মনে চেয়েছে। আমি তার তেলগুলো নষ্ট করে দিতে যাচ্ছি।

উভয় উভয়ের মিলনের খবর জানতে পেরে দারুণ বিস্মিত হলো। তারা ভাবলো, না জানি এর মধ্যে কোন রহস্য লুকায়িত। কিন্তু নির্দেশ তো আল্লাহর। তাই যে যার কাজে চলে গেলো।

কাজ শেষে তারা উভয়ে আল্লাহর কাছে আরজ করলো, প্রভু হে! আমরা আপনার নির্দেশ পালন করেছি। তবে অন্তরে খটকা লেগে আছে যে, একজন মুসলমান, সে তো আপনার অনুগত। তার কাছে তেলও ছিলো, অথচ আপনি তা নষ্ট করে দিতে বললেন! পক্ষান্তরে একজন ইহুদী, আপনার অবাধ্য সে। মাছ খাওয়ার আশা করেছে। আপনি তার ব্যবস্থা করে দিলেন। ব্যাপারটি আমাদের বুঝে আসছে না।

আল্লাহ উত্তর দিলেন, আমার কাজের মাঝে লুকায়িত রহস্য তোমাদের বুঝে না আসাটা স্বাভাবিক। আসলে কাফের ও মুসলমানের ব্যাপারে আমার কর্মকাণ্ড এক হয় না। কাফেরদের ব্যাপারে আমার বিধান হলো, যেহেতু দুনিয়ার জীবনে তারাও নেক কাজ করে, দান দক্ষিণা করে, মানবতার সেবা করে– এসবই নেক কাজ। এগুলো তো আখেরাতের জীবনে তাদের কোনো কাজে আসে না। তাই দুনিয়াতে এসবের প্রতিদান চুকিয়ে দেই। যেন পরকালের জন্য কোনো প্রতিদান রয়ে না যায়। আর মুসলমানদের বেলায় আমার বিধান হলো, আমি চাই মুসলমানদের গুনাহগুলোর হিসাব-নিকাশ এ দুনিয়াতেই চুকিয়ে দিতে, যেন পরকালীন জীবনে তারা পবিত্র থাকে এবং পবিত্র হয়েই আমার দরবারে উপস্থিত হতে পারে। এ হিসাবে ইহুদীর সব নেক কাজের প্রতিদান আমি দুনিয়াতেই দিয়ে দিয়েছি। শুধু একটিমাত্র প্রতিদান অবশিষ্ট ছিলো, এখন তার মৃত্যু হচ্ছে, আমার নিকট তাকে আসতে হচ্ছে, আর এরই মধ্যে তার মনে জাগলো, সে মাছ খাবে। আমি ব্যবস্থা করে দিলাম। মূলত এর মাধ্যমে তাকে শেষ প্রতিদানটুকুও দিয়ে দিলাম। অপরদিকে অসুস্থ হওয়ার কারণে মুসলমান লোকটির সমূহ গুনাহ মাফ হয়ে গিয়েছিলো। শুধু একটি অবশিষ্ট ছিলো। এখন সে আমার কাছে আসছে। এ অবস্থায় এলে সে গুনাহটিতো তার আমলের

খাতায় থেকে যেতো। তাই যাইতুনের তেল নষ্ট করার মাধ্যমে তাকে একটু কষ্ট দিলাম। প্রকারান্তরে এর মাধ্যমে তার অবশিষ্ট গুনাহটিও মাফ করে দিলাম। তাকে পবিত্র করে দিলাম।

বোঝা গেলো, আল্লাহর হেকমত অফুরন্ত। আমাদের এ ক্ষুদ্র মগজ দিয়ে তাঁর হেকমতগুলো সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা কখনও সম্ভব নয়। তাঁর হেকমত সমস্ত সৃষ্টিজগতে ছড়িয়ে আছে। এ ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে মোটেও সম্ভব নয় সবগুলো বুঝে ফেলা। কেউ জানে না, কখন কোন হেকমতের পাত্র কে হয়।

বাধ্যতামূলক মুজাহাদা

ডা. আব্দুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন, আগেকার যুগের মানুষদের মুজাহাদা বা সাধনা ছিলো অন্যরকম। তারা শায়খের কাছে যেতো, শায়খ তাদেরকে নানারকম সাধনা করাতেন। এসবই ছিলো ইচ্ছাধীন। আর বর্তমানে এত বেশি সাধনা করানো হয় না। তবে আল্লাহ এ যুগের মানুষদেরকেও বঞ্চিত করেন নি। মানুষ ইচ্ছাপূর্বক মুজাহাদা এখন করে না ঠিক, বাধ্যতামূলক মুজাহাদা অবশ্যই করে। নিরুপায় হয়ে সেই সাধনায় তাদের লিপ্ত হতে হয়। আল্লাহ দুঃখ দেন, কষ্ট দেন, দুশ্চিন্তা দেন– কেউই এ থেকে নিরাপদ নয়। আর এটাই বাধ্যতামূলক সাধনা। এর দ্বারাও মর্যাদা বাড়ে। বরং ক্ষেত্রবিশেষে এটা ইচ্ছাধীন সাধনার চেয়েও দ্রুত ফলদায়ক হয়।

সাহাবায়ে কেরামের জীবনেও ইচ্ছাধীন সাধনা খুব একটা ছিলো না। যেমন সাধ্য থাকা সত্ত্বেও অনাহারে কাটানো, ইচ্ছাকৃতভাবে নিঃস্ব থাকা ইত্যাদি তাদের জীবনে অহরহ ছিলো না। হ্যাঁ, তাদের জীবনে বাধ্যতামূলক সাধনা ছিলো অনেক অ-নে-ক বেশি। কালিমা পড়ার অপরাধে তাঁদেরকে তপ্ত মরুভূমিতে শুইয়ে রাখা হতো, বুকের ওপর বিশাল পাথর চাপিয়ে দেয়া হতো। এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুগত হওয়ার দায়ে তারা বহু অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছিলেন। এ সবই ছিলো বাধ্যতামূলক মুজাহাদা। বাধ্য হয়েই তাঁরা এসব সাধনা করেছেন। এর ফলে তাঁদের মর্যাদা কতটুকু বেড়েছে, একজন অ-সাহাবী তা ভাবতেও পারে না।

এজন্যই বলা হয়েছে, বাধ্যতামূলক সাধনার মাধ্যমে দ্রুত পরিশীলিত হওয়া যায়। মূলত এসব মুসিবতও আল্লাহর রহমতের জন্য ওসীলা।

দুঃখ-কষ্টের তৃতীয় দৃষ্টান্ত

একটি শিশু। তাকে গোসল করাতে গেলে তার হাত-পা ধুয়ে দিতে গেলে সে ভয়ে কাতর হয়ে পড়ে। এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করে। কারণ, এতে সে

কষ্ট পায়। কিন্তু মমতাময়ী মা তাকে ধরে আনে, জোরপূর্বক তাকে গোসল করায়, শরীর থেকে ময়লা উঠিয়ে দেয়। এ সময় শিশুটি কত কাঁদে, মা তবুও তাকে ছাড়ে না। শিশুটি হয়ত তখন ভাবে, মা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, আমার উপর যুলুম করছে। অথচ আসলে কি তা? শিশুটি এখন না বুঝলেও একদিন তো মায়ের এসব স্নেহের কথা বুঝবে। তখন মায়ের মমতাগুলো তাকে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলবে।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত

অথবা একটি শিশু, বাবা-মা তাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে। মা প্রতিদিন ভোরে তাকে স্কুলে পাঠায়। সে যেতে চায় না, কান্নাকাটি করে, চেঁচামেচি করে। তবুও জোর করে হলেও মা তাকে স্কুলে দিয়ে আসে। স্কুলে যাওয়াটা এ শিশুটির কাছে কতই না কষ্টের মনে হয় এবং এজন্য মাকে কতই না পাষাণী মনে হয়। কিন্তু আসলেই কি তা? এই শিশুটিই একদিন যখন বড় হবে, তখন প্রকৃত মততা তার বুঝে আসবে। সেদিনকার শিশুটি তখন বড় হয়ে শিক্ষিতদের কাতারে নিজেকে দেখবে, তখন মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মাথাটা নুয়ে আসবে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা দুঃখ-কষ্ট, বেদনা-পেরেশানিও ঠিক অনুরূপ। এসবই মূলত আল্লাহর রহমতের প্রতীক। এগুলোর মাধ্যমে তিনি নিজ মমতার প্রকাশ ঘটান। তবে শর্ত হলো, এসব করুণ সময়ে আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকতে হবে সুগভীর। এগুলোকে তাঁর রহমত মনে করতে হবে।

হযরত আইয়ুব (আ.) এর মুসিবত

হযরত আইয়ুব (আ.) আল্লাহর একজন বিশিষ্ট নবী ছিলেন। তিনি কত কষ্ট করেছেন। কত কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। কল্পনা করলেও গা শিউরে ওঠে। এই করুণ মুহূর্তেও শয়তান থেমে থাকেনি। সে আইয়ুব (আ.) কে আরো কষ্ট দিতে তৎপর হয়ে ওঠে। তাই সে আইয়ুব (আ.) এর কাছে এসে বলল, আপনার আল্লাহ আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট। আপনি গুনাহ করেছেন, তাই তিনি আপনার ওপর এত বড় মুসিবত দিয়েছেন। এটা আপনার ওপর তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি– আযাব।

শয়তান শুধু এতটুকুতে ক্ষান্ত হয়নি বরং তার নিজের বক্তব্যের পক্ষে দলিল পেশ করারও চেষ্টা করে। আইয়ুব (আ.) এর সঙ্গে সে রীতিমতো বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়। বাইবেলের সহীফায়ে আইয়ুবে এ সম্পর্কে কিছুটা সবিস্তারে আলোকপাত করা হয়েছে। আইয়ুব (আ.) শয়তানকে উত্তর দিয়েছিলেন, তোমার কথা সম্পূর্ণ

মিথ্যা। এটা আমার ওপর আমার প্রভুর আযাব নয় বরং এতো আমার প্রতি তাঁর রহমতের বহিঃপ্রকাশ। সুস্থতার জন্য আমি অবশ্যই আমার প্রভুর কাছে দু'আ করি, মিনতি জানাই, আমার দুর্বলতা প্রকাশ করি। কিন্তু এ অভিযোগ করি না যে, তিনি কেন আমাকে এ রোগ দিলেন? আলহামদুলিল্লাহ! প্রতিটি মুহূর্তে আমি আমার প্রভুকে স্মরণ করি এবং এই বলে প্রার্থনা করি–

رَبِّ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ۔

'হে প্রভু! আমি কষ্টে ভুগেছি, আর আপনি আরহামুর রাহিমীন। আপনার দয়া অপরিসীম। অতএব, আমার কষ্ট দূর করে দিন।'

শোনো শয়তান! এই যে রোগের কারণে আমি যে আমার প্রভুকে প্রতিটি মুহূর্তে স্মরণ করি, তিনি যে আমাকে এ তাওফীকটুকু দিয়েছেন, এটাই তো এ কথার প্রমাণ যে, এ কষ্ট-মুসিবত আমার জন্য আযাব নয় বরং তাঁর পক্ষ থেকে রহমত। এটা তো তাঁরই দয়া, তাঁরই মহব্বত। এসব কথাই সহীফায়েত আইয়ুবীতে রয়েছে।

দুঃখ-কষ্ট রহমত হওয়ার নিদর্শন

হযরত আইয়ুব (আ.) স্পষ্টভাবে আলামত বলে দিয়েছেন যে, কোন ধরনের মুসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব এবং কোন ধরনের মুসিবত আল্লাহর রহমত। যে মুসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব হয়, সেই মুসিবতের নিদর্শন হলো, এ ধরনের মুসিবতের সময় মানুষ আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে, তাকদীরের ব্যাপারে আপত্তি তোলে, সর্বোপরি আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশী হয় না।

পক্ষান্তরে যে মুসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত হয়, তার আলামত হলো, এ ধরনের মুসিবতে পতিত ব্যক্তি, আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে না, তাকদীরের ব্যাপারে আপত্তি তোলে না বরং আল্লাহর দরবারে দু'আ করে, মিনতি করে বলে যে, হে আল্লাহ! আমি কমজোর, দুর্বল। এ মুসিবত কেটে ওঠার যোগ্যতা আমার নেই। আপনি দয়াবান, আমার ওপর রহম করুন। এ কষ্ট-বেদনার কঠিন পরীক্ষা থেকে আমাকে উদ্ধার করুন।

দুআ কবুল হওয়ার আলামত

অবশ্য এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, অনেক সময় দেখা যায়, মুসিবতের সময় আল্লাহর দরবারে দুআ করা হয়, মিনতি করা হয়, মুসিবত দূর করার জন্য তার কাছে অনুনয়-বিনয় করা হয়, তারপরেও দেখা যায়, মুসিবত দূর হচ্ছে না, দুআ কবুল হচ্ছে না, এর কারণ কী?

এর জবাব হলো, আল্লাহর দরাবরে দুআ করতে পারা, কাকুতি-মিনতি করার তাওফীক হওয়া– এটাই একথার প্রমাণ যে, দুআ কবুল হয়ে গেছে। অন্যথায় দুআ করারই তাওফীক হতো না। এমতাবস্থায় কষ্ট-মুসিবতের জন্য পাবে আলাদা পুরস্কার এবং দুআ করার জন্যও পাবে ভিন্ন পুরস্কার। আর এভাবে মুসিবত হচ্ছে মর্যাদাপ্রাপ্তির সিঁড়ি। মাওলানা রুমী (রহ.) এর ভাষায়–

گفت آں اللہ، تو لبیک ماست

"যখন তুমি আমাকে 'আল্লাহ' বলে ডাক দেবে, তখন তোমার 'আল্লাহ' বলাটাই আমার পক্ষ থেকে সাড়া দেয়া।'

অর্থাৎ– তোমার আল্লাহ বলতে পারা একথার প্রমাণ যে, তোমার ডাকে আমি সাড়া দিয়েছি এবং তোমার দুআ কবুল করে নিয়েছি। কাজেই দুআ করার তাওফীক হওয়াই আল্লাহর পক্ষ থেকে দুআ কবুল করার আলামত। এরপর তিনিই ভালো জানেন, কখন তোমার কষ্ট দূর করেন এবং কখন দূর করলে তোমার জন্য প্রকৃতপক্ষেই কল্যাণ হবে। মানুষ বেশি তাড়াহুড়োপ্রিয়। তাই নগদ দাবি করে। কিন্তু আল্লাহ তো প্রকৃতপক্ষেই কল্যাণকামী। তাই সময়মত মুসিবত থেকে উতরে দেন। কাজেই কখনও আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে না, বরং এভাবে দুআ করবে যে, হে আল্লাহ! আমি কমজোর, দুর্বল। এ মুসিবত আমার জন্য কষ্টকর হচ্ছে। আপনি দয়া করে এ দুর্বল বান্দাকে উদ্ধার করুন।

হাজী ইমদাদুল্লাহ (রহ.)-এর একটি ঘটনা

দুঃখ-বেদনা কাম্য নয় যে, এটি পাওয়ার জন্য দুআ করে চলবে, হে আল্লাহ! আমাকে মুসিবত দান করুন। বরং মুসিবতের সময় সবর করতে হয়। এটি সবরের বিষয়। সবর করার অর্থ হলো, মুসিবতের সময় আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.)ও মুসিবতে পড়েছেন এবং এ থেকে পরিত্রাণের জন্য দুআ করেছেন। তিনি মুসিবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। এক দুআয় তিনি বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমি কঠিক রোগ থেকে, পীড়াদায়ক ব্যাধি থেকে আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করছি।' কিন্তু তিনি মুসিবতে পড়ে গেলে সেটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত হিসাবেই মেনে নিয়েছেন।

হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) তাঁর মাওয়ায়েজে একটি ঘটনা লিখেছেন যে, একবার হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ (রহ.) এ বিষয়ে বয়ান করছিলেন। তিনি বলছিলেন, সবধরনের মুসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও পুরস্কার। তবে শর্ত হলো, বান্দাকে এর মূল্যায়ন করতে হবে। তাকে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হতে হবে।

ইতোমধ্যে এক লোক এলো, যে কুষ্ঠরোগী ছিলো। রোগের কারণে তার সর্বাঙ্গ সাদা সাদা হয়ে গিয়েছিলো। সে হাজী সাহেবের কাছে আবেদন জানালো, হযরত! আমার জন্য দুআ করুন, আল্লাহ যেন আমার কষ্টটা দূর করে দেন।

উপস্থিত লোকেরা ভাবনায় পড়ে গেলো। কারণ, হাজী সাহেব তো এইমাত্র বয়ানে বলেছেন যে, সব ধরনের রোগ-শোক আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও পুরস্কার। তাহলে এখন কি তিনি আল্লাহর রহমতকে তাড়িয়ে দেয়ার দুআ করে বলবেন যে, হে আল্লাহ! লোকটি থেকে আপনার রহমত দূর করে দিন!!

হযরত হাজী সাহেব (রহ.) দুআর জন্য হাত উঠালেন। বললেন, হে আল্লাহ! আপনার এই বান্দা কঠিন রোগে কষ্ট পাচ্ছে, যদিও এটাও আপনার পক্ষ থেকে রহমত ও পুরস্কার, কিন্তু আমরা তো দুর্বল, কমজোর, তাই এটা বরদাশত করার যোগ্যতা আমাদের নেই। কাজেই আপনি মুসিবত নামক এ নেয়ামতকে সুস্থতা নামক নেয়ামতে পরিণত করুন। আপনি তার অসুস্থতাকে সুস্থতা দ্বারা পরিবর্তন করে দিন।

একেই বলে দ্বীনের গভীরতা অনুধাবন করা। এই গভীরতা অর্জিত হয় বুযর্গদের সংসর্গেরই ফলে।

হাদীসের সার বক্তব্য

আলোচ্য হাদীসের সারকথা এই যে, আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং বলেন, এ বান্দার কান্নাকাটি, আহাজরি ও কাকুতি-মিনতি আমার কাছে দারুণ ভালো লাগে। তাই তাকে কষ্ট দিই, যেন সে আমার কাছে কাকুতি-মিনতি করে। এর ফলে আমি তার মর্যাদা সমুন্নত করি। তাকে মর্যাদার শীর্ষে পৌছিয়ে দেই।

আল্লাহ আমাদেরকে রোগ- শোক থেকে মুক্ত রাখুন। বিপদের মুহূর্তে ধৈর্যধারণ করার তাওফীক দান করুন। তাঁরই কাছে ফিরে যাওয়ার তাওফীক দান করুন। সর্বাবস্থায় তাঁরই কাছে নির্ভরতা খুঁজে পাওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

দুঃখ-কষ্টের সময় নিজের অপারগতা প্রকাশ করা

কোনো কোনো বুযুর্গ সম্পর্কে কথিত আছে যে, তারা রোগ-শোকের সময় 'আহ-উহ' করতেন, মনোবেদনা প্রকাশ করতেন। বাহ্যত মনে হতে পারে, এটা তো নাশোকরি বরং আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগের নামান্তর। অথচ দুঃখ-মুসিবতের সময় নাশোকরি করা জায়িয নেই। এর জবাবও উক্ত হাদীসে

পাওয়া যায়। যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা, তারা নাশোকরীবশত কিংবা আল্লাহর ওপর অভিযোগ উত্থাপনের লক্ষ্যে মুসিবতের সময় 'আহ্-উহ করেন না। বরং তাঁরা বলতে চান, আমাদেরকে মুসিবত তো এজন্যই দেয়া হয়েছে যে, যেন আমরা আল্লাহর সামনে কাকুতি-মিনতি করি, নিজের অপারগতা ও দুর্বলতার কথা তাঁর কাছে পেশ করি। কাজেই এ ক্ষেত্রে নিজের বীরত্ব প্রকাশ করা ঠিক নয়।

এক বুযুর্গের ঘটনা

ঘটনাটি আমি আব্বাজান মুফতি শফী (রহ.) এর কাছে শুনেছি। একবার এক বুযুর্গ কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। আরেক বুযুর্গ তাঁকে দেখতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, অসুস্থ বুযুর্গ 'আলহামদুলিল্লাহ'র যিকির জপছেন। আগন্তুক বুযুর্গ এ অবস্থা দেখে বললেন, আপনার আমলটিতো বেশ প্রশংসাযোগ্য। কারণ, এ অবস্থায় আপনি আল্লাহর শোকর আদায় করছেন। তবে কথা হলো, এ অবস্থায় একটু উহ-আহও করুন। অন্যথায় আপনার রোগ তো ভালো হবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা আপনাকে রোগটি দান করেছেন, যেন তাঁর দরবারে আহাজারি করেন। গোলামির দাবীও এটাই। গোলাম আল্লাহর সামনে নিজের বাহাদুরি দেখাবে না, বরং নিজের অক্ষমতার কথা বলবে।

বড় ভাই মরহুম যকী কাইফী এ বিষয়ে চমৎকার একটি কবিতা বলেছেন-

اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں ✿ توڑنا ہے حسن کا پندار کیا

আল্লাহ যখন কাউকে কষ্ট-মুসিবত দান করেন, তখন একেবারে মুখ বুজে পড়ে থাকা এবং একটু আহাজারি, সামান্য কাকুতি-মিনতি প্রকাশ না করা মোটেও শোভন লক্ষণ নয়। এর দ্বারা কী তুমি তার সামনে বাহাদুরি দেখাতে চাচ্ছো? আল্লাহ মাফ করুন। এমনটি মোটেও ভালো লক্ষণ নয়।

একটি উপদেশমূলক ঘটনা

হযরত থানবী (রহ.) এক বুযুর্গের ঘটনা লিখেছেন। ওই বুযুর্গের থেকে মুখ ফসকে একবার বের হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি আল্লাহকে বলছেন-

لَيْسَ لِيْ فِيْ سِوَاكَ حَظٌّ

فَكَيْفَ مَا شِئْتَ فَاخْتَبِرْنِيْ

"হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া অন্য কিছুতে মজা পাই না। আপনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আমাকে পরীক্ষা করে দেখুন।'

আল্লাহ মাফ করুন। কেমন যেন তিনি আল্লাহকে পরীক্ষার দাওয়াত দিয়েছিলেন। এর ফলে তার পেশাব বন্ধ হয়ে গেলো। মূত্রথলি পূর্ণ হয়ে গেছে, তবুও পেশাব হচ্ছে না। বেশ কয়েকদিন এভাবেই কেটে গেলো। পেশাবের তীব্র চাপে বুযুর্গ অস্থির হয়ে পড়লেন। অবশেষে নিজের ভুলটাও ধরতে পেরেছিলেন। বুযুর্গের কাছে কচি-কাচারা সকালে পড়তে আসতো। ব্যথার তীব্রতায় তিনি কোমলমতি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলতেন– اُدْعُوْ لِعَمِّكُمُ الْكَذَّابُ 'তোমার মিথ্যাবাদী চাচার জন্য দুআ কর। আল্লাহ যেন এ রোগ থেকে আমাকে মুক্তি দান করেন।

এ ঘটনা থেকে বোঝা গেলো, আল্লাহর সামনে বীরত্ব চলে না। কাজেই বীরত্ব নয় বরং নিজের দুর্বলতাটা তাঁর সামনে প্রকাশ কর।

মুসিবতের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কর্মকৌশল

মুসিবতের সময় যেমনিভাবে অভিযোগ তোলা নিষেধ, তেমনিভাবে বাহাদুরি দেখানোও নিষেধ। উভয়ের মাঝামাঝি পন্থা হলো মধ্যপন্থা। তাই গ্রহণ করতে হবে মধ্যপন্থা। রাসূলুল্লাহ (সা.)ও এ মধ্যপন্থাই গ্রহণ করতেন। আয়শা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় ভুগছিলেন, তখন তিনি তাঁর পবিত্র হাত বারবার পানিতে ভেজাতেন এবং নিজের পবিত্র চেহারা মুছতেন। কষ্টের তীব্রতায় তিনি কাতরাচ্ছেন। এই করুণ অবস্থা দেখে ফাতেমা (রা.) বলতেন–

وَاكَرْبَ اَبَاهُ -

'আব্বাজানের কতই না কষ্ট হচ্ছে!

আর রাসূল (সা.)ও তখন উত্তর দিয়েছিলেন–

لَاكَرْبَ اَبِيْكَ بَعْدَالْيَوْمِ -

আজকের দিনের পর তোমার পিতার আর কষ্ট হবে না।

দেখুন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন, কিন্তু অভিযোগ তুলেননি, বরং পরবর্তী জীবনের শান্তির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এটাই হলো সঠিক পদ্ধতি এবং নবীজি (সা.) এর তরিকা। তাই এ পদ্ধতিই সুন্নত পদ্ধতি।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রিয়পুত্র ইবরাহীম (রা.)-এর মৃত্যুতেও তিনি শোক প্রকাশ করে বলেছিলেন–

اَنَابِفَرَاقِكَ يَااِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ -

'হে ইবরাহীম! তোমার বিয়োগ-বেদনায় আমি ক্লিষ্ট, ভারাক্রান্ত।'

নবীজি (সা.) এর কন্যা যয়নব (রা.)। তার বাচ্চা নবীজী (সা.) এর কোলে শায়িত, প্রাণ চলে যাচ্ছে। নাতির এ বিরহ-বেদনায় তাঁর অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। একেই বলে আবদিয়াত তথা বন্দেগি-প্রকাশ। সে সময়ে তিনি বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! আপনার ফয়সালাই চূড়ান্ত ও সঠিক। তবে আপনি এ কষ্টটা আমাকে দিচ্ছেন তো এ জন্য যে, যেন আপনার সামনে অশ্রু ফেলে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করি। তাই আমি কাঁদছি, আপনারই কাছে মিনতি করছি।'

মূলত এটাই সুন্নাত তরিকা। অভিযোগ নয়, বাহাদুরিও নয়। বরং আল্লাহর কাছে দুআ করবে, ফরিয়াদ করে বলবে যে, হে আল্লাহ! আমাকে বিপদমুক্ত রাখুন। আপতিত মুসিবত থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

আলোচ্য হাদীসের সারকথাও এটাই। 'আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের সমঝ দান করুন। দ্বীনের ওপর চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُدَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

হালাল উপার্জন ধরে রাখো

"দুনিয়ার সব মানুষ দিনে কাজ করে, রাতে ঘুমায়। মানুষেরা কি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স করে এ কর্ম-বন্টন ঠিক করে নিয়েছিলো যে, তারা দিনে কাজ করবে আর রাতে ঘুমোবে? বলা বাহুল্য, এ ধরনের কনফারেন্স মানুষের এ দুনিয়াতে কখনও হয়নি; বরং এ দুই শিফটের দুই কাজ আল্লাহই মানুষের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে জীবিকা উপার্জনের বিষয়টিও বন্টন করেছেন আল্লাহ নিজেই। তাই একেকজন একেকভাবে জীবিকা উপার্জন করে।"

হালাল উপার্জন ধরে রাখো

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًاكَثِيْرًا - اَمَّابَعْدُ!

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رُزِقَ فِىْ شَيْءٍ فَلْيَلْزِمْهُ - مَنْ جُعِلَتْ مَعِيْشُهٗ فِىْ شَيْءٍ فَلَايَنْتَقِلُ عَنْهُ حَتّٰى يَتَغَيَّرَ عَلَيْهِ -

(كنزالعمال - حديث نمبر - ٩٢٨٦, اتحاف السا دة المتقين)

হামদ ও সালাতের পর!

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যার যে কাজে জীবিকার ব্যবস্থা হয়, সে কাজে তার লেগে থাকা উচিত। নিজের খেয়াল-খুশিমতে অকারণে তা ছেড়ে দিবে না। উপার্জনের পেশা আল্লাহর পক্ষ থেকে যার জন্য যেটা হয়েছে, তার উচিত সেটা ধরে রাখা। অন্য পেশা খোঁজ করা তার জন্য উচিত নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তা নিজে নিজে পরিবর্তন হয় বা এমনিতেই প্রতিকুলতা দেখা দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত পেশা পরিবর্তন করা উচিত নয়।

জীবিকা নির্বাহের পথ

আল্লাহ যাকে জীবিকার একটি মাধ্যম দান করেছেন, যার উসিলায় সে রিযিক পাচ্ছে, বিনা কারণে তা ছেড়ে দিবে না, বরং লেগে থাকবে। কেননা, রিযিকের পথ খুলে দেয়া আল্লাহরই অনুগ্রহ। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে এ কাজে লাগানো হয়েছে এবং কাজটিকে রিযিক-সংশ্লিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এমনিতে তো জীবিকা নির্বাহের পথ ও পদ্ধতি কেবল একটি নয়। কিন্তু নির্দিষ্ট

একটি পথকে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম বলে মনে করতে হবে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। সুতরাং অকারণে এ পথ থেকে সরে যাওয়া উচিত হবেনা।

জীবিকা-ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্প্রদত্ত

দেখুন, আল্লাহ তাআলা জীবিকা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর পদ্ধতি দান করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা বুঝে উঠতে পারে না। এ মর্মে কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন-

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا-

'আমি তাদের মাঝে জীবিকা বণ্টন করেছি পার্থিব জীবনে।' (সূরা যুখরুফ ৩২)

প্রতীয়মান হলো, জীবিকা বন্টনের ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। তা এভাবে যে, একজন মানুষ তার 'প্রয়োজন' অনুভব করে আর অপরজনের মনে সে প্রয়োজন পূরণের চিন্তা চলে আসে। মানুষের 'প্রয়োজন' অনেক। চাহিদাও অসংখ্য। কারো প্রয়োজন রুটির, কারো প্রয়োজন কাপড়ের, কারো বাড়ি প্রয়োজন, কারো ফার্নিচারের চাহিদা, কারো পাত্রের চাহিদা- মোটকথা মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা অসংখ্য।

প্রশ্ন হলো, এতসব প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের জন্য মানুষেরা কী কখনও কোনো কনফারেন্স করে বণ্টন করে নিয়েছে যে, কত মানুষ কোন্ প্রয়োজন পূরণের পেছনে সময় লাগাবে? কত মানুষ কাপড় তৈরি করবে, কত মানুষ পাত্র বানাবে, কত মানুষ কৃষি ইত্যাদি কাজে থাকবে। এরূপ কোনো বণ্টন মানুষ কী কখনও করে নিয়েছে? যদি পৃথিবীর সকল মানুষ একত্র হয়ে নিজেদের 'প্রয়োজন' ও 'চাহিদাগুলো' একত্র করতে চাইত, আর কতজন মানুষ কোন্ প্রয়োজন পূরণে কোন কাজে থাকবে- তা বণ্টন করে নেয়ার চেষ্টা করতো, তবে সেটা কখনই সম্ভব হতো না। এ ব্যবস্থাপনা তো আল্লাহই করেছেন যে, তিনি প্রতিটি মানুষের অন্তরে ভিন্ন ভিন্ন 'প্রয়োজন' ও 'চাহিদা' পূরণের চেষ্টা চালানোর বিষয়টি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এ জন্যই কেউ বা চিন্তা করে দোকান করার, কেউবা চিন্তা করে কৃষি কাজ করার আর কেউ বা চিন্তা করে অন্য কাজ করার। ফলে আপনার যখন কোনো জিনিসের প্রয়োজন হয়, তখন বাজারে গেলেই সেই জিনিসটা পেয়ে যান। এই যে এই সুন্দর ব্যবস্থাপনা- এটাতো আল্লাহই করেছেন।

জীবিকা বণ্টনের একটি বিরল ঘটনা

আমার বড় ভই যাকী কাইফী। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। আমীন। হযরত থানবী (রহ.) এর সোহবতপ্রাপ্ত ছিলেন। একদিন তিনি নিজের কথা বলতে

গিয়ে বললেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে মাঝে মাঝে আল্লাহ এমন বিস্ময়কর দৃশ্য দেখান যে, তাঁর রুবুবিয়্যাত ও রাযাকিয়্যাতের সামনে তখন বান্দার মাথাটা সেজদাবনত হয়ে আসে। আমার একটি লাইব্রেরী ছিলো লাহোরে। ইদারায়ে ইসলামিয়াই নামের সেই লাইব্রেরীটিতে আমি বসতাম। একদিন সকালে উঠে যখন লাইব্রেরীর দিকে যেতে চাইলাম, লক্ষ্য করলাম, অঝোরধারায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ভাবলাম, এ প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে মানুষজন কি আর দোকান-পাটে আসবে? এলেও কিতাব কেনার জন্য আর কে-ই বা আসবে? কিতাব তো চাল-আটা নয় যে, এর জন্য বৃষ্টি উপেক্ষা করেও মানুষ আসবে! তাই আজ আর দোকানে যাবো না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবলাম, এটা আমার জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম, আল্লাহ তাআলা এর উসিলাতেই আমার ও পরিবারের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করেন। সুতরাং আমার কাজ হলো, গ্রাহক আসুক বা না আসুক– দোকান খুলে বসা।

যাক, অবশেষে আমি ছাতা হাতে নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। দোকান খুললাম, বসে বসে কুরআন তেলাওয়াত করতে লাগলাম। একটু পরে দেখলাম, অবাক কাণ্ড! এক ব্যক্তি ছাতা মাথায় দিয়ে আমার দোকানে এল কিতাব কেনার জন্য। সে এমন এমন কিতাব কিনলো, সাধারণত যেগুলো বেচাকেনা হয় না। অন্যান্য দিন যত টাকা বিক্রি করতাম, আজকের এই একজন গ্রাহকই তত টাকার কিতাব কিনে নিলো। চিন্তা করলাম, হে আল্লাহ! এটা আপনারই কাজ। সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা আপনার হেকমত যদিও বুঝে উঠতে পারি না। এই প্রবল ঝড়ের ভেতরেও আপনি আপনার এ বান্দার কিতাবের প্রয়োজন পূরণ করলেন, আর আমার টাকার প্রয়োজন পূরণ করলেন!

স্বভাবজাত সিস্টেম : মানুষ রাতে ঘুমায় আর দিনে কাজ করে

আব্বাজান মুফতি শফী (রহ.) বলতেন, একটু ভেবে দেখো, দুনিয়ার সকল মানুষ রাতের বেলায় ঘুমায় আর দিনের বেলায় কাজ করে। মানুষ কি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স করে এ কর্ম-বন্টন ঠিক করে নিয়েছিলো যে, তারা রাতে ঘুমাবে আর দিনে কাজ করবে? মানুষ এ ধরনের কনফারেন্স তো কখনও করেনি; বরং আল্লাহ তাআলাই মানুষের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন, রাতের বেলায় ঘুমাও এবং দিনের বেলায় কাজ কর। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔

'আমি রাতকে করেছি আবরণ আর দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়।'

মানুষ দিনে ঘুমাবে না রাতে ঘুমাবে এ স্বাধীনতা যদি তাদেরকে দেয়া হতো, তাহলে কেউ রাতে ঘুমানোর কামনা করতো, আর কেউ কামনা করতো দিনে ঘুমানোর। অবশেষে একদল যখন ঘুমাতো, অপরদল তখন কাজ করতো। যার ফলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতো, কাজেরও ক্ষতি হতো। এভাবে গোটা দুনিয়ায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিতো। তাই মহান আল্লাহ রাতে ঘুমানোর এবং দিনে কাজে যাওয়ার বিষয়টি মানুষের অন্তরে স্বভাবজাতভাবে দিয়ে দিয়েছেন।

রিযিকের দরজা বন্ধ করো না

ঠিক অনুরূপভাবে জীবিকা উপার্জনের বিষয়টিও বন্টন করেছেন আল্লাহ নিজেই। তিনি একেকজনের অন্তরে একেক ধরনের কাজ করার ইচ্ছা ঢেলে দিয়েছেন। তাই একদল এক কাজ করে। কৃষকরা কৃষি কাজ করে। চাকুরিজীবীরা চাকুরি করে। কারিগররা কারিগরি করে। একজন এক কাজ দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহ করে। সুতরাং যে কাজে তুমি লেগে আছ, যদি তা হালাল হয়, তাহলে সে কাজেই লেগে থাক। এ হালাল উপায়টি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো উপায় খোঁজার পেছনে পড়ো না। আল্লাহ হয়ত এর মাঝেই তোমার জন্য কল্যাণ ও সফলতা রেখেছেন। তবে হ্যাঁ, কাজটি নিজে নিজে চলে গেলে বা প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখা দিলে বা শত চেষ্টা সত্ত্বেও এর মাধ্যমে উন্নতি করতে না পারলে, তখন অন্য কাজ খুঁজতে পার। কারণ, তখন এটা তুমি নিজে ছাড়লে না, বরং ভিন্ন হেকমতে এবং অন্য কারণে তোমাকে ছাড়তে হয়েছে।

এটা আল্লাহর দান

এ প্রসঙ্গে ডা. আব্দুল হাই (রহ.) একটি চমৎকার কবিতা পড়তেন–

چیز یکہ بے طلب رسد آں دادۂ خدا است

او را تو رد مکن کہ فرستادۂ خدا است

অর্থাৎ– যখন চাওয়া ছাড়াই কোনো জিনিস পেয়ে যাবে, তখন এটিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করবে এবং এটিকে ফিরিয়ে দেয়ার ফিকির করো না। কেননা, এটা আল্লাহ পাঠিয়েছেন।

মোটকথা, প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত বা স্বতস্ফূর্ত পরিবর্তন চলে আসার আগ পর্যন্ত জীবিকা নির্বাহের যে হালাল পদ্ধতি অবলম্বন করে রয়েছ, তা নিজ থেকে ছেড়ে দিও না বরং তা ধরে রাখ।

প্রতিটি বিষয় আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার সঙ্গে যেসব আচরণ করা হয়– সুফীগণ সবগুলো এর উপর কিয়াস করেছেন।'

অর্থাৎ– এ হাদীসে যা বলা হয়েছে, তা যদিও রিযিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু সুফীগণ এ হাদীস থেকে এ মাসআলাও বের করেন যে, আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দার জন্য যা স্থির করে রেখেছেন, যেমন ইলমের ব্যাপারে, মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে অথবা অন্য কোনো ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যে বান্দার জন্য যা স্থির করে রেখেছেন, তা যেন সে নিজ থেকে পরিবর্তনের চেষ্টা না করে; বরং তার উপরই যেন কায়েম থাকে।'

হযরত উসমান (রা.) খেলাফত ছাড়লেন না কেন?

হযরত উসমান (রা.) এর শাহাদাতের ঘটনাটি সর্বজন প্রসিদ্ধ। তাঁর খেলাফতের শেষের দিকে একটা ঝড় তোলপাড় করে উঠেছিলো। এর কারণ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে একটি জামা পরাবেন। তুমি নিজের ইচ্ছামতে সেটি খুলে ফেলো না। সুতরাং আল্লাহ তাআলা খেলাফতের যে জামাটি আমাকে পরিয়েছেন, তা নিজ ইচ্ছামতে আমি খুলে ফেলবো না। এ কারণেই তিনি খেলাফতের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াননি এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধেও অস্ত্র উত্তোলন করেননি। অথচ তিনি তখন ক্ষমতায় ছিলেন। সৈন্য-সামন্তের অভাব তাঁর ছিলো না। ইচ্ছা করলে তিনি বিদ্রোহীদেরকে পিষে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তিনি বলেন, যেহেতু এসব বিদ্রোহী মুসলমান আর আমি চাই না, মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রথম তরবারি উত্তোলনকারী আমি হই। এইজন্যই তিনি ঘরের ভেতর বন্দি হয়ে বসে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন, তবুও খেলাফত ছাড়েননি। এর দিকে ইঙ্গিত করেই হযরত থানবী (রহ.) বলেছেন, যদি তোমার উপর কোনো দায়িত্ব এসে পড়ে, তবে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করে তা মজবুতভাবে গ্রহণ কর। নিজ থেকে তা ছেড়ে দিও না।

মানবতার সেবা : আল্লাহপ্রদত্ত পদ

অনুরূপভাবে দ্বীনের খেদমতের কোনো রাস্তা যদি চাওয়া ছাড়াই তুমি পেয়ে যাও, তবে বিনা কারণে তা উপেক্ষা করো না। কেননা, তাতেই নূর ও বরকত নিহিত। সুফীগণের ব্যাপারটাও ঠিক অনুরূপ। আল্লাহ তাআলা তাদের সঙ্গে যেমন আচরণ করেন, তা আল্লাহরই দান। আল্লাহ তাআলা কারও সঙ্গে বিশেষ

আচরণও দেখাতে পারেন। যেমন বিপদ-আপদে মানুষ যদি তোমার কাছে সহযোগিতার জন্য আসে বা ধর্মীয় সমাধানের জন্য তোমার দ্বারস্থ হয়, তাহলে মূলত এটা তোমার জন্য এক বিশেষ মর্যাদা। এটা আল্লাহ দান করেছেন। কারণ, ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য, বিপদ-আপদে সহযোগিতার জন্য বা ধর্মীয় সমস্যার সমাধানের জন্য তোমার কাছে আসতে হবে– একথা মানুষের মনে আল্লাহ ঢেলে দিয়েছেন। সুতরাং এটা আল্লাহপ্রদত্ত পদমর্যাদা। কাজেই নিজের পক্ষ থেকে এটাকে উপেক্ষা করো না। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে ভেবে মানবসেবা কর। যেমন বংশের একজন লোক সাধারণত এমন হয়ে থাকে, যার কাছে মানুষ বিপদে-আপদে, সুখ-দুঃখকে পরামর্শের জন্য যায়। এটা মূলত আল্লাহরই দান। কাজেই উপেক্ষা না করে মানবসেবায় আত্মনিয়োগ কর।

হযরত আইয়ুব (আ.)-এর ঘটনা

হযরত আইয়ুব (আ.) একবার গোসল করছিলেন। এমন সময় স্বর্ণপ্রজাপতির বৃষ্টি শুরু হলো। তিনি গোসল বন্ধ করে দিলেন এবং প্রজাপতিগুলো কুড়ানোর কাছে লেগে গেলেন। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাকে সম্পদশালী করি নি? তোমার কি সম্পদের অভাব আছে? তবুও কেন তুমি স্বর্ণপ্রজাপতি জমা করার পেছনে পড়লে? আইয়ুব (আ.) উত্তর দিলেন, হে আল্লাহ! অবশ্যই আপনি আমাকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন, যেগুলোর কৃতজ্ঞতা আদায়ে আমি অক্ষম। কিন্তু কথা হলো, আজকে এ সোনাগুলো তো আমাকে না চাইতেই দান করেছেন, এগুলো গ্রহণে আমি অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করি কিভাবে? আপনি আমাকে দান করলেন আর আমি তা গ্রহণ না করে কিভাবে বলবো যে, আমার প্রয়োজন নেই! আপনি দিচ্ছেন, আমার কাজ হলো মুখাপেক্ষী হয়ে তা নেয়া, তাই আমি নিচ্ছি।

আসলে আইয়ুব (আ.) এর দৃষ্টি স্বর্ণ-সম্পদের প্রতি ছিলো না, বরং তাঁর দৃষ্টি ছিলো ওই মহান দাতার প্রতি, যিনি এ সম্পদ বর্ষণ করেছেন। আর দানকারী সত্তা যখন এত মহান, তখন উচিত হলো– তা উপেক্ষা না করে আগ্রহভরা হৃদয়ে গ্রহণ করে নেয়া।

ঈদ-সালামি বেশি পাওয়ার আগ্রহ

এর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে আমি নিজের একটি ঘটনা বলে থাকি যে, আব্বাজান মুফতি শফী (রহ.) ঈদের সময় তাঁর সব ছেলেমেয়েকে ঈদ সালামি দিতেন। আমরা সব ভাই মিলে ঈদের সময় এলে তাঁর কাছে যেতাম, সালামি চাইতাম। বলতাম, গত বছর আপনি দিয়েছিলেন বিশ টাকা। জিনিসের দাম এ বছর আরও বেড়েছে, সুতরাং এবছর দিতে হবে পঁচিশ টাকা। এভাবে প্রতি

বছর বাড়িয়ে চাইতাম– বিশ টাকার জায়গায় পঁচিশ টাকা। পঁচিশ টাকার জায়গায় ত্রিশ টাকা। ত্রিশ টাকার জায়গায় পঁয়ত্রিশ টাকা। জবাবে আব্বাজান স্নেহভরা কণ্ঠে বলতেন, তোমরা চোর-ডাকাত– প্রতিবছর শুধু বাড়াও।

দেখুন, ওই সময় আমরা সব ভাই কিন্তু যথেষ্ট টাকা কামাতাম। অথচ আব্বাজানের কাছে টাকা চাই অত্যন্ত আগ্রহভরে। কেন এমন করতাম? আসলে ওই টাকাটা উদ্দেশ্য ছিলো না; বরং আমাদের দৃষ্টি ছিলো ওই মুবারক হাতের প্রতি। এমন হাতের সামান্য টাকাতেই সেই নূর ও বরকত ছিলো। যা হাজার টাকার মধ্যেও ছিলো না।

দেখুন, দুনিয়ার সাধারণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে যদি এরূপ হতে পারে, তাহলে মহান আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি অবস্থা হতে পারে? সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নেয়ামত এলে তা কখনও উপেক্ষা করো না, বরং খুব আগ্রহসহ গ্রহণ করবে।

چوں طمع خواہد سلطاں دین ○ خاک بر فرق قناعت بعد ازین

'তিনি যখন চান, তাঁর সামনে লালসা প্রকাশ করি, তখন অল্পেতুষ্টির মুখে ছাই। এ লালসার মাঝেই তখন প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যাবে।'

সুতরাং আল্লাহ যাকে যে কাজে নিয়োগ করেছেন, যাকে যে পদ দান করেছেন, তা আল্লাহরই অনুগ্রহ বিধায় তা নিজের থেকে ছেড়ে দিও না। তবে হ্যাঁ, যদি পরিস্থিতি তোমার প্রতিকূলে চলে যায় অথবা মুরুব্বি কেউ বলে দেয়, যেমন সে কাজ ছাড়ার ব্যাপারে বড় কারও সঙ্গে পরামর্শ করল। তিনি বললেন, কাজটা ছেড়ে দেয়াই তোমার জন্য উচিত হবে, তাহলে তখন সে কাজ ছেড়ে দেয়ার অবকাশ আছে।

সারকথা

যে নেয়ামত কামনা ছাড়াই অর্জিত হয়, তা আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ নেয়ামত। এর না-শোকরি বা অবমূল্যায়ন করো না। না-শোকরির পরিণাম কখনও কখনও অত্যন্ত ভয়াবহ হয়। 'আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।' এর কারণে আল্লাহর গযব ও বিপদও এসে পড়ে।

সুতরাং আল্লাহ যাকে যে খেদমতে লাগিয়ে রেখেছেন, দৃঢ়তার সঙ্গে সেই খেদমত চালিয়ে যাওয়া উচিত। এ খেদমত থেকে নিজের খেয়াল-খুশিমতো অবসর নেয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। বিনয়ের মাধ্যমে সে খেদমতের মধ্যে মনোযোগ দেয়া উচিত।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

সুদি পদ্ধতির করুণ বাস্তবতা এবং তার বিকল্প—পদ্ধতি

"সুদের কুফল আজ আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। যে আমেরিকাকে বিশ্ববাসী অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র মনে করে, বাস্তবতা হলো, তার ভেতরটাও এখন ফোকলা হয়ে গেছে। আমেরিকা আজ চরম অর্থনৈতিক দৈন্যতার শিকার। অথচ আমেরিকার অর্থনৈতিক চাকা সুদের জোরেই চলে। এজন্যই বলি, সেদিন বেশি দূরে নয়, যে সুদের করুণ বাস্তবতা বিশ্ববাসীর সামনে আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে। বিশ্ববাসী জানতে পারবে, আলকুরআন সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কেন করেছে?"

সুদি পদ্ধতির করুণ বাস্তবতা এবং তার বিকল্প-পদ্ধতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًاكَثِيْرًا - اَمَّابَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ - (سورة البقرة - ايت ٢٧٦)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

হামদ ও সালাতের পর!

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা! আজকের আলোচ্য বিষয় হলো সুদ। এর ইংরেজি নাম Usary অথবা Interest. বিষয়টি ব্যাপকভাবে চলছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগতের অধিকাংশের জীবন-যাপন সুদি কারবারের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে মুসলমানদের প্রতি মুহূর্তে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে, তারা কিভাবে লেনদেন করবে? কিভাবে রক্ষা পাবে সুদের অশুভ পরিণাম থেকে? বর্তমানে এ জাতীয় অপপ্রচারও চলছে যে, মানুষের জীবনাচারে যে

ইন্টারেস্টের প্রচলন রয়েছে, তা মূলত হারাম নয়। কারণ, এটা কুরআনে ঘোষিত সুদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এসব বিষয়কে সামনে রেখে আমাকে এ আলোচ্য বিষয় দেয়া হয়েছে, যেন আমি বিষয়টির ওপর কুরআন-হাদীস ও বর্তমান অবস্থার আলোকে আলোচনা করি।

সুদি লেনদেনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

সর্বপ্রথম বুঝবার বিষয় হলো, সুদি লেনদেনকে কুরআন মজীদ অনেক বড় গুনাহ বলে ঘোষণা করেছে। সম্ভবত অন্য কোনো গুনাহর ক্ষেত্রে এত বড় সতর্কবাণী আসেনি। যেমন মদ্যপ, শূকরের গোশত ভক্ষণকারী, ব্যভিচারী ইত্যাদি অপরাধীর ব্যাপারে কুরআন মজীদ এত কঠিন ভাষা ব্যবহার করেনি, যা সুদের ক্ষেত্রে করেছে। কুরআন মজীদের ঘোষণা হচ্ছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَابَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
ـ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ـ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে-সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। তারপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।' (সূরা বাক্বারা-২৭৮-২৭৯)

অর্থাৎ– যারা সুদের কারবার করে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এত কঠোর ঘোষণা অন্য কোনো গুনাহর ক্ষেত্রে দেয়া হয়নি। মদ পানকারী, শূকরের গোশত ভক্ষণকারী এবং ব্যভিচারী– এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা নেই। এখন প্রশ্ন হলো, সুদের ব্যাপারে এত কঠোর ভাষা কেন ব্যবহার করা হয়েছে? এর বিস্তারিত উত্তর সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

সুদ কাকে বলে?

প্রথমে জানতে হবে, সুদ কাকে বলে? সুদ কী জিনিস? এবং তার পরিচয় কী? কুরআন মজীদে এখন সুদকে হারাম বলেছে, তখন আরবরা সুদের কারবারে লিপ্ত ছিলো। কোনো ব্যক্তিকে প্রদানকৃত ঋণের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত অংশকে বলা হয় সুদ। আমি যেমন এক ব্যক্তিকে একশ' টাকা ঋণ দিলাম আর তাকে বললাম, এক মাস পর এ টাকা ফেরত নিবো, তবে তখন একশ' দুই টাকা ফেরত দিবে।

চুক্তি ব্যতীত অতিরিক্ত দেয়া সুদ নয়

চুক্তি বা শর্ত ব্যতীত যেমন– একশ' টাকা যখন ঋণ হিসাবে দিয়েছিলাম, তখন এ শর্ত আরোপ করেনি যে, আমাকে দিতে হবে একশত দুই টাকা। কিন্তু ফেরত দেয়ার সময় সে খুশিমনে আমাকে একশ' দুই টাকা দিলো, অথচ একশ' দুই টাকা দিতে হবে– এরূপ কোনো চুক্তি আমাদের মাঝে ছিলো না, এমতাবস্থায় এটা সুদ হবে না, হারামও হবে না বরং হালাল হবে।

ঋণ আদায়ের উত্তম পন্থা

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বিষয়টি প্রমাণিত যে, তিনি যখন ঋণ নিতেন, তারপর ঋণদাতা যখন ঋণ চাইতো, তখন তিনি ওই ঋণের সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু দিয়ে দিতেন, যেন ঋণদাতার মন খুশি হয়। কিন্তু ওই অতিরিক্ত অংশ যেহেতু পূর্ব থেকে নির্ধারিত ছিলো না, তাই এটা সুদ হিসাবে গণ্য হতো না। হাদীসের পরিভাষায় এটাকে বলা হয়েছে– حسن القضاء বা উত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ'। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

'তোমাদের মধ্যে উত্তম সে, যে ঋণ আদায়ের সময় উত্তম পন্থা অবলম্বন করে। সুদ হারাম। উত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করা হারাম নয়।

কুরআন মজীদে কোন সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে?

অনেকে যুক্তি পেশ করে থাকে যে, কুরআন মজীদ যে সুদকে হারাম করেছে, তা মূলত এরূপ ছিলো যে, জাহিলি যুগে ঋণগ্রহীতারা অধিকাংশ গরিব ও অসহায় ছিলো। জীবন-যাপনের ব্যবস্থা ছিলো তাদের নাগালের বাইরে। অসুস্থ হলে তারা চিকিৎসার অর্থকড়িও পেতো না। এমনকি কেউ নিজ বাসস্থানে মারা গেলে কাফন-দাফনের কোনো ব্যবস্থাও থাকতো না। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে কোনো অসহায় যদি কারো থেকে ঋণ নেয়ার ইচ্ছা করতো, তখন ঋণদাতা তাকে বলতো, তোমাকে ঋণ কিছুতেই দিতাম না, তবে পরিশোধের সময় এই পরিমাণ অর্থ দিলে দিতে পারি। আর এটা ছিলো কঠিন হৃদয়ের কাজ ও মানবতাবিরোধী। কারণ, এক ব্যক্তি ক্ষুৎ-পিপাসায় বিপন্ন, কঠিন সমস্যায় নিমগ্ন–এ অবস্থায় তাকে সুদবিহীন ঋণ না দেয়া জঘন্য অমানবিক কাজ। তাই আল্লাহ তা'আলা এটাকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং সুদ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

পক্ষান্তরে আমাদের সমাজে বিশেষ করে ব্যাংকে সুদের যে লেনদেন হয়, সেখানে ঋণগ্রহীতা দরিদ্র কিংবা অসহায় নয়; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে যথেষ্ট পুঁজিপতি হয়। আর এ জন্য ঋণ নেয় না যে, তার ঘরে খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই কিংবা চিকিৎসার অর্থ নেই, বরং সে এজন্য ঋণ নেয় যে, যেন ওই অর্থ নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ-কারবারে বিনিয়োগ করতে পারে এবং আরো বেশি মুনাফা অর্জন করতে পারে। সুতরাং এমতাবস্থায় যদি ঋণদাতা বলে, তুমি আমার টাকা-পয়সা নিজের ব্যবসায় খাটাবে এবং লভ্যাংশের এক দশমাংস আমাকে দিবে, তাহলে সমস্যাটা কোথায়? এটাকে কুরআনে ঘোষিত নিষিদ্ধ সুদ বলা যায় না কিছুতেই।

কমার্শিয়াল লোন (Commercial loan) তখনও ছিলো

মোটকথা প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, এ ব্যবসায়িক সুদ (Commercial Interest) এবং ব্যবসায়িক ঋণ (Commercial Loan) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর একান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। সুতরাং কুরআন মজীদে এটা কিভাবে নিষিদ্ধ হতে পারে? যার অস্তিত্ব সেই যুগে ছিলো না? এ যুক্তি দেখিয়ে কিছু লোক বলে, যে সুদকে কুরআন মাজীদে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তা অসহায় ও দরিদ্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বাহ্যিকরূপের পরিবর্তনে প্রকৃতরূপ বদলায় না

প্রথম কথা হলো, কোনো বস্তু হারাম হওয়ার জন্য এটা জরুরি নয় যে, তা হুবহু আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে পাওয়া যেতে হবে। বরং কুরআন মজীদে যখন কোনো বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়, তার এটা মূল দিক সামনে থাকে। কুরআন সেই মূল প্রকৃতিকে হারাম ঘোষণা করে। চাই তার বিশেষ কোনো আকৃতি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে পাওয়া যাক বা না যাক। যেমন মদ হারাম-এটা কুরআনের ঘোষণা। আর মদের মূল-প্রকৃতি হলো, এমন পানীয়, যা মাদকতা সৃষ্টি করে। এখন কেউ যদি বলে, জনাব! প্রচলিত মদ হুইস্কি (Whisky) বিয়ার (Beer) ও ব্রান্ডি (Brandy) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে ছিলো না, সুতরাং এগুলো হারাম নয়। তাহলে এমন ব্যক্তির এ জাতীয় কথা মোটেও সঠিক নয়। কারণ, রাসূল যুগে যদিও এগুলো এভাবে আধুনিক মোড়কে ছিলো না, কিন্তু তার মূল প্রকৃতি তথা মাদকতা সৃষ্টিকারী পানীয় তো সে যুগেও পাওয়া যেতো, রাসূলুল্লাহ (সা.) যাকে হারাম আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, মাদকতা সৃষ্টিকারী পানীয় যে নামেই কিংবা যে মোড়কেই আসুক তা হারাম। এজন্য একথা বলা যাবে না যে, কমার্শিয়াল লোন যেহেতু সে যুগে ছিলো না, বরং এটা এ যুগের সৃষ্টি বিধায় হারাম নয়। এ জাতীয় ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

একটি চুটকি

একটি চুটকি মনে পড়ে গেলো। ভারতে একজন গায়ক ছিলো। একবার সে হজ্বে গেলো। হজ্ব সম্পাদনের পর মক্কা থেকে মদীনার দিকে যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে কোনো এক মনযিলে অবস্থান করলো, সে যুগে বিভিন্ন মনযিল ছিলো। মুসাফিররা সেসব মনযিলে রাতযাপন করতো। পরের দিন একেবারে ভোরে যাত্রা শুরু করতো। গায়ক ও রাত যাপনের উদ্দেশ্যে এক মনযিলে গিয়ে ওঠলো। ওই মনযিলে কোথেকে এক আরবী গায়কও এসে গেলো এবং আরবী গান-বাদ্য শুরু করে দিলো। আরব গায়কের গলার সুর ছিলো খুব কর্কশ। আর ভারতীয় গায়কের কণ্ঠ ছিলো খুবই সুরেলা। তাই সে মন্তব্য করতে লাগলো, আজ বুঝলাম, রাসূলুল্লাহ (সা.) গানবাদ্য হারাম সাব্যস্ত করেছেন কেন? কারণ, তিনি হয়তো এর মতো আরব গায়কের গান শুনেছেন। যদি তিনি আমার গান শুনতেন, তাহলে গান-বাজনাকে হারাম বলতেন না।

বর্তমানে মানসিকতা

বর্তমান যুগের মানসিকতা হলো, প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে তারা বলে, জনাব! রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে কাজটি এভাবে হতো বিধায় তিনি তা হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আর বর্তমানে যেহেতু কাজটি আর এভাবে হয় না, তাই এটাকে হারাম বলা যাবে না। যেমন শূকরকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ, এটা দুর্গন্ধময় পরিবেশে লালিত হয় এবং অপবিত্র খাদ্য ভক্ষণ করে। এখন অনেক পরিচ্ছন্ন জায়গায় লালিত হয়, অনেক উন্নত ফার্মে পালিত হয়, সুতরাং এখন তা হারাম হবে না।

শরীয়তের একটি মূলনীতি

মনে রাখবেন, কুরআন মজীদে যখন কোনো বস্তু হারাম ঘোষিত হয়, তখন এর একটা আসল রূপ থাকে। তার আকার-আকৃতি ও প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন যতই হোক, তার সেই আসল রূপ আপন স্থানেই থাকে। ওই মূলটা কিন্তু হারামই হয়। এটা শরীয়তের একটি সর্বজনস্বীকৃত নীতি।

নবী-যুগ সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা

এটা সঠিক নয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)এর যুগে ব্যবসায়িক ঋণ (Commercial Loan) ছিলো না এবং সব ধরনের ঋণ শুধু নিজের প্রয়োজনে নেয়া হতো। এ বিষয়ে আব্বাজান মুফতি শফী (রহ.) একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটির নাম–মাসআলায়ে সুদ। গ্রন্থটির দ্বিতীয় অংশ আমি লিখেছি। সেখানে আমি

বেশকিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছি যে, নবী-যুগেও ব্যবসায়িক ঋণ (Commercial loan) এর লেনদেন চলতো।

যখন বলা হয়, আরবরা মরুবাসী ছিলো, তখন মানুষের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে এমন একটি সমাজচিত্র, যেখানে এসেছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং যে সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিলো না, যতটুকু ছিলো তাও গম কিংবা খেজুরের ছিলো। তাও আবার দশ-বিশ টাকার মধ্যেই যেন সীমিত। এজাতীয় ধারণা মূলত সম্পূর্ণ সঠিক নয়।

প্রতিটি গোত্র ছিলো জয়েন্ট স্টক কোম্পানী

প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে সমাজে এসেছিলেন, সেখানে এ আধুনিক যুগের সকল ব্যবসার প্রায় সব উপকরণই মৌলিকভাবে ছিলো। যেমন জয়েন্ট স্টক কোম্পানি। বলা হয়, এটা চতুর্দশ শতাব্দির সৃষ্টি। ইতোপূর্বে এর কল্পনাও ছিলো না। অথচ আরবের ইতিহাস মন্থন করলে প্রমাণিত হয়, আরবের প্রতিটি গোত্র ছিলো একেকটা জয়েন্ট স্টক কোম্পানি। কারণ, প্রতিটি গোত্রে পার্টনারশীপের ব্যবসার প্রচলন ছিলো। গোত্রের প্রতিটি সদস্য ক্ষুদ্র সঞ্চয় করতো। আর ওই টাকা সিরিয়া পাঠিয়ে সেখান থেকে বাণিজ্যিক পণ্য কিনে নিয়ে আসতো। সিরিয়ার এ সফর হতো গ্রীষ্মকালে। অনুরূপভাবে শীতকালে ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে তারা পাড়ি জমাতো। শীত ও গ্রীষ্মকালের এই দুই সফর শুধু ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই হতো। এক জায়গা থেকে পণ্য ক্রয় করে অন্য স্থানে বিক্রি করতো। কখনও কখনও তারা নিজেদের গোত্র থেকে দশলাখ দিনারও ঋণ হিসাবে নিতো। এখন প্রশ্ন হলো, তারা কি শুধু পেটের কিংবা মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেয়ার তাগিদে এত বড় অঙ্কের ঋণ নিতো? নিশ্চয় নয়। বোঝা গেলো, এত বিশাল অঙ্কের ঋণ তারা ব্যবসার উদ্দেশ্যেই নিতো।

বর্জনকৃত সর্বপ্রথম সুদ

বিদায় হজ্বের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন সুদ হারাম ঘোষণা করেছিলেন, তখন বলেছিলেন–

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلُ رِبًا اَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاِنَّهٗ مَوْضُوْعٌ كُلُّهٗ۔ (صحيح مسلم ، كتاب الحج، رقم الحديث ١٢١٨)

অর্থাৎ– আজ জাহিলিয়াত যুগের সুদ বর্জন করা হচ্ছে এবং সর্বপ্রথম সুদ যা আমি ছেড়ে দিয়েছি, তাহলো আমার চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব

এর সুদ। কারণ, হযরত আব্বাস (রা.) লোকদেরকে ঋণ দিতেন সুদের ওপরে। তাই তিনি ঘোষণা করে দিলেন, সুদ বাবত যেসব টাকা আব্বাস (রা.) এখনও পাওনা রয়েছে, তা আজ শেষ করে দিলাম। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, এ সুদের পরিমাণ ছিলো দশ হাজার মিসকাল সোনা। প্রায় চার মাশায় হয় এক মিসকাল। আর দশ হাজার মিসকাল তাঁর মূলধন ছিলো না বরং সুদ ছিলো যা মানুষের কাছে ঋণ ছিলো। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, যে ঋণের ওপর দশ হাজার মিসকাল সোনা সুদ হিসাবে এসেছে, তা শুধু পেটের দায়ে ছিলো না। বরং এটা ছিলো কমার্শিয়াল তথা ব্যসায়িক ঋণ।

সাহাবা যুগের ব্যাংকিং সিস্টেম : একটি দৃষ্টান্ত

হযরত যুবায়ের ইবনে আতরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জলীলুল কদর সাহাবী। বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন। বর্তমানের যে ব্যাংকিং পদ্ধতি রয়েছে, তিনি এ জাতীয় পদ্ধতি চালু করেছিলেন। কেউ যখন তাঁর কাছে আমানত নিয়ে আসতো, তাকে তিনি বলে দিতেন, আমানতের এ টাকাটা আমি ঋণ হিসাবে নিচ্ছি, তারপর তিনি ওই টাকা ব্যবসায় লাগাতেন। যে সময় তিনি ইনতেকাল করেন, তখন তাঁরই ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) নিজ পিতা সম্পর্কে বলেন—

فَحَسِبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدُّيُوْنِ فَوَجَدْتُهٗ اَلْفَيْ اَلْفٍ وَمِاَتَيْ اَلْفٍ ـ

(طبقات لابن سعد ـ ص ٩ ج ٣)

অর্থাৎ— 'আমি আমার পিতার দায়িত্ব পরিশোধযোগ্য ঋণ পেলাম বাইশ লাখ দিনার।'

অতএব ওই যুগে কমার্শিয়াল ঋণ ছিলো না এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব কথা। বাস্তবতা হলো, ওই যুগে কমার্শিয়াল ঋণ ছিলো এবং তার ওপর সুদি লেনদেনও হতো। আর কুরআন মজীদে সকল সুদি ঋণকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং কমার্শিয়াল ঋণের ওপর ইন্টারেস্ট নেয়া জায়েয এবং ব্যক্তিগত ঋণের ওপর ইন্টারেস্ট নেয়া নাজায়েয এ জাতীয় কথা সম্পূর্ণ অমূলক, অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন।

চক্রবৃদ্ধি এবং সাধারণ সুদ উভয়টাই হারাম

এক্ষেত্রে মানুষের মাঝে ছড়ানো হচ্ছে আরেকটি বিভ্রান্তি। তাহলো, একপ্রকার সুদ সাধারণ সুদ (Simple Interest)। আরেকটি হলো চক্রবৃদ্ধি সুদ

(Compund Interest)। তথা সুদের ওপর সুদ। কেউ কেউ বলে, নবী যুগে যে সুদের প্রচলন ছিলো, তাহলো চক্রবৃদ্ধি সুদ। কুরআন মজীদে এ সুদকেই হারাম বলা হয়েছে। এজন্য চক্রবৃদ্ধি সুদ হারাম। তবে সাধারণ সুদ জায়িয। কেননা, সাধারণ সুদের প্রচলন নবী যুগে ছিলো না বিধায় কুরআন মজীদে সাধারণ সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে–

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُو اللّٰهَ وَذَرُوْا مَابَقِىَ مِنَ الرِّبَا-

'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে অংশ অবশিষ্ট রয়েছে, তা ছেড়ে দাও।' (সূরা বাক্বারা-২৭৮)

* অর্থাৎ– সুদ কম-বেশি হওয়াতে কোনো ব্যবধান নেই বা Rate of Interest-এর কম-বেশি হওয়ার ব্যাপারে কোনো বক্তব্য নেই। বরং সুদ বলতেই সবকিছু ত্যাগ কর। তারপর ইরশাদ হচ্ছে–

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ-

'আর তোমরা যদি সুদ থেকে তাওবা কর, তাহলে তোমাদের যে মূলধন (Principal)রয়েছে তা তোমাদের প্রাপ্য। (সূরা বাক্বারা-২৭৯)

কুরআনে স্পষ্টভাবে এসেছে যে, মূলধন (Principal) তো তোমাদের হক, কিন্তু এর অতিরিক্ত অল্পপরিমাণ নেয়াও নাজায়েয। অতএব চক্রবৃদ্ধি সুদ হারাম এবং সাধারণ সুদ হারাম নয় এজাতীয় কথা সম্পূর্ণ ভুল। বরং সুদ সুদই। কম-বেশি যেকোনো সুদ হারাম। ঋণগ্রহীতা গরিব হলেও হারাম, ধনী হলেও হারাম। ব্যক্তিগত জরুরতে ঋণ নিলেও হারাম, ব্যবসার উদ্দেশ্যে ঋণ নিলেও হারাম। সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ নেই।

চলমান ব্যাংকিং ইন্টারেস্ট সর্বসম্মতিক্রমে হারাম

এ প্রসঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, মুসলিম বিশ্বে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগ থেকেই ব্যাংকিং সুদের (Banking Interest) ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করা হচ্ছে। যেমন ইতোপূর্বে বলেছি যে, কেউ বলেন, (Compound Interest)তথা চক্রবৃদ্ধি সুদ হারাম, (Simple Interest) তথা সাধারণ সুদ হারাম নয়। আবার কেউ বলেন, (Commercial loan)তথা বাণিজ্যিক ঋণ হারাম নয়। এত বছর পর্যন্ত এ জাতীয় আরো বহু প্রশ্ন সৃষ্টি করা হলেও বর্তমানে এ আলোচনার ইতি ঘটেছে। গোটা বিশ্বের শুধু ওলামায়ে কেরামই নন বরং অর্থনীতিবিদ ও মুসলিম ব্যাংকাররাও এ ব্যাপারে একমত যে, ব্যাংকিং ইন্টারেস্ট হারাম, (যেমনিভাবে

সাধারণ লেনদেনে সুদ হারাম। এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোনো আলেমের মতানৈক্য নেই। আজ থেকে প্রায় চার বছর পূর্বে সৌদি আরবের জিদ্দায় মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী (Islamic Figh Academy)এর উদ্যোগে এ ব্যাপারে একটি ফিকহি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় পয়তাল্লিশটি মুসলিম রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ওলামা প্রতিনিধি সেমিনারটিতে অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। তখন অংশগ্রহণকারী ওলামায়ে কেরামের প্রায় সকলেই এ ফতওয়া দেন যে, ব্যাংকিং ইন্টারেস্ট সম্পূর্ণ হারাম, এটা জায়েয বলার কোনো অবকাশ নেই। পঁয়তাল্লিশটি দেশের প্রায় দুইশ' ওলামা প্রতিনিধি উক্ত ফতওয়াটিতে স্বাক্ষর করেন।

কমার্শিয়াল লোনের ওপর আরোপিত ইন্টারেস্টের মধ্যে এমন কী ক্ষতি?

বিরুদ্ধবাদীরা বলে, রাসূল (সা.) এর যুগে শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ নেয়া হতো। যদি কেউ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যেমন তার খাদ্যের অভাব কিংবা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার মতো অবস্থা তার নেই এজন্য ঋণ নিচ্ছে এবং ঋণদাতা তার থেকে সুদও চাচ্ছে, তাহলে নিশ্চয় এটা একটা অমানবিক কাজ। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে লাভবান হচ্ছে, যদি আমি তার লভ্যাংশ থেকে কিছু অংশ নেই, তাহলে এতে এমন কী ক্ষতি?

লোকসানের দায়ভারও নিতে হবে

প্রথম কথা হলো, কোনো মুসলমানের জন্য অবকাশ নেই আল্লাহর কোনো বিধানের ক্ষেত্রে আপত্তি পেশ করার। আল্লাহ কোনো বস্তুকে হারাম ঘোষণা করলে তা হারাম হিসাবেই জানতে হয়। তবুও আন্তরিক প্রশান্তির জন্য বলছি, মনে কর যদি কাউকে ঋণ দাও, তখন ইসলামের বক্তব্য হলো, দুটি বিষয়ের একটা নির্দিষ্ট করে নাও। তুমি কি তার কোনো সহযোগিতা করতে চাও? না তার ব্যবসায় অংশীদার হতে চাও? যদি ঋণ দিয়ে তাঁকে সহযোগিতা করতে চাও, তাহলে তার কাছে অতিরিক্ত আশা করার অধিকার তোমার নেই। আর যদি তার ব্যবসায় অংশীদার হতে চাও, তাহলে যেমনিভাবে তার ব্যবসায়ের লভ্যাংশের অংশীদার হবে, তেমনিভাবে লোকসানেরও অংশীদার হতে হবে। শুধু লভ্যাংশের অংশীদার হওয়ার সুযোগ তোমার নেই। লাভ হলে তোমারও অংশ থাকবে আর লোকসান হলে শুধু সে-ই বহন করবে এটা মোটেও হতে পারে না। বরং লোকসানের দায়ভারও তোমাকে নিতে হবে।

প্রচলিত ইন্টারেস্ট সিস্টেমের অশুভ পরিণাম

বর্তমানে যে ইন্টারেস্ট পদ্ধতি চলছে, তার সারকথা হলো, অনেক সময় ঋণগ্রহীতার লোকসান হয় আর ঋণদাতা লাভবান হয়। আবার অনেক সময় ঋণগ্রহীতা বিপুল-পরিমাণে লাভবান হয়, কিন্তু ঋণদাতাকে লভ্যাংশ দেয় খুবই সামান্য পরিমাণে। ফলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিষয়টিকে একটি উদাহরণের মাধ্যমে আরো স্পষ্ট করে দিচ্ছি।

ডিপোজিটর সর্বাবস্থায় লোকসানে থাকে

যেমন এক লোক এক কোটি ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করলো। সে এ এক কোটি টাকা কোথায় পেলো? এ টাকা এসেছে ডিপোজিটরদের কাছ থেকে। এই এক কোটি টাকা একটা গোষ্ঠির। লোকটি একটি গোষ্ঠির এক কোটি টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে। আর ব্যবসায় তার ১০০% লাভ হয়েছে। এখন তার নিকট হয়েছে সর্বমোট দুই কোটি টাকা, যার মধ্য থেকে ১৫% তথা পনের লাখ টাকা সে ব্যাংককে দিয়েছে। ব্যাংক তার নির্ধারিত কমিশন রেখে ৭% অথবা ১০% ডিপোজিটদেরকে দিয়েছে। ফলে তাদের টাকা লোকটি নিজের ব্যবসায় খাটিয়েছিলো, তারা একশ' টাকায় শুধু সাত টাকা অথবা দশ টাকা লাভ পেয়েছে। এতেই তারা অর্থাৎ ডিপোজিটররা খুব খুশি। অথচ তার তো জানা নেই, তার লভ্যাংশ হওয়া উচিত ছিলো একশ' টাকায় দুইশ' টাকা।

অপরদিকে যে দশ টাকা ডিপোজিটররা লাভ হিসাবে পেয়েছে, তাও ঋণগ্রহীতা তাদের থেকে আদায় করে নেয়। আদায় করার পদ্ধতি হলো, ঋণগ্রহীতা এ দশ টাকাকে উৎপাদন ও ব্যয়ের খাতে গণ্য করে। যেমন কেউ এক কোটি টাকা ঋণ নিয়ে কোনো ফ্যাক্টরীতে খাটালো কিংবা কোনো বস্ত্র প্রোডাক্ট করলো, যেখানে ব্যয় বাবদ উক্ত ১৫% ও অন্তর্ভুক্ত করে নিলো, যে ১৫% সে ব্যাংককে দিয়েছিলো। যখন এ ১৫% ও পণ্য তৈরি বাবদ ব্যয় হিসাবে ধরা হবে, তখন উৎপাদিত পন্যের মূল্য ১৫% বেড়ে যাবে। যেমন সে কাপড় উৎপাদন করেছিলো। ইন্টারেস্টের কারণে ওই কাপড়ের মূল্য ১৫% বেড়ে যাবে। ফলে ডিপোজিটর'স যারা একশ টাকায় দশ টাকা লাভ পেয়েছে যখন মার্কেট থেকে কাপড় ক্রয় করবে, তখন ওই কাপড়ের মূল্য ১৫% বেশি দিয়ে তাকে ক্রয় করতে হবে। সুতরাং ডিপোজিটর'স যাদেরকে ১০% মুনাফা দেয়া হয়েছিলো এভাবে কৌশলে আরো বেশি বাড়িয়ে ১৫% তাদের থেকে আদায় করে নিলো। অথচ ডিপোজিট'রস তো খুশিতে আটখানা যে, একশ' টাকায় দশ টাকা লাভ হয়েছে। কিন্তু যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করা হয়, তাহলে

দেখা যাবে যে, একশ টাকার স্থলে তারা পঁচানব্বই টাকা পেয়েছে। কারণ ১৫% তো বস্ত্রখাতে চলে গেছে। অপরদিকে ৮৫% মুনাফা ঋণগ্রহীতার পকেটে চলে গেছে। এইজন্য ডিপোজিট ব্যবস্থা সর্বাবস্থায় ক্ষতিকর।

মুশারাকাত পদ্ধতির উপকারিতা

যদি মুশারাকাত তথা যৌথ-কারবার করা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয়, ৫০% লাভ ঋণগ্রহীতা ব্যবসায়ী পেয়ে যাবে. তখন সাধারণ লোকদের লাভ ১৫% এর স্থলে ৫০% হবে এবং ৫০% উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়খাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ, লভ্যাংশ সামনে আসবে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করার পর। তারপর তা বন্টন করা হবে। অপরদিকে সুদ তো ব্যয় খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কিন্তু লাভ ব্যয় খাতের অন্তর্ভুক্ত হয় না। এ যৌথ ব্যবসা মূলত সম্মিলিত লাভের একটি উপায়।

লাভ একজনের লোকসান আরেকজনের

যেমন কেউ এক কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে। ওই ব্যবসায় তার লোকসান হয়ে গেছে আর ব্যাংক লোকসানের কারণে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। ফলে তখন কার টাকা নষ্ট হলো? নিশ্চয় লোকসান সাধারণ মানুষের হলো। এ অবস্থায় লোকসান হয় শুধু সাধারণ মানুষের আর লাভ হয় শুধু ঋণগ্রহীতার।

বীমাকোম্পানী থেকে লাভ ভোগ করছে কারা?

ঋণগ্রহীতা ব্যবসায়ীর লোকসান হলে ক্ষতিপূরণের জন্য অন্য এক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তা হলো, ইনস্যুরেন্স (Insurance)। যেমন তুলার গুদামে আগুন লেগে গেলো, যার কারণে ক্ষতিপূরণে দায়ভার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ওপর বর্তায়। প্রশ্ন হলো, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির টাকা কোথা হতে আসে? এটাও তো সাধারণ গরিব লোকদের। ইন্স্যুরেন্স করা পর্যন্ত তারা নিজেদের গাড়ি রোডে নামাতে পারে না। আর সাধারণ মানুষের গাড়ি একসিডেন্ট হয় না, তাদের গুদামে অগ্নিদগ্ধ হয় না। অথচ তারা বীমার কিস্তি(Premium) আদায় করতে বাধ্য। এ গরিব জনগণের বীমার টাকায় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির বিশাল বিশাল ভবন নির্মিত হয় এবং এদেরই ডিপোজিটের মাধ্যমে ব্যবসায়ীর ক্ষতিপূরণ হয়। এসব জট পাকানোর কারণ হলো, ব্যবসায় যেন লাভটা পুঁজিপতির হয়। আর লোকসান হলে জনসাধারণের হয়। অথচ এসব অর্থ সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হলে এর সব লাভ সাধারণজনগণেরই হতো। কিন্তু অর্থ বন্টনের যে পদ্ধতি (Distribution of Wealth)আমাদের সমাজে চালু

রয়েছে, এতে ধনী আরো ধনী হচ্ছে, গরিব আরো গরিব হচ্ছে। এসব অশুভ পরিণামের প্রতি লক্ষ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'সুদ খাওয়া আপন জননীর সঙ্গে ব্যভিচার করার নামান্তর। এত বড় হুমকির কারণ হচ্ছে, সুদ একটি সামাজিক অভিশাপ। এতে গোটা জাতি ধ্বংসের লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়।

বিশ্বব্যাপী সুদের ধ্বংসাত্মক আগ্রাসন

কুরআন মজীদে সুদ হারাম ঘোষিত হয়েছে বিধায় কিছুকাল পূর্বেও আমরা সুদকে হারাম মনে করতাম। এর জন্য যুক্তি পেশ করার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। আজ এর কুফল আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। আজ গোটা বিশ্ব ইন্টারেস্ট পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছে। আমেরিকাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বিশ্বব্যাপী আজ তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তার ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে। আমেরিকা আজ চরম অর্থনৈতিক দৈন্যতার শিকার। অথচ আমেরিকার অর্থনীতির চাকা সম্পূর্ণ সুদ-নির্ভর। সেদিন বেশি দূরে নয় যে, সুদের করুণ বাস্তবতা বিশ্ববাসীর সামনে আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে। মানুষ জানতে পারবে কুরআন মজীদে সুদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ ঘোষণা দেয়া হয়েছে?

বিকল্প পথ

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাহলো আমরা মানলাম, ইন্টারেস্ট হারাম। কিন্তু ইন্টারেস্ট পদ্ধতি বন্ধ করে দেয়া হলে তার বিকল্প পদ্ধতি কী হতে পারে, যার মাধ্যমে মানুষ সুদের অভিশাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে?

এ প্রশ্ন ওঠার কারণ হলো, চলমান পৃথিবীতে ইন্টারেস্টকে মনে করা হয় অর্থনীতির প্রাণ। আর প্রাণশক্তিকে মেরে ফেললে বাহ্যিক দৃষ্টিতে এর কোনো বিকল্প পদ্ধতি নজরে পড়ছে না। তাই মানুষের ধারণা হলো, সুদি পদ্ধতি ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। থাকলেও বাস্তবায়ন করার মত উপযুক্ত নয়। যদি বাস্তবায়ন করার কোনো ফর্মুলা কারো জানা থাকে, তাহলে বলুন সেটা কী হতে পারে?

উক্ত প্রশ্নের উত্তর বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। উত্তরটা কিছুটা টেকনিক্যালিও। তবুও আমি সকলের বোধগম্য করে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো।

শরীয়তে অসম্ভব বিষয়কে নিষেধ করা হয়নি

আল্লাহ কোনো বস্তুকে হারাম করেছেন– এর অর্থ সেটা অবশ্যই হারাম। হারামকে হারাম মানা মানুষের সাধ্য বহির্ভূত নয় বিধায় তিনি তা হারাম

করেছেন। হারাম বস্তু যদি হালালযোগ্য হতো এবং মানুষের পক্ষে মানা অসম্ভব হতো, তাহলে তা তিনি হারাম করতেন না। এ মর্মে তিনি বলেছেন−

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ـ

'আল্লাহ তাআলা কারো ওপর কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না, যা তার সাধ্যবহির্ভূত।'

এজন্য একজন মুমিনের কাছে কোনো বস্তু হারাম হওয়ার জন্য আল্লাহর ঘোষণাই যথেষ্ট। কারণ, কোন জিনিস মানুষের প্রয়োজন আর কোনটির প্রয়োজন নেই এটা আল্লাহ থেকে বেশি কে জানেন? সুতরাং আল্লাহ কোনো বস্তুকে হারাম ঘোষণা করার অর্থ হলো, এটা মানুষের সাধ্যাতীত নয় যে, মানুষ একে হারাম জানবে এবং এ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। এটা বলা সঠিক নয় যে, মানুষ এ হারামটি ছাড়া চলতে পারবে না।

শুধু কর্জে হাসানাই বিকল্প পদ্ধতি নয়

আরেকটি কথা না বললেই নয়। তাহলো, কারো কারো ধারণা এই যে, কুরআনে ঘোষিত হারাম ইন্টারেস্ট-এর ব্যাখ্যা হলো, ভবিষ্যতে যখন কাউকে ঋণ দিবে সুদবিহীন ঋণ (Inerest Free Loan) দিতে হবে। ঋণের ওপর কোনো ধরনের মুনাফা চাওয়া যাবে না। এভাবে সুদবিহীন ঋণের ধারা চালু বলে সমাজ থেকে সুদ বিদায় নেবে। একজন লোক এ ঋণের টাকা দিয়ে বাড়ি-গাড়ি করতে পারবে, ইচ্ছা করলে ফ্যাক্টরির পেছনে খরচ করতে পারবে। এতে কোনো প্রকার সুদ চাওয়া যাবে না। তবে কথা হলো, এত টাকা কর্জে হাসানা তথা সুদবিহীন ঋণ দেয়া আসলেই কি সম্ভব? কেউ কি এরকম দিতে চাইবে। কিংবা সবাইকে সুদবিহীন ঋণ দেয়ার জন্য এত টাকা আসবে কোথেকে? সুতরাং এ প্রক্রিয়াও ব্যাপকহারে কার্যকর করার যোগ্য (Practicable) নয়।

যৌথ-ব্যবসা : সুদি ঋণের একটি বিকল্প পদ্ধতি

মূলত প্রচলিত সুদি-পদ্ধতির বিকল্প পদ্ধতি শুধু সুদবিহীন ঋণ নয়; বরং যৌথ ব্যবসাও চমৎকার একটি বিকল্প পদ্ধতি। অর্থাৎ− কেউ ব্যবসার জন্য ঋণ চাইলে ঋণদাতা বলবে, আমি তোমার ব্যবসায় অংশীদার হতে চাই। যদি তোমার লাভ হয়, তাহলে ওই লাভের কিছু অংশ আমাকে দিবে। আর লোকসান হলে তারও অংশীদার আমি হবো। একেই বলে যৌথ ব্যবসা। এটা চলমান ইন্টারেস্ট পদ্ধতির একটি বিকল্প পদ্ধতি (Alternative system) ইন্টারেস্ট পদ্ধতির ডিপোজিটর পায় সামান্য কিছু অংশ। কিন্তু যদি যৌথ

ব্যবসার কারবার করে, তাহলে লভ্যাংশের একটা বড় অংশ ডিপোজিটর পাবে। তখন সম্পদ বন্টন (Distribution of Wealth)উর্ধ্বগামী হওয়ার পরিবর্তে নিম্নগামী হবে। এজন্য ইসলাম প্রচলিত সুদি কারবারের বিকল্প পদ্ধতি যৌথ কারবারকে পেশ করেছে।

যৌথ ব্যবসার শুভ ফল

তবে বর্তমান বিশ্বে যেহেতু যৌথ ব্যবসা পদ্ধতি কোথাও চালু হয়নি, তাই এর কল্যাণ মানুষের সামনে স্পষ্ট নয়। সম্প্রতি বিশ-পঁচিশ বছর ধরে মুসলমানরা বিভিন্ন দেশে এ পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা করছে। তারা প্রচলিত সুদমুক্ত এমন কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক চালু করেছে, যেগুলো ইসলামী ভাবধারায় পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমান বিশ্বে ৮০ থেকে ১০০টি এমন ব্যাংক চালু হয়েছে, যাদের দাবী হলো, ইসলামী ভাবধারা মতে সুদমুক্ত ব্যবসা তারা চালাচ্ছে। আমি এটা বলছি না যে, তাদের দাবী ১০০% সঠিক। এর মাঝে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে। এসব ব্যাংক শুধু মুসলিম বিশ্বেই নয় বরং ইউরোপ আমেরিকাতেও চালু হয়ে গেছে এবং সুদের বিকল্প যৌথ ব্যবসাপদ্ধতি তারা শুরু করেছে। এ পদ্ধতি যেখানেই চালু করেছে, সেখানেই আশাতীত ফল পাওয়া গেছে। আমরা পাকিস্তানে একটি ব্যাংকে পরীক্ষা চালিয়েছি। আমি নিজে তার শরীয়া বোর্ডের সদস্য হওয়ার সুবাদে দেখাশোনা করেছি। তাতে দেখেছি, যৌথ ব্যবসা পদ্ধতিতে ডিপোজিটর ২০% পর্যন্ত লাভ পাচ্ছে। এ পদ্ধতিকে যদি আরো ব্যাপক করা যায়, তাহলে এর শুভ ফল হবে এরচেয়েও বহুগুণ বেশি।

যৌথ ব্যবসায় সমস্যা

এ পদ্ধতিতে একটা সমস্যাও আছে। তাহলো, যদি কেউ যৌথ ব্যবসার চুক্তিতে ব্যাংক থেকে টাকা নেয়, যৌথ ব্যবসার অর্থ হলো, লাভ-লোকসানে সমান অংশীদার (Profit and loss Sharing)হওয়া। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের মুসলিম বিশ্বে আজ দুর্নীতির সয়লাব শুরু হয়েছে। যৌথ ব্যবসার চুক্তিতে টাকা নিয়ে কেউ কোনোদিন ব্যাংককে লাভ দেখায় না। শুধু লোকসানই দেখায়। ব্যাংককে লভ্যাংশ দেওয়া তো দূরের কথা, উল্টো ক্ষতিপূরণ দাবি করে বসে।

বাস্তবেই এটা এক বিরাট সমস্যা। তবে এ সমস্যাটি মূলত যৌথ ব্যবসার কারণে নয়, বরং ঋণগ্রহীতার দুর্নীতির কারণে, এ কারণে এটা বলা যাবে না যে, যৌথ ব্যবসার কার্যকারিতা ডিপোজিটরদের জন্য অকল্যাণকর।

এ সমস্যার সমাধান

তবে উক্ত সমস্যার যে সমাধান নেই এমন নয়। বরং এরও সমাধান ইসলামে রয়েছে। যে দেশে যৌথ ব্যবসা পদ্ধতি চালু করা হবে, সে দেশের জন্য এর সমাধান তো একেবারে সহজ। তাহলো, ঋণগ্রহীতা যদি লাভের পরিবর্তে লোকসান দেখায়, তাহলে তা তদন্ত করা হবে। তদন্তে তার দুর্নীতি প্রমাণিত হলে তাকে ব্ল্যাকলিস্ট (Black list)-এর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হবে এবং তার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এরূপ করা হলে ভবিষ্যতের জন্য সকলেই সতর্ক হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় বিকল্প পদ্ধতি ইজারা

আল্লাহ তাআলা আমাদের এমন এক জীবনব্যবস্থা দান করেছেন, যাতে ব্যাংকিং ও ফান্যিান্সিং-এর ক্ষেত্রে যৌথ ব্যবসা ছাড়াও আরো অনেক পদ্ধতি রয়েছে। যেমন একটি পদ্ধতি হলো ইজারা তথা (Leasing) সিস্টেম। কেউ ব্যাংক থেকে অর্থ চাইলো, ব্যাংক তাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি কী কাজের জন্য টাকা চাচ্ছো? তখন সে বললো, আমার কারখানায় বিদেশ থেকে একটি মেশিন আনতে হবে। তখন ব্যাংক এ লোককে টাকা না দিয়ে নিজেই মেশিন ক্রয় করে তাকে ভাড়া দিলো। এটাকে বলা হয়, ইজারা বা(Leasing).

বর্তমানে ব্যাংকগুলোতে যে (Leasing system) চালু আছে, তা শরীয়তের অনুকূলে নয়। প্রচলিত এ পদ্ধতি কিছু কিছু দিক সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী। তবে একেও সহজেই শরীয়তের অনুকূলে আনা যায়।

তৃতীয় বিকল্প পদ্ধতি মুরাবাহা

অনুরূপভাবে আরেকটি বিকল্প পদ্ধতি হলো মুরাবাহা ফাইন্যান্সি। এটাও হালাল কারবারের একটি পদ্ধতি, যাতে লাভে কোনো বস্তু বিক্রি করে দেয়া হয়। যেমন কেউ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কাঁচামাল (Raw Matcrial) ক্রয় করতে চায়, তখন ব্যাংক তাকে টাকা দেয়ার পরিবর্তে কাঁচামাল ক্রয় করে তা লাভে বিক্রি করে দিলো, শরীয়তে এ পদ্ধতিও হালাল।

কেউ কেউ মনে করে, মুরাবাহা পদ্ধতি তো হাত ঘুরিয়ে কান ধরার মতো হয়ে গেলো। কারণ, এতে ব্যাংক সুদ নেয়ার পরিবর্তে অন্য পদ্ধতিতে লাভ আদায় করে নেয়। মূলত এ জাতীয় ধারণা সঠিক নয়। কারণ, আল্লাহ বলেছেন–

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۔

'অর্থাৎ– আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।' (সূরা বাক্বারা-২২৫)

মক্কার মুশরিকরাও সে সময় বলে বেড়াতো, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদেরই মত।' কারণ, বেচা-কেনা দ্বারা মানুষ লাভবান হয়, সুদ দ্বারাও মানুষ লাভবান হয়। এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? কুরআন মজীদ এর স্পষ্ট উত্তর দিয়েছে যে, এটা আল্লাহর বিধান যে, সুদ হারাম আর বেচাকেনা হালাল। যার ব্যাখ্যা হলো, টাকার বিনিময়ে লেন-দেন করে লাভ নেয়া যাবে না। কিন্তু মাঝখানে যদি কোনো পণ্য থাকে এবং তা বিক্রি করে লাভবান হয়, তাহলে এটা করা যাবে। আর মুরাবাহাতে মাঝখানে পণ্য চলে আসে। তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে এ লাভ হালাল, একে ইংরেজিতে বলা হয় Trascaction.

সর্বোত্তম বিকল্প পদ্ধতি কোনটি?

তবে মুরাবাহা এবং (Leasing)-সুদের বিকল্প পদ্ধতি হলেও সর্বোত্তম বিকল্প পদ্ধতি (Ideal Alternative) নয়। কারণ এ দু'টির মাধ্যমে সম্পদ বন্টনে (Distribution of Wealth) মৌলিক কোনো প্রভাব পড়ে না। এজন্য সর্বোত্তম বিকল্প পদ্ধতি হলো যৌথ ব্যবসা পদ্ধতি। হ্যাঁ স্বতন্ত্র ফ্যাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে উক্ত দুই পদ্ধতিও যাচাই করে দেখার অবকাশ আছে।

সুদ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা হলো, কেউ কেউ মনে করে, অমুসলিম রাষ্ট্রে সুদি লেনদেনে কোনো সমস্যা নেই। এ ধারণা সঠিক নয়। বরং সুদ হারাম। মুসলিম রাষ্ট্রে হোক কিংবা অমুসলিম রাষ্ট্রে হোক সুদ হারাম। এজন্য সুদ থেকে নিরাপদে থাকার জন্য মানুষের উচিত ব্যাংকে টাকা রাখতে চাইলে কারেন্ট একাউন্টে রাখা, যেখানে কোনো সুদ নেই। কিন্তু কেউ যদি সেভিংস একাউন্টে টাকা রাখে, আর ওই টাকার ওপর সুদ জমা হয়, তখন মুসলিম রাষ্ট্রে হলে মানুষকে আমরা বলি, সুদের টাকা ব্যাংকে রেখে দাও। কিন্তু যে দেশে এ ধরনের টাকা ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়, সেখানে ওই লোকের উচিত সুদের টাকা ব্যাংক থেকে উঠিয়ে যাকাত খেতে পারে এমন কোনো লোককে সাওয়াবের নিয়ত ব্যতীত শুধু দায়মুক্ত হওয়ার জন্য দান করে দেয়া। সুদের টাকা নিজে কিছুতেই ব্যবহার করতে পারবে না।

ইসলামী ভাবধারায় অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সুবাদে আপনাদেরকে একটি কথা বলতে চাই যে, যদিও কাজটা একটু কঠিন মনে হবে, তবুও মুসলমানদের এ ব্যাপারে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালানো উচিত। তা হলো, ইসলামী ভাবধারায় অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, মুশারাকা তথা যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, মুরাবাহা পদ্ধতি এবং লিজিং পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ স্কিম ইসলামে

রয়েছে। এগুলোর ওপর ভিত্তি করে মুসলমানরা অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান কায়েম করতে পারে। স্বতন্ত্র ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট আজ মুসলমানদের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। আমেরিকাতে 'আল হামদুলিল্লাহ' কিছু মুসলমান এ বিষয়ে কাজ করছে। টরেন্টো এবং লস এ্যাঞ্জেল্সে এ জাতীয় দু'টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলো ইসলামের কাঠামোমাফিক পরিচালিত হচ্ছে। অবশ্য এগুলো এখনো হাউজিং পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। আরো ব্যাপক পরিসরে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান কায়েম করা আজ সময়ের দাবী। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, অভিজ্ঞ ফকীহ ও মুফতিকর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হতে হবে। 'আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানকে উত্তম পথ অবলম্বন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

আর নয় সুন্নাত নিয়ে উপহাস

"যারা তাগুতীদের কালিমা বুকে ধারণ করেছে, এর দাবী মেনে নিয়েছে, তারা আপাদমস্তকে পাশ্চাত্য সাজলেও উন্নতির লাগাম খুঁজে পাবে না। হ্যাঁ, তথাকথিত সেই উন্নতির জোয়ারে ভাসার সুযোগ মুসলমানেরও আছে। শর্ত হলো, প্রথমে ইসলামের নাম তার ভিতর থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে হবে আমি মুসলমান নই। তারপর পাশ্চাত্য সাজে সাজতে হবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা হয়ত তাকেও সেই তথাকথিত জাগতিক উন্নতি দান করবেন। তবে এ পথ প্রকৃত মুসলমানের পথ নয়। বরং প্রকৃত মুসলমানের সব ধরনের উন্নতি ও সফলতার পথ একটাই। তাহলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাতের অনুসরণ। অন্য কোনো পথে কোনো উন্নতি সে খুঁজে পাবে না।

আর নয় সুন্নাত নিয়ে উপহাস

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ـ اَمَّا بَعْدُ!

عَنْ اَبِىْ اَيَاسٍ سَلَمَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا اَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهٖ فَقَالَ كُلْ بِيَمِيْنِكَ , قَالَ , لَا اَسْتَطِيْعُ, قَالَ , لَا اسْتَطَعْتَ , مَا مَنَعَهُ اِلَّا الْكِبْرُ, فَمَا رَفَعَهُ اِلٰى فِيْهِ ـ (صحيح مسلم , كتاب الاشربة , باب اداب الطعام)

হামদ ও সালাতের পর।

হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়া (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক লোক রাসূল (সা.) এর সামনে বাম হাতে খাবার খাচ্ছিলো। সে যুগে আরবের অধিকাংশ লোক বাম হাতে খাবার খেতো। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন লোকটিকে বাম হাতে খেতে দেখলেন, তিনি তাকে সতর্ক করতে গিয়ে বললেন, ডান হাতে খাও। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ সতর্ক এজন্য করেছেন, কারণ তিনি আমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে জীবনপদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন, সেখানে বামের তুলনায় ডানের ফযিলত রয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক প্রদর্শিত শিষ্টাচার কেউ গ্রহণ করুক কিংবা না করুক, কারো যুক্তির অনুকূলে হোক কিংবা না হোক এতে

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর কিছু যায় আসে না। যাক, রাসূল (সা.) এর নির্দেশ শুনে লোকটি উত্তর দিলো, আমি ডান হাতে খেতে পারি না। মূলত সে অহংকারবশত এ উত্তর দিয়েছিলো। সে ভেবেছিলো, এর দ্বারা রাসূল (সা.) আমাকে অপমানিত করেছেন। তাই আমি তাঁর এ নির্দেশ মানবো না। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ভবিষ্যতে তুমি কখনও ডান হাতে খেতে পারবে না। তারপর থেকে বাকী জীবন সে ডান হাত মুখ পর্যন্ত ওঠাতে পারে নি।

হায় যদি সাহাবা যুগে আসতাম

আলোচ্য হাদীসে আমাদের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সবক রয়েছে। প্রথমত, অনেক সময় অজ্ঞতার কারণে আমাদের অন্তরে ভাবনা জাগে, আমরা যদি রাসূল (সা.) এর যুগে আসতাম, তাহলে কত ভালো হতো। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.) এর সান্নিধ্য পেয়েছেন বিধায় সফলকাম হয়েছেন। তাঁরা রাসূল (সা.) কে প্রাণভরে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। যদি আমাদেরও এ সৌভাগ্য জুটতো এবং আমরা সাহাবাদের তালিকায় স্থান পেতাম, কতইনা ভালো হতো! তাই কখনও কখনও মনে একটি অনুযোগ জেগে ওঠে যে,আল্লাহ আমাদেরকে কেন সাহাবা যুগে সৃষ্টি করেন নি। আজ দেড় হাজার বছর পর দ্বীনের ওপর চলা কত কঠিন। সমাজ ও পরিবেশ আজ অবক্ষয়ের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে। আহ, যদি সে যুগে হতাম, যখন সবকিছু কত অনুকূলে ছিলো।

আল্লাহ পাত্র অনুসারে দান করে থাকেন

উক্ত আকাঙ্খা আমাদের অন্তরে তো সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমরা একথা ভেবে দেখি না যে, আল্লাহ যাকে সৌভাগ্য দান করেন, সে তার যোগ্য পাত্রও হয়ে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সান্নিধ্য অর্জনের যোগ্য পাত্র ছিলেন। তাই তাঁরা তা পেয়েছেন এবং এর যথাযথ হকও আদায় করেছেন। সে যুগটি নিঃসন্দেহে সোনালী যুগ ছিলো। কিন্তু স্পর্শকাতরও ছিলো।

বর্তমানে আমাদের নিকট রাসূল (সা.) নেই। তবে তাঁর হাদীস আছে, যা মাধ্যম পরম্পরায় আমাদের পর্যন্ত এসেছে। ওলামায়ে কেরাম এজন্য বলেন, যে ব্যক্তি খবরে ওয়াহেদ দ্বারা প্রমাণিত কথাকে অস্বীকার করে বলে যে, এটা আমি জানি না, সে ব্যক্তি বড় গুনাহগার হবে, তবে কাফের কিংবা মুনাফেক হবে না। অথচ সেই যুগে যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কোনো কথা তাঁর পবিত্র যবান থেকে সরাসরি শুনে তা অস্বীকার করতো, তাহলে সে কাফের হয়ে যেতো। সাহাবায়ে কেরাম কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁদের যোগ্যতা ছিলো বলেই তাঁরা সব পরীক্ষায় উতরে ওঠেছেন। আল্লাহ ভালো জানেন,

তাদের জায়গায় আমরা হলে আমরা কোন্ দলে যোগ দিতাম। সেই যুগে, সেই পরিবেশে যেমনিভাবে জন্মেছিলেন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.), হযরত ফারুকে আ'যম (রা.), হযরত উসমান গনী (রা.) ও হযরত আলী (রা.) প্রমুখ, তেমনিভাবে জন্ম নিয়েছিলো আবু জাহল, আবুলাহাব, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও অন্যান্য মুনাফেকের গোষ্ঠি। কাজেই আল্লাহ্ যার ভাগ্যে যা রেখেছেন, সেটাই তার জন্য মঙ্গলজনক। অতএব, এ কামনা করা যে, হায় যদি সাহাবা যুগে জন্ম নিতাম, বোকামি বৈ-কিছু নয়। এটা মূলত আল্লাহর হেকমতের ব্যাপারে আপত্তি করা। আল্লাহ যাকে যে পরিমাণ নেয়ামত দান করেন, তার যোগ্যতা অনুসারেই দান করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকটিকে বদদুআ করলেন কেন?

প্রশ্ন হতে পারে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন রাহমাতুল্লিল 'আলামীন। নিজের জন্য কখনও তিনি প্রতিশোধ নেন নি। সর্বদা মানুষের মঙ্গল কামনা করেছেন। কারো জন্য বদদু'আ করার স্বভাব তাঁর ছিলো না। সুতরাং এ লোকটি থেকে যখন একটা ঘটনা ঘটে গেলো, সে বলে ফেললো– আমি ডান হাতে খেতে পারি না, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) সঙ্গে সঙ্গে এ বদদু'আ কেন করলেন যে, তুমি আর কখনও ডান হাতে খেতে পারবে না?

উলামায়ে কেরাম বলেন, মূলত লোকটি মিথ্যা বলেছিলো অহংকারের বশবর্তী হয়ে। আসলে সে ডান হাতে খেতে পারতো। আর এভাবে অহংকারবশত মিথ্যা বলে রাসূল (সা.) এর নির্দেশ অস্বীকার করা আল্লাহ তাআলার নিকট জঘন্য অপরাধ। এর পরিণাম হলো জাহান্নাম। কিন্তু রাসূল (সা.) লোকটির ওপর অনুগ্রহ করে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বদদু'আ করলেন, যেন সে অপরাধের শাস্তি এ জগতেই পেয়ে যায় এবং জাহান্নামের মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। অপরদিকে নেক আমল করারও সুযোগ তার জন্য যেন হয়ে যায়।

বুযুর্গদের বিভিন্ন অবস্থা

কোনো কোনো বুযুর্গ সম্পর্কে কথিত আছে, তাদেরকে কেউ কষ্ট দিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধ নিয়ে নিতেন। এটা মূলত তার প্রতি অনুগ্রহবশতই করতেন। অন্যথায় তার ওপর কঠিন শাস্তি আসার আশঙ্কা থেকে যায়।

একলোক এক বুযুর্গের মুরিদ হলো। তখন সে বুযুর্গকে বললো, হুযুর, আমরা শুনেছি, আল্লাহওয়ালাদের স্বভাব বিভিন্ন ধরনের হয়, তাঁদের অবস্থাও ভিন্ন হয়। আমি বিষয়টি স্বচক্ষে দেখতে চাই। বুযুর্গ বললেন, তুমি আপন কাজ করে যাও। এসবের পেছনে পড়ো না। বুযুর্গদের অবস্থা তুমি বুঝবে কীভাবে?

মুরিদ বললো, হুযুর! আপনার কথা যদিও ঠিক, তবু আমার যে মন চায়! বুযুর্গ উত্তর দিলেন, ঠিক আছে, তুমি যদি এতই আগ্রহী হও, তাহলে একটা কাজ কর– অমুক মসজিদে চলে যাও। সেখানে দেখতে পাবে, তিন বুযুর্গ যিকিরে মশগুল। তুমি গিয়ে তিনজনের প্রত্যেকের কোমরে একটা করে ঘুষি মারবে। তারপর তারা যা করেন, এসে জানাবে। লোকটি ওই মসজিদে চলে গেলো। নিজ শায়খের নির্দেশমতে সে পেছন থেকে এক বুযুর্গের কোমরে ঘুষি মারলো। তখন যিকিরে মগ্ন বুযুর্গ ফিরেও দেখলেন না যে, কে ঘুষি মারলো! বরং তিনি যিকিরেই মগ্ন থাকলেন। তারপর দ্বিতীয় বুযুর্গকে ঘুষি মারলো। তখন তিনি পেছনে ফেরলেন এবং লোকটির পিঠ বুলাতে লাগলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! আপনি ব্যথা পাননি তো? আপনার কষ্ট হয় নি তো? এরপর লোকটি তৃতীয় বুযুর্গের পেছনে দাঁড়ালো এবং এক ঘুষি বসিয়ে দিলো। তখন এ বুযুর্গ ঠিক ততটুকু জোরে ঘুষি দিয়ে আবার যিকিরে মশগুল হয়ে গেলেন।

লোকটি তার শায়খের কাছে উক্ত ঘটনার বিবরণ দিলো যে, হুযুর! প্রথম বুযুর্গকে ঘুষি মারার পর তিনি একটু পেছনে ফিরেও দেখলেন না। দ্বিতীয় বুযুর্গকে ঘুষি মারার পর তিনি প্রতিশোধ তো নিলেনই না, বরং আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। আর তৃতীয় বুযুর্গকে ঘুষি মারার পর তিনি আমার থেকে প্রতিশোধ নিলেন– আমাকে একটি ঘুষি মেরে দিলেন। তখন শায়খ বললেন, তুমি বুযুর্গদের বিভিন্ন অবস্থা জানতে চেয়েছিলে, তা তুমি নিজেই দেখলে। প্রথম অবস্থা যা প্রথম বুযুর্গের মধ্যে ছিলো, তিনি ভেবেছিলেন, আমি আল্লাহর যিকিরে মগ্ন, যিকিরের স্বাদ পাচ্ছি। তা ছেড়ে পেছনের দিকে দেখতে যাবো কেন যে, কে ঘুষি মারলো? অযথা সময় নষ্ট করবো কেন? দ্বিতীয় বুযুর্গের অবস্থা হলো, সৃষ্টিজীবের প্রতি তার দয়া ও ভালোবাসা ছিলো প্রবল। তাই তিনি প্রতিশোধ নেন নি, বরং তোমাকে সান্ত্বনা দান করলেন। তৃতীয় বুযুর্গের অবস্থা ছিলো, তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধ নিয়ে নিলেন, যেন এ বেয়াদবির কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার ওপর কোনো শাস্তি না আসে এবং তুমি আখেরাতের শাস্তি থেকে রক্ষা পাও।

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ (সা.) উপরোক্ত লোকটিকে বদদু'আ করলেন, যেন আখেরাতের কঠিন শাস্তি থেকে সে বেঁচে যায়।

উত্তম কাজ ডান দিক থেকে শুরু করবে

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতকে অবহেলা করা উচিত নয়। অথচ বর্তমানে লোকেরা সুন্নাত অবহেলা করে বলে, ডান হাতে খেতে হবে, বাম হাতে খাওয়া যাবে না–এমন ছোট-খাটো বিষয়ের মাঝে এমন কী আছে?

মনে রাখবেন, সুন্নাত সুন্নাতই, কোনো সুন্নাতই ছোট নয়, যদিও দৃশ্যত ছোট মনে হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতিটি নির্দেশ, প্রতিটি সুন্নাত প্রতিটি আমল এ উম্মতের জন্য আদর্শ। আর প্রত্যেক ভালো কাজে ডান দিককে প্রাধান্য দেয়ার নির্দেশও তাঁরই। এটা তিনি পছন্দ করতেন। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِيْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهٖ وَطُهُوْرِهٖ فِيْ شَانِهٖ كُلِّهٖ- (صحيح البخارى ، كتاب الوضوء)

'রাসূলুল্লাহ (সা.) ডানদিক ভালোবাসতেন। এমনকি জুতা পরিধান, মাথা আঁচড়ানো ও পবিত্রতা অর্জনের বেলায়ও। প্রতিটি কাজ তিনি ডানদিক থেকে শুরু করাকে পছন্দ করতেন।'

একসঙ্গে দু'টি সুন্নাতের ওপর আমল

উত্তম কাজে ডানদিক প্রাধান্য দেয়া– দৃশ্যত একটি মামুলি সুন্নাত। অথচ এসব সাধারণ সুন্নাতের কারণেই মানুষ আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে পারে। ছোট ছোট সুন্নাতেও আল্লাহ বিশাল সাওয়াব রেখে দিয়েছেন। এখন মানুষ যদি এই ছোট ছোট সুন্নাত ছেড়ে দেয়, তাহলে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে। এমন কি বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, এখানে একই সঙ্গে রয়েছে দু'টি সুন্নাত। মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা দিয়ে বের হয়ে জুতার ওপর পা রাখবে, তারপর ডান পা বের করবে। এটি একটি সুন্নাত। আর দ্বিতীয় সুন্নাত হলো, প্রথমে ডান পায়ের জুতা পরিধান করবে, তারপর বাম পায়ের জুতা পরিধান করবে।

প্রতিটি সুন্নাতই মহান

রাসূল (সা.) এর ছোট-বড় সুন্নাতের কোনো পার্থক্য সাহাবাগণ করতেন না। বরং প্রতিটি সুন্নাতকে সমান চোখে দেখতেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আমল করতেন। আসলে একটু গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টিকে গ্রহণ করলে বিনিময়ে নেকীর বিশাল ভাণ্ডার আমলনামায় জমা হয়ে যায়। তাই সুন্নাতগুলোর ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া উচিত।

পশ্চিমা সভ্যতার সবকিছুই উল্টো

হযরত কারী তৈয়্যব সাহেব (রহ.) বলতেন, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা আগেকার পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত। আগে বাতির নিচে অন্ধকার থাকতো। এখন অন্ধকার থাকে বাতির উপরে। বর্তমানের পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের ইসলামী সভ্যতাকে কৌশলে পরিবর্তন করে দিতে চাচ্ছে। যেমন– খাওয়ার ব্যাপারে বর্তমানে পাশ্চাত্যের নিয়ম হলো, কাটা চামচ ডান হাত দিয়ে ধরে বাম হাতে খাওয়া।

বছর কয়েক আগের কথা। আমি বিমানে সফর করছিলাম। আমার পাশের সিটে যে লোকটি বসা ছিলো, তার সঙ্গে মোটামুটি খোলামেলা আলাপ করছিলাম। ইতোমধ্যে খাবার এলো। লোকটি অভ্যাসমত ডান হাতে কাটা চামচ নিলো এবং বাম হাতে খেতে শুরু করলো। আমি বললাম, দুঃখের বিষয়, বর্তমানে আমরা প্রতিটি কাজে ইংরেজদের অনুকরণ করি। রাসূল (সা.) এর সুন্নাত তো হলো ডান হাতে খাওয়া। আপনি যদি ডান হাতে খেতেন, সাওয়াবও পেতেন। আমার কথায় ভদ্রলোক চট করে উত্তর দিলো, আমরা এজন্যই পেছনে পড়ে আছি এবং এখনও এসব খুটিনাটি বিষয়ের পেছনে লেগে রয়েছি। মোল্লারা আমাদেরকে এগুলোর পেছনে লাগিয়ে রেখেছে এবং উন্নতির পথ বন্ধ করে রেখেছে। যার কারণে বড় বড় কাজেও আমরা আজ পেছনে পড়ে আছি।

তাহলে পশ্চিমা বিশ্ব উন্নতির সোপান জয় করছে কীভাবে?

আমি তাকে বললাম, 'মাশাআল্লাহ' আপনি তো অনেক দিন থেকে এই উন্নত পন্থায় খাচ্ছেন– তাই না? আচ্ছা বলুন তো, আপনার উন্নতি কতটুকু হয়েছে? কতদূর আপনি এগুতে পেরেছেন? কত লোকের ওপর আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব অর্জন করেছেন। আমার এসব শ্লেষমাখা কথা শুনে ভদ্রলোক একেবারে চুপসে গেলো। তখন তাকে আমি বললাম, মুসলমানদের উন্নতি ও আভিজাত্য একটিমাত্র পথেই নিহিত। তাহলো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাত। এ ছাড়া অন্য কোনো পথে মুসলমানরা উন্নতি করতে পারবে না।

তখন সে বলে ওঠলো, আপনি তো আজব কথা বলছেন যে, উন্নতির পথ শুধু সুন্নাতের ওপর আমল করা। অথচ পাশ্চাত্য-বিশ্ব আজ কত উন্নত। কিন্তু তারা খাবার খায় বাম হাতে। সব কাজ তারা সুন্নাতের বিপরীতে করে। পাপের কাজ করে, মদ খায়, জুয়া খেলে, তবুও তারা উন্নতি করে যাচ্ছে। এমনকি গোটা বিশ্বের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। সুতরাং আপনি যে বললেন, উন্নতির পথ একটাই– সুন্নাতের ওপর আমল করা, আপনার কথাটির সঙ্গে

বাস্তবতার কোনোই মিল নেই। আমরা তো দেখছি, সুন্নাতের বিপরীতে চললেই উন্নতি সাধিত হয়।

এক অতিচালাকের কাহিনী

আমি বললাম, আপনার দাবি হল, পাশ্চাত্য-জাতি নবীজী (সা.) এর সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে উন্নতির স্বর্ণশিখরে পৌঁছে যাচ্ছে। তাদের উন্নতির সাতকাহনটা একটু শুনুন। এই বলে আমি তাকে একটি ঘটনাটি শুনালাম–

এক গ্রাম্যলোকের ঘটনা। একবার সে খেজুর গাছে চড়ল। চড়ার পদ্ধতিটা তার জানা ছিল। কিন্তু নামার পদ্ধতিটা তার অজানা। এখন নামবে কীভাবে? তাই সে চিৎকার করে গ্রামের সবাইকে জড়ো করলো। সে বললো, যেভাবে হোক, তোমরা আমাকে এখান থেকে নামাও। তাই গ্রামের লোকজন পরামর্শ করলে– কীভাবে একে নামানো যায়? কারো মাথায় কোনো বুদ্ধি এলো না।

সে যুগে গ্রামে এক অতিচালাকের কথা প্রসিদ্ধ ছিলো। সব গ্রামেই অতি চালাক (?) দু-একজন থাকতো। গ্রামের লোকেরা সেই অতিচালাকের শরণাপন্ন হলো। সমস্যার আদি-অন্ত তাকে জানানো হলো। সব শুনে সে পরামর্শ দিলো, আরে... এটা তো তেমন কঠিন ব্যাপারই নয়। তোমরা এক কাজ কর– একটি দড়ি নাও। তারপর দড়িটি গাছের আগায় নিক্ষেপ কর। আর গাছের লোকটিকে বললো, তুমি দড়িটি কোমরে বেঁধে শক্ত করে ধরে রাখবে। অতিচালাকের বুদ্ধিমত অবশেষে তাই করা হল। এরপর সে বললো, যারা নিচে আছ, সবাই রশিটি ধর এবং খুব জোরে টান মার। তারপর যখন টান মারা হলো, সঙ্গে সঙ্গে লোকটি গাছের উপর থেকে নিচে পড়ে গেলো এবং মারা গেলো। এবার লোকজন অতিচালাককে ধরলো এবং বললো, এটা আপনি কেমন বুদ্ধি দিলেন? এখন তো বেচারা মারাই গেলো! সে আমতা আমতা করে বললো, জানি না, এমন কেন হলো? সম্ভবত তার তাকদীরে এটাই লেখা ছিলো, এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমি তো কত মানুষকে কূপ থেকে উঠিয়েছি, তার কোনো হিসাব নেই।

মুসলমানদের উন্নতির পথ একটাই

কথায় আছে, অতিচালাকের গলায় ফাঁসি। এর বেলায়ও ঠিক সেটাই হলো। সে কূপের ভেতর নিমজ্জিত ব্যক্তিকে যেভাবে উঠানো হয়, সেই কৌশলটা গাছের মাথায় চড়া ব্যক্তির ওপর প্রয়োগ করে বসলো। বর্তমানে সেই একই বুদ্ধি মুসলিম উম্মাহর বেলায়ও প্রয়োগ করার কসরত করা হচ্ছে। এটা বুদ্ধিমত্তা নয়– বোকামি। মনে রাখবেন, মুসলমানদের উন্নতির রোডম্যাপ এবং কাফেরদের উন্নতির রোডম্যাপ এক নয়। তারা অনাচার ও পাপাচারের মাধ্যমে

উন্নতি লাভ করতে পারে। কিন্তু মুসলিম জাতি এর মাধ্যমে কিছুতেই উন্নতি লাভ করতে পারে না।

যারা লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ পাঠ করেছে, এ কালিমার দাবি মেনে নিয়েছে, তারা আপাদমস্তক পাশ্চাত্য সাজলেও উন্নতির লাগাম খুঁজে পাবে না। তবে হ্যাঁ, তথাকথিত সেই উন্নতি (?) পাওয়ার সুযোগ মুসলমাননেরও আছে। শর্ত হলো, তাকে মুসলিম দাবি পরিত্যাগ করতে হবে। ইসলামের নাম তার শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে হবে, আমি মুসলমান নই। তারপর পাশ্চাত্য সাজে সাজতে হবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকেও সেই তথাকথিত জাগতিক উন্নতি হয়ত দিবেন। তবে প্রকৃত মুসলমানের পথ এটা নয়। দুনিয়াতে মুসলমানদের নিখাঁদ উন্নতির যদি কোনো পথ থাকে, সেটি রাসূল (সা.) এর সুন্নাত অনুসরণ করার মধ্যেই রয়েছে। অন্য কোনো পথে মুসলমানদের উন্নতি নেই।

বিশ্বনবী (সা.) এর গোলামি মাথা পেতে বরণ করে নাও

আসলে আমাদের মন-মস্তিষ্ক ঘোলাটে হয়ে গেছে। পশ্চিমাদের জীবনাচার আমাদের কাছে রঙ্গিন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। নবী করীম (সা.) এর সুন্নাতের মূল্য আজ আমাদের কাছে নেই। বরং একে মনে করি উন্নতির পথে অন্তরায়। আল্লাহর ওয়াস্তে মন-মস্তিস্ক স্বচ্ছ করুন। একটু চিন্তা করুন, যদি তুমি ডান হাতে খাও, তাহলে তোমার উন্নতির পথে এমন কী অন্তরায় সৃষ্টি হবে?

আসলে স্বচ্ছ চিন্তা আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে গেছে। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর গোলামি ছেড়ে, বিধর্মীদের পদলেহনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। ফলে আমাদের জীবন-মরণ সবটাই অপরের গোলামির শৃংখলে আবদ্ধ। এই শৃংখল ভাঙ্গতে চাইলেও পেরে উঠছি না। এ থেকে উত্তরণের কোনো পথও খুঁজছি না। বস্তুত আমরা ততদিন পর্যন্ত তাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবো না এবং পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো না, যতদিন না সত্যিকার অর্থেই আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দাসত্ব স্বীকার করবো এবং তাঁর পদাংক অনুসরণ করবো।

সুন্নাত নিয়ে বিদ্রূপের পরিণাম খুবই ভয়াবহ

এটা অবশ্যই জেনে রাখতে হবে যে, ডান হাতে খাওয়া, পোশাক পরিধানে ডানের গুরুত্ব দেয়া ইত্যাদির মাঝেই সুন্নাত সীমাবদ্ধ নয়। বরং সুন্নাত আরো ব্যাপক। জীবনের সব ক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুশীলন প্রয়োজন। নবীজী (সা.) এর চরিত্রমাধুরীও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। তিনি কীভাবে লেনদেন করতেন, কীভাবে মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত করতেন, কীভাবে কষ্ট-বেদনা সয়ে যেতেন এ সবই

সুন্নাতের অংশ। আল্লাহর রাসূলের কোনো সুন্নাতই ক্ষুদ্র নয়, অবজ্ঞার বস্তুও নয়। মনে করুন, সুন্নাতের ওপর আমল করা কারো দ্বারা হচ্ছে না। কিন্তু এজন্য এ নিয়ে সে ঠাট্টা করতে পারবে না, একে অবজ্ঞার চোখে দেখা কিংবা অস্বীকার করা যাবে না। এসব কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কাফেরে পরিণত হওয়ারও আশঙ্কা আছে। কাজেই ছোট ছোট সুন্নাত নিয়েও ঠাট্টা করা যাবে না। 'আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানকে এ থেকে হেফাজত করুন, আমীন।

প্রিয় নবী (সা.) এর শিক্ষা এবং তা গ্রহণকারীর দৃষ্টান্ত

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَصَابَ اَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ ـ الخ (صحيح البخارى، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم)

'হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমাকে যে হিদায়াত ও ইলমসহ প্রেরণ করা হয়েছে, এর উদাহরণ ওই বৃষ্টির মত, যা এমন ভূমির ওপর বর্ষিত হল, যার তিন ধরনের অংশ ছিলো–

প্রথম অংশ ছিলো খুব উর্বর– পানি গ্রহণের উপযোগী। তাই সেখানে অনেক তৃণলতা ও শস্য জন্মালো।

দ্বিতীয় অংশ ছিলো অনুর্বর– পানি গ্রহণের অনুপযোগী। তাই উপরিভাগে পানি আটকে জলাশয়ের সৃষ্টি হলো। লোকেরা এবং জীবজন্তু এ থেকে উপকৃত হলো। তারা পান করলো, ক্ষেতে সিঞ্চন করলো এবং আবাদ করলো।

তৃতীয় অংশ ছিলো এত কঠিন, যা পানি গ্রহণে সক্ষম নয় এবং পানি ধারণেও সক্ষম নয়। তাই তাতে তৃণলতা ও শস্য জন্মালো না। লোকেরাও এ থেকে উপকৃত হতে পারলো না। বরং বৃষ্টির পানিগুলো শুধুই গড়িয়ে গেলো।

তিন শ্রেণীর মানুষ

তারপর তিনি বলেছেন, আমি যে হিদায়াত ও শিক্ষাসহ এসেছি, তার দৃষ্টান্তও এই বৃষ্টির পানির মত। এ হিদায়াত ও শিক্ষা যাদের কাছে পৌঁছেছে, তারাও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণী হলো, তারা আমার আনীত হিদায়াত ও শিক্ষামালা নিজেরা গ্রহণ করে উপকৃত হয়েছে। ফলে তাদের আমল ও চরিত্র শুদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবং মানুষের জন্য তারা উত্তম আদর্শ বনে গিয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণী হলো, যারা নিজেরা আমার শিক্ষামালা গ্রহণ করেছে এবং অন্যদেরও এর দ্বারা উপকৃত করেছে। নিজেরা শিখেছে এবং অপরকেও শিখিয়েছে। দরস-তাদরীস, ওয়ায-নসীহত, দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণী হলো, যারা আমার শিক্ষামালার দিকে মাথা তুলেও তাকালো না বরং এক কান দিয়ে ঢুকিয়েছে অপর কান দিয়ে বের করে দিয়েছে। আমাকে যে হিদায়াতসহ প্রেরণ করা হয়েছে, তারা তা গ্রহণ করলো না এবং অন্যকেও এর দ্বারা উপকৃত করলো না।

উক্ত হাদীসের মাধ্যমে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষামালা থেকে নিজে উপকৃত হতে এবং এর দ্বারা অপরকেও উপকৃত করতে হবে। অথবা কমপক্ষে নিজে উপকৃত হতে হবে। এছাড়া তৃতীয় কোনো পথ নেই। তৃতীয় পথটি হলো, ধ্বংসের পথ, পতনের পথ। এ কথাটিই অপর এক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে–

كُنْ عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا وَلَا تَكُنْ ثَالِثًا فَتَهْلِكَ۔

'দ্বীনের আলেম হও যে, নিজেও অ'মল করবে, অপরকেও দাওয়াত দিবে অথবা দ্বীনের ইলম শিক্ষা কর। এছাড়া তৃতীয়টা গ্রহণ করো না, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

অপরকেও দ্বীনের দাওয়াত দিবে

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষামালাও সুন্নাতসমূহের ব্যাপারে মুসলমানদের মূল দায়িত্ব হলো, নিজেও আমল করবে এবং অপরের কাছেও তা পৌঁছাবে। অপরের কাছে না পৌঁছিয়ে শুধু নিজে আমল করলে দ্বীন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বরং নিজের আমলকৃত বিষয়গুলোর ওপরও ঝড় আসার আশঙ্কা রয়েছে।

অশোভনীয় পরিবেশের জোরালো ধাক্কায় নিজের পা ফসকে যাওয়ার সম্ভাবনাও তখন তীব্র হয়ে দেখা দিবে। যেমন কোনো ব্যক্তি ধর্ম-কর্ম নিজে খুব পালন করে। নিজে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। কিন্তু তার ঘরের লোকেরা ধর্ম-কর্মের ধার ধারে না। এর অশুভ ফল এটা হয় যে, একসময় নিজেও বিচ্যুত হয়ে যায় এবং দ্বীনের ওপর অটল থাকা তার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই নিজে যেমনিভাবে দ্বীনের ওপর চলা জরুরি, অনুরূপভাবে ঘরওয়ালাদের ওপরও মেহনত করা কর্তব্য। তাদেরকেও ভালোবাসা, স্নেহ ও দরদ দিয়ে বোঝাতে হবে এবং দ্বীনের পথে আনার অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য ঘণিষ্ঠজনকে নিয়েও ভাবতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ - (ابوداود، کتاب الادب ، باب فی النصیحة)

'এক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্য আয়নার মতো।'

অর্থাৎ যদি কোনো মুসলমান থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো ভুল হয়ে যায়, তখন তাকে আন্তরিকতার সঙ্গে তার ভুলের জন্য সতর্ক করা তার কর্তব্য। তার মনোকষ্ট হয়–এমন কোনো পথ অবলম্বন করা যাবে না। অনেকে অভিযোগের সঙ্গে বলে যে, করতে তো কম করি না, কিন্তু কাজে আসে না। জেনে রাখুন, কাজ তো হলো শুধু আপন কর্তব্য পালন করা, ফল হওয়া না হওয়া তাদের দায়িত্ব নয়। নূহ (আ.) সাড়ে নয়শ' বছর দাওয়াতের কাজ করেছেন, অথচ মুসলমান হয়েছিলো মাত্র উনিশজন। তবুও তিনি নিজ কর্তব্য থেকে সরে দাঁড়ান নি।

দাওয়াত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না

একজন দা'ঈ বা মুবাল্লিগের কাজ হলো, সে নিরাশ হবে না। সর্বদা দাওয়াত দিতে থাকবে। এমন কথা মনেও আনা যাবে না যে, আমার কথায় যেহেতু কাজ হয় না তাই দাওয়াত দিয়ে কী ফায়দা? বরং সময়-সুযোগ পেলেই দাওয়াত দিতে হবে। মনে রাখবেন, একদিন না একদিন অবশ্যই কাজ হবে। ফলাফলও প্রকাশ পাবে। কারো কারো ব্যাপারে এটা মেনেও নেয়া হয় যে, তার ভাগ্যে হিদায়াত নেই। যেমন নূহ (আ.) এর ছেলের হিদায়াত নসীব হয়নি। তথাপি দাওয়াত দিতে থাকলে দাওয়াত বিফলে যাবে না। এর জন্য সাওয়াব অবশ্যই পাবে।

নিজেও সুন্নাতের আমলের ওপর অবিচল থাকার চেষ্টা করতে হবে। এ ব্যাপারে অলসতা কিংবা উদাসীনতা দেখা দিলে ইসতেগফার করতে থাকবে। সারা জীবন এভাবে চলতে পারলে 'ইনশা'আল্লাহ' বেড়া পার হতে পারবে। হ্যাঁ, অলসতা কিংবা উদাসীনতা অবশ্যই খারাপ বিষয়। 'আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ থেকে নিরাপদে রাখুন এবং প্রিয়নবী (সা.) এর সুন্নাতগুলোর ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

তাকদীর : একটি নিরাপদ ঠিকানা

"যে-কোনো মানুষের জন্য তাকদীরকে মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। কারণ, আপনার কাছে অপ্রীতিকর মনে হলেও যা ঘটার তা ঘটবেই। সুতরাং অযথা হা-পিত্যেস করলে দুঃশ্চিন্তা বাড়বে বৈ কমবে না। এজন্যই বলি, তাকদীরের ফয়সালা মেনে নেয়ার মাঝেই রয়েছে শান্তি, স্বস্তি ও আত্মতৃপ্তি। বিশ্বাসী বান্দার জন্য এটি এক প্রকার নিরাপদ ঠিকানা। আসলে এক বিস্ময়কর আকীদার নাম— তাকদীর। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিজন বিশ্বাসী বান্দার জন্য এক অনন্য উপহার এটা। কিন্তু একে সঠিকভাবে না বোঝার কারণে মানুষ নানারকম বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়।"

তাকদীর : একটি নিরাপদ ঠিকানা

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًاكَثِيْرًا ـ اَمَّابَعْدُ!

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِحْرَصْ عَلٰى مَايَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَاتَعْجِزْ وَاِنْ اَصَابَكَ شَيْئٌ فَلَاتَقُلْ لَوْاَنِّىْ فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا كَذَا, وَلٰكِنْ قُلْ, قَدَّرَاللّٰهُ وَمَا شَآءَ فَعَلَ , فَاِنَّ "لَوْ" تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ـ (مسلم شريف, كتاب القدر, باب في الامربالقوة وترك العجز)

হামদ ও সালাতের পর!

সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে কাজ তোমার উপকারে আসবে, সে কাজের লোভ কর। অর্থাৎ- যে কাজকর্ম তোমার পরকালীন জীবনে কাজে লাগবে, তার লোভ কর।

বস্তুত লোভ একটি নিন্দনীয় স্বভাব। লোভ নিষিদ্ধ। মান-সম্মান, অর্থ-প্রতিপত্তি কামনা ও লোভ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। সবর করবে,

অল্পেতুষ্টির গুণ অর্জন করবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে যতটুকু পাবে, তার উপরই সবর করবে। যখন যা মিলে, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। এটাই ইসলামের নির্দেশ। এর চেয়ে বেশি পাওয়ার লোভ করা নাজায়েয। সুতরাং লোভ থেকে বেঁচে থাকবে। আসলে দুনিয়ার জীবন একটি অসম্পূর্ণ গল্পের মতো। প্রবাদ আছে–

کار دنیا کسے تمام نہ کرد

দুনিয়ার কাজ কেউই পূর্ণ করতে পারেনি। আংশিক সাফল্যে কেউ হয়ত আনন্দিত হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সফলতা কারো ভাগ্যে জুটেনি। মনের কোনো না কোনো ইচ্ছা সকলেরই অপূর্ণ থেকে গেছে। রাজা-বাদশাহ সকলের বেলায় এই একই কথা।

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, বনী আদম যদি একটি স্বর্ণউপত্যকা হাতে পায়, তবুও সে কামনা করবে আরেকটি স্বর্ণউপত্যকার জন্য। দ্বিতীয়টি পেয়ে আশা করবে তৃতীয়টি পাওয়ার। বনি-আদমের পেট কবরের মাটি ছাড়া অন্য কোনো কিছু দ্বারা পূর্ণ করা যায় না। দুনিয়ার কোনো বস্তু তার পেট ভর্তি করতে পারে না। তবে দুনিয়াতেও একটা বস্তু আছে, যা তার পেট পূর্ণ করতে পারে। তাহলো অল্পেতুষ্টি। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা এবং শোকর আদায় করা। এ ছাড়া পেট পূর্ণ করার দ্বিতীয় কোনো বস্তু নেই।

দ্বীনের প্রতি লোভ নিন্দনীয় নয়

পার্থিব বিষয়ে লোভ করা ভালো নয়। এ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় কাজে, নেক আমলে ও ইবাদতের প্রতি লোভ করা যাবে। ধর্মীয় কাজে ব্যস্ত কাউকে দেখলে তার মত হওয়ার কামনা করা যাবে। এইজন্যই হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, পরকালীন জীবনে উপকারে আসবে এমন কাজের প্রতি লোভী হও। কুরআন মজীদেও আল্লাহ বলেছেন–

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔

সৎকাজে প্রতিযোগিতা কর।

সাহাবায়ে কেরামের নেক কাজের প্রতি স্পৃহা

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর নিকট যে আমলটি বেশি প্রিয় ছিল, সেই আমলটি করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম উদগ্রীব থাকতেন তাঁরা। চেষ্টা করতেন

যেন তাঁদের হৃদয়ে সবসময় আখেরাতের কাজের প্রতি লোভ ও স্পৃহা জাগরুক থাকে। তাঁদের একান্ত কামনা ছিলো একটাই- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-কে রাজি-খুশি করা এবং আখেরাতের জীবনকে সমৃদ্ধ করা।

হযরত উমর (রা.) এর ছেলের নাম ছিলো আবদুল্লাহ (রা.)। তিনিও সাহাবী ছিলেন। একবারের ঘটনা। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর সামনে একটি হাদীস পড়লেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের জানাযায় শরিক হবে, সে এক কিরাত সাওয়াবের অধিকারী হবে। যে ব্যক্তি জানাযার নামাযের পর জানাযার পেছনে পেছনে যাবে, সে দুই কিরাত সাওয়াব লাভ করবে। আর যে দাফনেও অংশগ্রহণ করবে, সে তিন কিরাত সাওয়াব পাবে। অন্য এক হাদীসে এসেছে, এক কিরাত উহুদ-পাহাড়ের চেয়েও পরিমাণে বেশি। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর মুখে হাদীসটি যখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) শুনলেন, তিনি আফসোস করে উঠলেন যে, হায়! ইতোপূর্বে আমি হাদীসটি শুনিনি। আমার তো অনেক কিরাত সাওয়াব ছুটে গেছে। অর্থাৎ আমার জানা ছিলো না, জানাযার নামাযে শরিক হলে, জানাযার পেছনে পেছনে গেলে এবং দাফনে অংশগ্রহণ করলে এত বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়। আমার জানা না থাকার কারণে বহু কিরাত সাওয়াব থেকে আমি বঞ্চিত হয়ে গিয়েছি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ছিলেন একজন সাহাবী। তাই তাঁর জীবনের একমাত্র কর্মসূচি ছিলো সুন্নাতের উপর আমল করা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ মোতাবেক চলা। তাঁর আমলনামায় ছিলো নেক আমলের প্রাচুর্য। তবুও তিনি একটি আমলের খোঁজ পেয়ে আফসোসে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন যে, হায়! আমি কেন এ পর্যন্ত আমলটি করিনি, কেন এর যথাযথ মূল্যায়ন করিনি।

এমনই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সকল সাহাবা। যাদের কাজই ছিলো নবীজী (সা.)-এর সুন্নাতের উপর আমল করা। যাঁদের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ফিরে বেড়াতো নেক আমলের সন্ধানে। নেকের প্রবৃদ্ধি ও আল্লাহ তাআলাকে রাজি-খুশি করা ছিলো তাঁদের সার্বক্ষণিক ভাবনা।

এ স্পৃহা সৃষ্টি করুন

আমরা বিভিন্ন ওয়াজ-মাহফিলে বিভিন্ন আমলের ফযীলতের কথা শুনে থাকি। মূলত এসব বয়ানের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমাদের অন্তরে নেক কাজের প্রতি লোভ ও স্পৃহা সৃষ্টি করা। ফযীলতসমৃদ্ধ আমল, নফল আমলসমূহ ও মুস্তাহাবগুলো যদিও ফরয-ওয়াজিব নয়, তবুও একজন মুসলমানের অন্তরে

এগুলোর প্রতি আগ্রহী হওয়া চাই। যাঁদের অন্তরে আল্লাহ এ আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের সার্বক্ষণিক ফিকির থাকে একটাই- নেক আমল খুঁজে খুঁজে বের করে তার উপর আমল করা।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৌড়-প্রতিযোগিতা

হাদীস শরীফে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) দাওয়াতে যাচ্ছিলেন। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রা.)ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। উভয়ে পায়ে হেঁটেই যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি মরুপ্রান্তর ছিলো। তাই কেউ দেখার ছিলো না, বরং পর্দা পরিবেশ পরিপূর্ণভাবে ছিলো। এমনি নির্জন পরিবেশে রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বললেন, আয়েশা! এসো, আমরা দৌড়-প্রতিযোগিতা করি। আয়েশা (রা.) সম্মত হলেন এবং উভয়ে দৌড়-প্রতিযোগিতায় নামলেন।

এ হাদীসের মধ্যে উম্মতের জন্য শিক্ষা রয়েছে। প্রথমত স্ত্রীর বৈধ বিনোদনের প্রতি খেয়াল রাখার স্পষ্ট ইঙ্গিত এ হাদীসের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত এ শিক্ষা রয়েছে যে, নেক আমল কর- ভালো কথা। কিন্তু এর কারণে রসহীন জীবন যাপন করার অনুমতি ইসলামে নেই। বরং যত বড় বুযুর্গই হও না কেন, তোমাকে সাধারণ মানুষের মতই চলতে হবে। দরবেশ সেজে একেবারে ঘরের কোণে বসে যাওয়ার শিক্ষা ইসলাম তোমাকে দেয় নি।

হাদীস শরীফে এসেছে, উক্ত দৌড়-প্রতিযোগিাত রাসূল (সা.) দু'বার করেছেন। আয়েশা (রা.) বলেন, প্রথমবার তিনি প্রথম হন। আর দ্বিতীয়বার যেহেতু তিনি একটু মুটিয়ে গিয়েছিলেন তাই আমি প্রথম হই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেছিলেন- تلك بتلك অর্থাৎ- উভয়ে সমান সমান হলাম। একবার আমি জিতেছিলাম, এবার তুমি জিতে গেলে।

দেখুন! আমাদের বুযুর্গদের এ সুন্নাতের উপর আমল করার সুযোগ কীভাবে খুঁজেছিলেন।

হযরত থানবী (রহ.) সুন্নাতটির উপর যেভাবে আমল করেছেন

থানাভবন থেকে একটু দূরে কোথাও দাওয়াত খাওয়ার জন্য যাচ্ছিলেন হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। উভয়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে অন্য কেউ ছিলো না। পথিমধ্যে একটি নির্জন প্রান্তর দেখা গেলো। অমনি তাঁর মনে হলো, আলহামদুলিল্লাহ- রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনেক সুন্নাতের উপর আমল করার তাওফীক হয়েছে বটে, তবে নিজ স্ত্রীর সঙ্গে দৌড়-প্রতিযোগিাতর সুন্নাতের উপর আমল তো হলো না। এই তো সুযোগ, এর

উপর আমল করার উপযুক্ত পরিবেশ এখনই। এই ভেবে তিনি নিজ স্ত্রীর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় নামলেন এবং এ সুন্নাতটির উপরও আমল করলেন।

বস্তুত একেই বলে সুন্নাতের অনুসরণ। নেক আমল ও সুন্নাতের প্রতি স্পৃহা তো একেই বলে। এমনই ছিলেন আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন।

হিম্মতও আল্লাহর কাছে চাইতে হবে

মাঝে মাঝে নেক কাজের প্রতি আগ্রহ জাগে। মন চায়, অমুকের মত ইবাদত যেন আমিও করতে পারি। কিন্তু সঙ্গে এটাও মনে হয় যে, এসব ইবাদত আমার মত অলস লোকের দ্বারা হবে না। এটা তো মহানদের কাজ। অন্তরে এ জাতীয় ধারণা জন্ম নিলে তখন কী করতে হবে- আলোচ্য হাদীসের পরবর্তী অংশে এরই চিকিৎসা রয়েছে যে, وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزْ 'তখন নিরাশ হয়ে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে না এবং আমার দ্বারা অমুক আমল হবে না- এ জাতীয় ধারণা মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। বরং তখন আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করবে। বলবে, হে আল্লাহ! এ নেক কাজটি করার হিম্মত যদিও আমার নেই, তবে আপনার কুদরত তো আছে যে, আমাকে এটি করার তাওফীক দিবেন। সুতরাং দয়া করে আমাকে সেই তাওফীক দান করুন।

যেমন- বুযুর্গগণ তাহাজ্জুদ পড়েছেন, ভোর রাতে উঠেছেন, ইবাদত করেছেন। এর মাধ্যমে নিজের জীবনকে সফল করে তুলেছেন- এ জাতীয় কথা শুনলে আপনার মনেও হয়ত তাহাজ্জুদের প্রতি স্পৃহা জাগে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে হয় যে, এসব আমল বুযুর্গগণের দ্বারা সম্ভব। আমার মত দুর্বলদের দ্বারা কী সম্ভব! এ দ্বিতীয় ধারণাটি ভুল, বরং আপনাকে বলতে হবে যে, এটা আমার দ্বারাও সম্ভব। আর এজন্য দুআ করতে হবে। তাওফীক কামনা করতে হবে।

আমলের তাওফীক অথবা সাওয়াব

আমলের তাওফীক কামনা করে দুআ করলে দু'টির একটি তো অবশ্যই পাবেন। হয়ত কাঙ্ক্ষিত আমলটি করার তাওফীক হবে। কিংবা সেই আমলের সাওয়াব পাওয়া যাবে। কারণ, হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে শাহাদাত কামনা করে এবং বলে, হে আল্লাহ, আমাকে শাহাদাত নসিব করুন, তাহলে আল্লাহ তাকে শাহাদাতের সাওয়াব দান করেন, যদিও ঘরে বিছানায় শায়িত অবস্থায় তার ইন্তেকাল হয়।

এক কর্মকারের ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) এর ইন্তেকালের পর এক লোক তাঁকে স্বপ্নে জিজ্ঞেস করলো, হযরত, কেমন আছেন? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ আমার সঙ্গে অত্যন্ত কোমল আচরণ করেছেন, আমাকে মাফ করে দিয়েছেন এবং আশাতীত সম্মান দান করেছেন। তবে আমার বাড়ির পাশে যে কর্মকার থাকতো, আল্লাহ তাকে যে মাকাম দান করেছেন, তা আমার ভাগ্যে জুটেনি।

স্বপ্নদ্রষ্টা ঘুম থেকে ওঠে কৌতূহল বোধ করলো যে, কে সেই কর্মকার, কী আমল ছিলো তার, যার কারণে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) এর মতো বুযুর্গেরও উপরে চলে গেলেন? এটা জানতে হবে। তাই সে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের এলাকায় এলো এবং ওই কর্মকার সম্পর্কে বিভিন্নজনের কাছে খোঁজখবর নিলো। অবশেষে লোকটি কর্মকারের বাড়িতে গিয়ে উঠলো এবং তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার স্বামী কী আমল করতো? কর্মকারের স্ত্রী জানালো, আমার স্বামীকে বিশেষ কোনো আমল করতে দেখিনি। তিনি সারাদিন লোহা পেটাতেন। তবে হ্যাঁ, তার মধ্যে দুটো জিনিস দেখেছি–

১. লোহা পেটানো অবস্থায় যখন আযানের আওয়াজ শুনতেন, সঙ্গে সঙ্গে উঠে যেতেন এবং নামাযের প্রস্তুতি নিতেন। এমনকি অনেক সময় দেখেছি, লোহা পেটানোর জন্য হাতুড়ি উঠিয়েছেন, আর তখনই আযান শোনা গেছে, তিনি হাতুড়ি নীচের দিকে আর নামাননি, বরং হাতুড়ি পেছনের দিকে ছেড়ে দিয়েছেন এবং নামাযের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য উঠে গেছেন।

২. আমাদের পাশের বাড়িতে এক বুযুর্গ থাকতেন। তাঁর নাম ছিলো আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)। তিনি বাড়ির ছাদে উঠে রাতভর ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। ওই বুযুর্গকে দেখে আমার স্বামী প্রায়ই আফসোসঝরা কণ্ঠে বলতেন, আহা! আমি যদি এ বুযুর্গের মতো ইবাদত করতে পারতাম। আল্লাহ যদি আমাকে ইবাদতের জন্য অবসর করে দিতেন!

কর্মকারের স্ত্রীর উত্তর শুনে স্বপ্নদ্রষ্টা বলে উঠলো, হ্যাঁ, এ আফসোসই তাকে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের মতো বুযুর্গের চেয়েও উপরে নিয়ে গিয়েছে।

আব্বাজান মুফতি শফী (রহ.) বলতেন, একেই বলে বিরল আফসোস। সুতরাং কাউকে নেক কাজ করতে দেখলে তুমিও তা করার জন্য আগ্রহ দেখাবে।

কেমন ছিলো সাহাবায়ে কেরামের চিন্তাধারা?

হাদীস শরীফে এসেছে, এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের অনেক সাথী বিত্ত-বৈভবের মালিক, তাদের ব্যাপারে আমাদের মনে ঈর্ষা জাগে। কেননা, শারীরিক ইবাদতগুলো তো তারা আমাদের মতোই করে। কিন্তু সম্পদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ইবাদতের ক্ষেত্রে তো তারা আমাদের থেকে বেড়ে যাচ্ছে। যেমন- সদকা-খয়রাতের দিকে তারা আরো এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে যেমনিভাবে তাদের গুনাহগুলো মাফ হচ্ছে, অনুরূপভাবে তাদের মর্যাদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং তারা আমাদের থেকে আগে চলে যাচ্ছে। আখেরাতে সুউচ্চ মাকামে তারা ধীরে ধীরে পৌঁছে যাচ্ছে। আর আমরা? আমরা তো গরিব। দান-সদকা করতে পারি না বিধায় তাদের চেয়ে উন্নতিও করতে পারি না।

দেখুন, আমাদের চিন্তা এবং সাহাবায়ে কেরামের চিন্তার মাঝে কত ব্যবধান। আমাদের অবস্থা হলো, কোনো ধনী লোকের কথা ভাবলে তার দান-সদকা সম্পর্কে ভাবি না। তার মানবসেবার প্রতি আমাদের কৌতূহল জাগে না। বরং ঈর্ষা হয় তার সম্পদের প্রতি, সুখ-বিলাসিতার প্রতি। আফসোসঝরা কণ্ঠে বলি, আহ! আমারও যদি এমন হতো, তাহলে উদ্যাম ফুর্তি ও ভোগ-বিলাস আমার জীবনেও থাকতো!

যাহোক, উক্ত সাহাবীর প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমি তোমাদেরকে একটি আমলের কথা বলবো। এটি করতে পারলে দান-সদকাকারীদের চেয়ে আরো অধিক সাওয়াবের অধিকারী হবে। তখন তোমাদের উপরে কেউ যেতে পারবে না। আমলটি হলো, প্রতি নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ আল্লাহু আকবার পড়বে।

নেক কাজের প্রতি আগ্রহ এক মহান নেয়ামত

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, যদি বিত্তশালী ব্যক্তিরাও আমলটি শুরু করে, তবে উক্ত সাহাবীর প্রশ্ন তো আপন অবস্থাতেই থেকে গেলো। কেননা, সম্পদশালীরা তখন দান-সদকার মাধ্যমে আরো সুউচ্চ মাকাম অর্জন করতে সক্ষম হবে।

এর উত্তর হলো, মূলত ওই সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ (সা.) একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, দান-সদকা করার জন্য তোমার অন্তরে স্পৃহা সৃষ্টি হয়েছে এবং এর জন্য তোমার আফসোসও প্রকাশ পেয়েছে- এর কারণেই তুমি দান-সদকা করার সাওয়াব পেয়ে গিয়েছো- সুতরাং তুমি আর ওই দান-সদকাকারী বিত্তশালীর সমান হয়ে গিয়েছো। এবার যদি অতিরিক্ত এ আমলটি তুমি কর,

তাহলে ইনশাআল্লাহ আখেরাতের জীবনে তার চেয়ে উঁচু মাকামে তুমি পৌঁছে যেতে পারবে।

'যদি' শব্দ শয়তানের চতুরতার পথ খুলে দেয়

আলোচ্য হাদীসের পরবর্তী অংশে এসেছে–

وَاِنْ اَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ اَنِّيْ فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَاِنَّ "لَوْ" تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ-

'দুনিয়ার জীবনে চিন্তা বা বেদনায় ক্লিষ্ট হলে তখন এটা বলবে না যে, যদি এমনটি করতাম, তবে এটা হতো না, অথবা যদি এটা করতাম, তবে এমনটি হতো। এই 'যদি' শব্দ বলো না, বরং বলবে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় এমনই ছিলো, তিনি যা চেয়েছেন তা-ই হয়ে গেলো।

যেমন, প্রিয়জন মারা গেলে তখন এমনটি বলবে না যে, অমুক ডাক্তারের চিকিৎসা পেলে বেঁচে যেতো। অথবা মূল্যবান কিছু চুরি বা ছিনতাই হয়ে গেলে এটা বলবে না যে, এভাবে হেফাযত করলে জিনিসটি খোয়া যেতো না, বরং বলবে, আল্লাহ যা চেয়েছেন, তা-ই হয়েছে। তাকদীরে এটাই ছিলো। হাজারও তাদবীর বা চেষ্টা করলেও এমনটিই হতো।

দুনিয়ায় সুখ-দুঃখ হাত ধরাধরি করে চলে

কত চমৎকার শিক্ষা দেয়া হয়েছে আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে। আল্লাহ আমাদের হৃদয়ে এ শিক্ষা বদ্ধমূল করে দিন। আমীন।

মনে রাখবেন, সুখ-দুঃখ, আরাম-আয়েশ, স্বস্তি ও নিরাপত্তা তখনই ধরা দেয়, যখন মানুষ তাকদীরের উপর বিশ্বাস করে। কারণ, প্রতিটি মানুষই দুঃখ-বেদনা ও দুশ্চিন্তার সঙ্গে পরিচিত। সুখ-দুঃখ নিয়েই এ দুনিয়া। এখানে শুধু সুখ বা শুধু দুঃখ নেই। বরং উভয়ের সহাবস্থান হচ্ছে এ দুনিয়া। দুঃখ-বেদনাকে দূর করার জন্য গোটা দুনিয়া খরচ করলেও সে আসবেই।

আল্লাহর প্রিয় বান্দারাও দুঃখ-বেদনার সঙ্গে পরিচিত

আমার আর আপনার মূল্যই বা কত! আম্বিয়ায়ে কেরাম ছিলেন আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয়। আল্লাহ তাদেরকে দুঃখ-বেদনায় ফেলেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে–

اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ - (كنز العمال، رقم الحديث ٤٧٨٣)

মানুষের মধ্য বেশি বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন আম্বিয়াযে কেরাম। তারপর যারা আম্বিয়ায়ে কেরামের যত অধিক নিকটবর্তী, তাদের দুঃখ-কষ্টও তত বেশি।

সুখের ঠিকানা জান্নাত। সেখানে দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, বেদনা নেই। দুনিয়া সুখের ঠিকানা নয়। তাই পেরেশানির আগমন এখানে হবেই। কিন্তু পেরেশানিতে পড়েই যদি তুমি অভিযোগ করে বস যে, এত পেরেশানি কেন? যদি এটা করতাম, তাহলে এত পেরেশানী পোহাতে হতো না। অমুক কারণে এ মুসিবত এসেছে। অভিযোগ সম্বলিত এ জাতীয় চিন্তা- চেতনা দুঃখ-কষ্ট কমাবে না, পেরেশানিকে দূর করবে না, বরং বাড়াবে। এর পরকালীন ফলও হয় খুবই ভয়াবহ। এমনকি অনেক সময় ঈমানহারা হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

অন্তর্নিহিত রহস্য বোঝার যোগ্যতা কোথায়?

এই জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বালা-মুসিবতে পড়লে এই চিন্তা করবে যে, যা এসেছে তা আল্লাহর ইচ্ছায় এসেছে। কেন এসেছে– এ রহস্য উদ্ঘাটনের যোগ্যতা আমার কোথায়? সুতরাং বিপদে পড়ে দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হয়ে কিংবা বেদনা পেলে কান্না এলে কাঁদা উচিত। এতে কোনো অসুবিধা নেই। আল্লাহর দরবারে চোখের পানি পড়াটাই আল্লাহ কামনা করেন। অনেকে মনে করে কাঁদা উচিত নয়। এ ধারণা ভুল। কারণ, কষ্টের সময় কাঁদা অন্যায় নয়। তবে শর্ত হলো, আল্লাহর উপর কোনো অভিযোগ করা যাবে না।

ক্ষুধার তীব্রতায় বুযুর্গের কান্না

এক বুযুর্গ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে দেখেন, তিনি কাঁদছেন। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, হযরত কাঁদছেন কেন? বুযুর্গ উত্তর দিলেন, ক্ষুধা পেয়েছে, তাই কাঁদছি। লোকটি বললো, আপনি কী শিশু যে, ক্ষুধা পেলে কাঁদতে হবে? উত্তরে বুযুর্গ বললেন, তুমি এর কী বুঝবে? আসলে আল্লাহ তাআলা আমার কান্না দেখতে চান, তাই তিনি আমাকে ক্ষুধা দিয়েছেন। এইজন্যই আমি কাঁদছি।

আল্লাহর প্রতি অভিযোগ না করার শর্তে কান্নাকাটি করার অনুমতি রয়েছে। সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় এর নাম তাফবীয। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিষয় আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেয়া এবং এটা বলা যে, হে আল্লাহ! বাহ্যিকভাবে যদিও আমার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আপনার সিদ্ধান্তই যথার্থ।

সবকিছু আল্লাহ থেকে হয়, এমন কি একটি শুকনো পাতাও আল্লাহর হুকুমে ঝরে– এরূপ বিশ্বাস অন্তরের মাঝে ভালোভাবে বসাতে পারলে তার সফলতা

নিশ্চিত। এর দ্বারা মনে স্বস্তি ও শান্তি অনুভূত হবে এবং দুঃখের ধাক্কায় একেবারে ভেঙে পড়া থেকে নিরাপদে থাকবে।

মুসলমান বনাম কাফের

কাফের আল্লাহকে মানে না, তাকদীরে বিশ্বাস করে না। তার আত্মীয় অসুখে পড়েছে, চিকিৎসাবস্থায় মারা গিয়েছে, তখন তার সান্ত্বনা পাওয়ার কোনো পথ নেই। কারণ, তার ধারণামতে তো ডাক্তারের অবহেলায় আত্মীয়টি মারা গিয়েছে। যদি ডাক্তার অবহেলা না করতো, তাহলে রোগী মারা যেতো না।

অপরদিকে একজন মুসলমান আল্লাহকে বিশ্বাস করে। তাকদীরকেও বিশ্বাস করে। তার আত্মীয় অসুস্থ হলে, অতঃপর চিকিৎসার পরেও মারা গেলে, তাহলেও তার সান্ত্বনা পাওয়ার পথ আছে। সে মনে করে, যদিও এ মৃত্যুর বাহ্যিক কারণ ডাক্তারের উদাসীনতা, কিন্তু এর প্রকৃত কারণ তো হলো– তাকদীর। অর্থাৎ– যা কিছু হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে। যদি ডাক্তার সঠিক চিকিৎসাও করতেন, আর রোগীর ভাগ্যে যদি মৃত্যুই থাকতো, তাহলেও কেউ ঠেকাতে পারতো না। তাকদীর সত্য। সুতরাং এর মৃত্যুও সত্য। এখানে মাখলুকের কোনো দখল নেই।

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলতেন, আমি যদি জ্বলন্ত অগ্নিস্ফূলিঙ্গ মুখে নিয়ে চলতে থাকি– এ কাজটা আমার কাছে অধিক শ্রেয় মনে হয় ওই কথা থেকে, যা অনেকে আফসোস করে বলে যে, আহ্ যদি এ ঘটনা না ঘটতো! অথবা যা ঘটেনি, তার ব্যাপারে বলে, আফসোস, যদি এমন ঘটতো!

আল্লাহর সিদ্ধান্ত মেনে নাও

উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত দিবেন এবং আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত মতে কোনো ঘটনা ঘটে যায়, তারপর এ সম্পর্কে এমন মন্তব্য করা যে, এমন না হলে ভালো হতো অথবা এভাবে বলা যে, যদি এমন হতো। এ জাতীয় মন্তব্য করা আল্লাহর তাকদীরের সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ। একজন মুমিনের উচিত আল্লাহর তাকদীরের উপর সন্তুষ্টি থাকা। অপর হাদীসে হযরত আবুদ্দারদা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে–

اِذَاقَضَى اللّٰهُ قَضَاءً اَحَبَّ اَنْ يُّرْضٰى بِقَضَائِهٖ۔

আল্লাহ তাআলা যখন কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন যে, এ কাজ এভাবে আঞ্জাম দিতে হবে, আর আল্লাহ তাআলা এটা পছন্দ করেন যে, আমার বান্দা যেন এ সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকে এবং একে নির্দ্বিধায় মেনে নেয়।'

বান্দা যেন এমনটি না বলে যে, এভাবে হলে ভালো হতো। মনে করুন, এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে, যা স্বাভাবিকের বিপরীত। যেমন– কোনো বিপদের ঘটনা, তখন ঘটে যাওয়া ঘটনার উপর এমন বলা যাবে না যে, যদি এভাবে করতাম, তবে ঘটনাটি ঘটতো না। এ জাতীয় কথা বলা একজন মুমিনের জন্য সাজে না।

আল্লাহর ফয়সালা মেনে নেয়ার মাঝেই রয়েছে শান্তি

আসলে যদি একটু ভেবে দেখা হয়, তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যে কোনো মানুষের জন্য তাকদীরকে মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। কারণ, আপনার কাছে অস্বস্তিকর মনে হলেও যা ঘটার তা ঘটবেই। সুতরাং অযথা হা-পিত্যেস করলে দুঃশ্চিন্তা বাড়বে বৈ কমবে না। এজন্যই বলি, তাকদীরের ফয়সালা মেনে নেয়ার মাঝেই রয়েছে স্বস্তি। বিশ্বাসী বান্দার জন্য এটি এক প্রকার শান্তির ওসিলা।

তদবীরের মাধ্যমে তাকদীর পাল্টায় না

এক বিস্ময়কর আকীদার নাম তাকদীর। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিজন বিশ্বাসী-বান্দার এক অনন্য উপহার। একে সঠিকভাবে না বোঝার কারণে কত মানুষ কতভাবে বিভ্রান্ত হয়। প্রথম কথা হলো, ঘটনা ঘটার পূর্বে তাকদীরের আকীদা যেন আপনাকে বিভ্রান্ত না করতে পারে। যেমন– তাকদীরের বাহানা ধরে হাতের উপর হাত গুটিয়ে বসে থাকা, কোনো কাজ-কর্ম না করা বরং তাকদীরে যা আছে তা হবে কাজ-কর্ম না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া- এসব রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের বিপরীত পথে চলার নাম তাকদীর নয়। বরং নির্দেশ হলো, অর্জন ও উপার্জনের জন্য বৈধ পথে যতটুকু চেষ্টা করা দরকার ততটুকু করবে। চেষ্টায় কখনও ত্রুটি করবে না।

তদবীর তথা প্রচেষ্টার পর সিদ্ধান্ত আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও

দ্বিতীয় কথা হলো, তাকদীরের উপর আকীদা রাখা– এ আমলটির শুরু কোত্থেকে হয়? মূলত আমলটির 'শুরু' হচ্ছে কিছু ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর। যেমন, কোনো ঘটনা ঘটে গেলে একজন মুমিনের চিন্তা হতে হবে এরকম যে, আমার চেষ্টা তো আমি করেছি, কিন্তু চেষ্টার বিপরীতে ঘটনা ঘটে গেলো,

সুতরাং এটা আল্লাহর ফয়সালা বা তাকদীর বিধায় আমি এর উপর সন্তুষ্ট। অপরদিকে ঘটনা ঘটার পর যদি বলা হয়, আহা, যদি এভাবে না করে ওইভাবে করতাম, তাহলে তো রক্ষা পেতাম- এরূপ চিন্তা-চেতনাই মূলত তাকদীর বিরোধী।

মোটকথা, তাকদীরের বাহানা দেখিয়ে চেষ্টা ত্যাগ করা যাবে না এবং চেষ্টার পরেও বিপরীত কিছু ঘটে গেলে তাকদীরের উপরই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এটাই হলো মধ্যমপন্থা। আর এ শিক্ষাই রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে দিয়েছেন।

হযরত উমর (রা.) এর একটি ঘটনা

হযরত উমর (রা.) একবার সিরিয়া যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সংবাদ পেলেন, সিরিয়ায় মারাত্মক মহামারি দেখা দিয়েছে। এ মরণব্যাধি মহামারিতে হাজার হাজার সাহাবা শহীদ হয়ে যান। জর্দানে এসব সাহাবার কবর আজও রয়েছে। হযরত উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা.) এর কবরও সেখানে রয়েছে।

যাহোক, হযরত উমর (রা.) সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, সিরিয়ায় যাবেন, নাকি মদীনায় ফিরে যাবেন। তখন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) একটি হাদীস শোনালেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মহামারিতে আক্রান্ত এলাকার মানুষ যেন এলাকা ছেড়ে না যায় এবং বহিরাগত মানুষ যেন আক্রান্ত এলাকায় প্রবেশ না করে। হাদীসটি শুনে হযরত উমর (রা.) বললেন, এ হাদীসে তো মহামারি এলাকায় না যাওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। সুতরাং আমি সেখানে যাবো না।

উমর (রা.)-এর সফর মুলতবির খবর শুনে এক সাহাবী- সম্ভবত হযরত উবাইদাহ ইবনুর জাররাহ (রা.) উমর (রা.)-কে বললেন- اَتَفِرُّ مِنْ قَدْرِ اللّٰهِ আপনি কি আল্লাহর তাকদীর থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন? আপনার মৃত্যু যদি এ মহামারিতে হয়, তাহলে মৃত্যু আসবেই, আর যদি এর মাধ্যমে আপনার মৃত্যু তাকদীরে না থাকে, তাহলে তো যাওয়া-না যাওয়া সমান।'

হযরত উমর (রা.) উত্তর দিলেন, نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدْرِ اللّٰهِ اِلٰى قَدْرِ اللّٰهِ হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর তাকদীর থেকে তার আরেক তাকদীরের দিকেই পালাচ্ছি। অর্থাৎ- ঘটনা ঘটার আগ পর্যন্ত সতর্কতামূলক তদবীর করার জন্য আমাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে। সতর্কতামূলক তদবীর গ্রহণ করা তাকদীরের পরিপন্থী নয়, বরং এটাও তাকদীর আকীদারই অংশ। কেননা, রাসূল (সা.) বলেছেন, সতর্কতামূলক উপায় অবলম্বন কর, তাই আমি এ নির্দেশের উপর আমল করার উদ্দেশ্যে ফিরে যাচ্ছি। এ মহামারিতে আমার মৃত্যু এলে কিছুই করার নেই। তবে সতর্কতা অবলম্বন করতে তো কোনো বাধা নেই।

তাকদীরের সঠিক ব্যাখ্যা

চেষ্টা ও ব্যবস্থাপনা নিজের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যেতে হবে। তারপর সংশ্লিষ্ট বিষয়টি আল্লাহর উপর সোপর্দ করতে হবে। তাকদীরের সঠিক ব্যাখ্যা এটাই। তাকদীর মানে হাত গুটিয়ে বসে থাকার জন্য বাহানা ধরার নাম নয় কিংবা নিস্পৃহ হয়ে বসে থাকা নয়। বরং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উপায় অবলম্বনও করতে হবে। এটা তাকদীর-পরিপন্থী নয়। সব উপায় ও ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও যদি তোমার পরিকল্পনা মত কাজ না হয়, তাহলে তা মেনে নেয়া মানেই তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা। মনমত কাজ না হলে পেরেশান হওয়া এবং এটা বলা যে, এ ফয়সালা তো গলদ হয়ে গিয়েছে– এরূপ করা মানে তাকদীরের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করা। এতে টেনশন বাড়ে বৈ কমে না। কেননা, অবশেষে তোমাকে তো আল্লাহর ফয়সালা মানতেই হবে। সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়াই ভালো।

চিন্তা ও পেরেশানি প্রকাশ করা তাকদীরের খেলাফ নয়

দুঃখজনক কোনো ঘটনা ঘটে গেলে এর জন্য কান্নাকাটি করা ধৈর্য পরিপন্থী নয় বা এতে কোনো গুনাহও হয় না। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, একদিকে আপনি বলছেন, দুঃখ-কষ্টে অস্থির হওয়া এবং এর প্রকাশ করা জায়েয, এজন্য কান্নাকাটি করাও জায়েয, অপরদিকে বলছেন, আল্লাহ তাআলার ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বিপরীতমুখী দুটো বিষয় একসঙ্গে হয় কীভাবে?

ভালো করে বুঝে নিন, দুঃখ কষ্টে অস্থির হওয়া আর আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট এক বিষয় নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলার ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর ফয়সালা অবশ্যই হেকমতপূর্ণ ও রহস্য-সমৃদ্ধ, যা আমরা জানি না। আর আমরা জানি না বিধায় চিন্তা হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে এবং এর জন্য কান্নাও আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এও জানি যে, আল্লাহর ফয়সালাই একমাত্র সঠিক ফায়সালা। সুতরাং তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা হলো চিন্তার দিক থেকে আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা। অর্থাৎ কান্না এলেও দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে এরূপ যে, আল্লাহ যা ফয়সালা করেছেন, সেটাই সঠিক।

একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত

এর দৃষ্টান্ত অপারেশন প্রয়োজন এমন একজন রোগীর মত। রোগী ডাক্তারের নিকট গিয়ে বললো, ডাক্তার সাহেব! আমার চিকিৎসা করুন, প্রয়োজনে অপারেশন করুন। অবশেষে অপারেশন যখন শুরু হলো, তখন সে

বিষণ্ন হলো, চিন্তিত হলো, আতঙ্কে কাঁদতেও লাগলো। কিন্তু তবুও সে অপারেশনের সব ব্যথা সহ্য করে গেলো। অপারেশন শেষে ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানাতে ভুল করলো না। উপরন্তু বিলও পরিশোধ করলো। কারণ, এ রোগী একথা জানে যে, ডাক্তার সাহেব যা করেছেন, সেটাই সঠিক। আমার কষ্ট হলেও ডাক্তার সাহেবের কাজটি ধন্যবাদযোগ্য। অনুরূপভাবে এ পার্থিব জগতে দুঃখ-বেদনা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। এর মাধ্যমে আমাদেরকে পরীশীলিত করে তুলতে চান। কাজেই দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়েই যদি আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকা যায়, সেটাই হবে আমাদের জন্য সঠিক। দুঃখ লাগবে, কান্না আসবে; কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে যে, আল্লাহ যা ফায়সালা করেছেন সেটাই সঠিক। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে তাতে কোনো দোষ নেই। এরজন্য কোনো ধর-পাকড়াও হবে না।

পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যাওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেছেন, অনেক সময় ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন পরিকল্পনা করে এবং চেষ্টায় লেগে থাকে যে, যদি আমার অমুক ব্যবসাটা হয়, তাহলে অনেক লাভবান হব। বা অনেকে বিভিন্ন পদমর্যাদার জন্য তদবীর করে এবং মনে করে পদটি পাওয়া গেলে কতই না ভালো হবে। তারপর ব্যবসায়ী ব্যবসার জন্য, পদপ্রার্থী পদের জন্য দুআ চালিয়ে যেতে থাকে সারাক্ষণ। অপরকে দিয়েও দুআ করাতে থাকে। অবশেষে ব্যবসা বা চাকুরি যখন সফলতার মুখ দেখে, ঠিক তখনি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের ডেকে বলেন, আমার বান্দা নির্বোধ, ব্যবসা বা চাকুরির জন্য সে উঠে-পড়ে লেগেছে। এজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি জানি, এ বান্দার প্রত্যাশা যদি আমি পূরণ করি, তাহলে তাকে জাহান্নামে ঠেলে দিতে হবে। কাজেই এর আশা-ভরসাটি শেষ করে দাও। অবশেষে এ বান্দার প্রত্যাশা আর পূরণ হয় না বরং অপূর্ণ থেকে যায়। তখন সে হয়ত অন্যকে অভিযুক্ত করে বসে। অথচ প্রকৃত সত্যটা তার জানা নেই। প্রকৃত সত্য হলো, সবকিছু ঘটিয়েছেন আল্লাহ তাআলা এবং তার কল্যাণের জন্যই ঘটিয়েছেন। কেননা, তার আশা যদি পূর্ণ হতো, তাহলে সে জাহান্নামের আযাবে নিক্ষিপ্ত হতো। আর এটাই হলো তাকদীর।

তাকদীরের আকীদায় ঈমান এনেছি

তাকদীরের উপর ঈমান প্রত্যেক মুমিনকেই আনতে হয়। অন্যথায় ঈমানদার হওয়া যায় না। আল্লাহ, রাসূল, কিতাব, ফেরেশতা ও আখিরাতের উপর ঈমান আনার পাশাপাশি তাকদীরের উপরও ঈমান আনা জরুরি। কিন্তু

সাধারণত মুমিনদের মনে ঈমানের প্রভাব জাগরুক থাকে না। আকীদার উপস্থিতি বাস্তবজীবনে খুব একটা দেখা যায় না। এ কারণেই আজ মুমিন হওয়া সত্ত্বেও অন্তরে স্বস্তি নেই বরং দুনিয়ার অস্থিরতায় মত্ত। এজন্য সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, যখন তোমরা তাকদীরকে বিশ্বাস করেছ, তখন তোমাদের উচিত একে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নেয়া। কাজেই এর ধ্যান অন্তরে বদ্ধমূল কর। ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনার মুহূর্তে এ আকীদার অনুশীলন কর। বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে গেলে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড় এবং সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় এ বলে আল্লাহর কাছে সোপর্দ কর যে, এটা আল্লাহর ফয়সালা। এভাবে এ আকীদাকে হৃদয়ে বসাতে পারলে তখন দুনিয়াতে আর কোনো পেরেশানি থাকবে না। 'আল্লাহ তাআলা এ আকীদা আমাদের সকলের অন্তরে বদ্ধমূল করিয়ে দিন। আমীন- ছুম্মা আমীন।"

কেন এই পেরেশানী?

দুঃখ-বেদনা এ জগতে আসবেই। এর কারণেই মানুষ অস্থির হয়। মানসিকভাবে অস্বস্তি বোধ করে। মূলত এটা তাকদীরের উপর ঈমানের দুর্বলতার কারণে হয়। যে ব্যক্তি মনে করে, আমার সাধ্যে যতটুকু করার ছিল, তা আমি করেছি, বাকীটুকু আমার শক্তি-সামর্থের বাইরে। এরপর আল্লাহ যা ফয়সালা করেন, সেটাই সঠিক- এমন ব্যক্তির কখনও পেরেশানি আসতে পারে না। দুঃখ-কষ্ট আসবে অবশ্যই; কিন্তু মানসিক অস্থিরতা আসবে না।

সোনালী হরফে লিখে রাখার মতো বাক্য

আব্বাজানের ইন্তেকালে আমি ভীষণভাবে ব্যথিত হয়েছি। এমন কষ্ট জীবনে আর পাইনি। এ বেদনা সইতে না পেরে আমি অস্থির হয়ে উঠছিলাম। কোনোভাবেই সান্ত্বনা পাচ্ছিলাম না। অতি বেদনায় কান্নাও আসছিলো না। অনেক সময় চোখের পানিতে কষ্ট লাঘব হয়। কিন্তু আমার বেলায় তাও হচ্ছিলো না। অবশেষে বিস্তারিত অবস্থা আমার শায়েখ ডা. আব্দুল হাই (রহ.) কে জানালাম। আমার চিঠি পেয়ে হযরত যে প্রতিউত্তর আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ' আজও তা অন্তরে গেঁথে আছে। একটিমাত্র বাক্য আমাকে অনেকটা স্বাভাবিক করে তুলেছে। বাক্যটি ছিলো এই–দুঃখ তো লাগবেই। তবে অনিচ্ছাকৃত বিষয়ে এত বেশি অস্থির হওয়াটা সংশোধনযোগ্য।' অর্থা– দুঃখ পাওয়াটা স্বাভাবিক। কারণ, মহান পিতার বিয়োগ- বেদনা এটি। তবে এটা তো অনিচ্ছাকৃত একটি ঘটনা। কারণ, ইচ্ছা করলেও তুমি ঠেকাতে পারতে না এ মৃত্যু। কাজেই অনিচ্ছাকৃত এ ঘটনায় এতটা পেরেশান হওয়া সংশোধনযোগ্য বিধায় এর সংশোধন হওয়া উচিত।

উদ্দেশ্য হলো, তাকদীরী ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকার যে নির্দেশ আছে, তার উপর আমল হচ্ছে না। আর এ কারণে মন স্বস্তি পাচ্ছে না।

বিশ্বাস করুন, এই একটিমাত্র বাক্য পড়ার পর আমার মনে হলো, কেউ যেন আমার বুকের উপর বরফ রেখে দিয়েছে এবং আমার চোখ খুলে দিয়েছে।

হৃদয়ে অঙ্কিত রাখার মতো বাক্য

আরেকবারের ঘটনা। আমার অপর শায়েখ হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান (রহ.) কে আমি চিঠি লিখেছিলাম যে, হযরত! অমুক কাজের জন্য মানসিকভাবে খুব অস্থিরতায় ভুগছি। প্রতি উত্তরে হযরত যা লিখলেন, তা ছিলো নিম্নরূপ–

'আল্লাহর সঙ্গে যে সম্পর্ক জুড়েছে, পেরেশানির সঙ্গে তার সম্পর্ক কিসের?

অর্থাৎ– পেরেশান থাকাটা একমাত্র প্রমাণ যে, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল। কারণ, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক যার গভীর, তার জীবনে পেরেশানি আসতে পারে না। কারণ, দুঃখ-বেদনায় পড়লে আল্লাহর কাছে বলবে। হয়ত আল্লাহ তা দূর করে দিবেন কিংবা আক্রান্ত ব্যক্তি আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকবে। বোঝা গেলো, তাকদীর তথা আল্লাহর ফয়সালা মেনে নেয়ার মাঝে রয়েছে শান্তি ও স্বস্তি।

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহ.) এর শান্তি-রহস্য

এক লোক যুন্নুন মিসরী (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলো, হযরত! কেমন আছেন? তিনি উত্তর দিলেন, খুব আরামে আছি। ওই ব্যক্তি সুখ-শান্তির ব্যাপারে কী জানতে চাও, বিশ্বের কোনো ঘটনাই যার মর্জি পরিপন্থী হয় না, বরং বিশ্বের প্রতিটি ঘটনা যার মর্জি মোতাবেক হয়। প্রশ্নকারী তো উত্তর শুনে একেবারে থ বনে গেলো। বললো, হযরত! দুনিয়ার সব কাজ আম্বিয়ায়ে কেরামের মর্জি মোতাবেকও তো হতো না। কিন্তু এ অবস্থা আপনার কী করে অর্জিত হলো? যুন্নুন মিসরী (রহ.) উত্তর দিলেন, আসলে আমার নিজস্ব মর্জি বলতে কিছু নেই। নিজের মর্জিকে আমি আল্লাহর মর্জির মাঝে বিলীন করে দিয়েছি। যা আল্লাহর মর্জি– তাই আমার মর্জি। আর দুনিয়ার সব কাজ তো আল্লাহর মর্জি মোতাবেকই হয়। আমার মর্জিও তাই। সুতরাং সব কাজ যখন আমার মর্জি মোতাবেক হচ্ছে, তাহলে দুঃখের প্রশ্ন তো রইলো না। এ কারণেই অশান্তি আমার পাশেও ঘেঁষতে পারে না। মানসিক অশান্তি তো ওই ব্যক্তির থাকে, যার মর্জি ও ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে।

দুঃখ-কষ্টও মূলত রহমত

তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকার সম্পদ আল্লাহ যাকে দান করেছেন, মানসিক অশান্তি তার কাছে আসে না। দুঃখ-বেদনা, চিন্তা ও কষ্ট তাকেও আঘাত করবে, কিন্তু তবুও সে থাকবে একপ্রকার শান্তি ও স্বস্তির ভেতরে। যেহেতু সে এটা ভালো করেই জানে যে, দুঃখ-কষ্ট যা আসছে, তা আমার মালিক আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে। আল্লাহর হেকমত মোতাবেকই আসছে। নিশ্চয় এরই মধ্যে তিনি আমার জন্য কল্যাণ রেখেছেন। কোনো কোনো বুযুর্গ তো এমনও বলেছেন যে–

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت

سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

'তোমার তরবারির আঘাতে ধ্বংস হওয়ার সৌভাগ্য আমাদের দুশমনদের না হোক। তোমার তরবারি পরীক্ষা চালানোর জন্য তো বন্ধুদের মাথাই পাতা আছে।'

অর্থাৎ– আপাতত দুঃখ-বেদনাও আল্লাহর রহমত। অতএব, এ রহমত দুশমনদের জন্য কেন হবে? এটাও আমাদের জন্যই হওয়া উচিত।

একটি দৃষ্টান্ত

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতেন, এক ব্যক্তি আপনার খুব প্রিয়, যথেষ্ট আন্তরিকতা আপনাদের মাঝে রয়েছে। ভিনদেশে থাকার কারণে এ প্রিয় বন্ধুটির সঙ্গে আপনার দীর্ঘদিন সাক্ষাত হয় না। একদিন হঠাৎ বন্ধুটি এলো। চুপিসারে পেছন দিক থেকে আপনাকে জোরে চেপে ধরলো, আপনার বুকের হাড় যেন ভেঙ্গে যাবে– এত জোরে আপনাকে জড়িয়ে ধরলো। এতে আপনি দারুন কষ্ট পাচ্ছেন। ফলে আপনি ছাড়া পাওয়ার জন্য চেচামেচি করছেন আর জিজ্ঞেস করছেন, তুমি কে? বললো, কষ্ট হলে বলো তোমাকে ছেড়ে দিই এবং অন্যকে চেপে ধরি। যদি আপনি সত্যিকারের বন্ধু হয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই বলবেন, না বন্ধু! অন্যকে নয়, আমাকেই চেপে ধর। আবেগের আতিশয্যে হয়ত এই কবিতাটিও পাঠ করবেন–

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت

سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

আল্লাহর পক্ষ থেকে দুঃখ-কষ্টে আমার উদাহরণও অনুরূপ। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর এক প্রকার রহমত। তবে আমরা যেহেতু দুর্বল, তাই সহ্য করতে পারি না। এজন্যই আল্লাহর কাছে আমরা মুসিবত কামনা করি না বা করতে পারি না। কিন্তু যদি এসেই পড়ে, তাহলে এটাকে আল্লাহর ফয়সালা হিসাবে মেনে নিতে হবে। আর এটাই হবে আমাদের জন্য সঙ্গত ও নিরাপদ পথ।

দুঃখ-বেদনার প্রত্যাশা করো না; কিন্তু আক্রান্ত হলে সবর করবে

দুঃখ-মুসিবত ডেকে আনার বস্তু নয়। অবশ্য অনেক সুফিয়ায়ে কেরাম এটা কামনা করে নিয়েছেন। সেটা ভিন্ন কথা। মহান ব্যক্তিত্বদের জন্য সেটা মানায়, আমাদের জন্য নয়। এসব মহানদেরকে নিয়েই কবির কবিতা আবৃত্তি করতে হয়–

بجرم عشق توام می کشند غوغائیست

تو نیز بر سر بام آ که خوش تماشائیست

'তোমাকে ভালোবাসার অপরাধে আমি আজ ধিকৃত ও উপেক্ষিত। একটু দেখুন, এ দৃশ্য কতই না চমৎকার।'

এ জাতীয় কবিতা আমাদের জন্য নয়। কারণ, আমরা দুর্বল। শক্তি নেই, সামর্থ নেই, যোগ্যতাও নেই। সুতরাং দুঃখ-মুসিবত চেয়ে নেয়ার মত স্পর্ধাও নেই। বরং আমাদের কাজ হবে, দুঃখ-মুসিবত দূর হওয়ার জন্য দুআ করা। দু'আর ধরন হবে এরকম যে, হে আল্লাহ! দুঃখ-মুসিবত আপনার নেয়ামত। নিরাপত্তা ও শান্তিও আপনার নেয়ামত। আমরা দুর্বল, তাই আমাদের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রথম নেয়ামতটি গ্রহণ করার মত শক্তি আমাদের নেই। কাজেই এ নেয়ামতের পরিবর্তে নিরাপত্তা, শান্তি ও সুস্থতার নেয়ামত আমাদেরকে দান করুন।

মোটকথা, দুঃখ-মুসিবতের সময় দুআ করতে হবে। হা-পিত্যেস করা যাবে না। এটাই হলো তাকদীরের উপর বিশ্বাস। তাকদীরের উপর তো প্রতিটি মুমিনই বিশ্বাস রাখে। তবে নিজের জীবনকে এ বিশ্বাসের আলোকে সাজিয়ে তোলে খুব অল্পসংখ্যক মানুষ। দুআ করি, আল্লাহ যেন এর আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক আমাদেরকে দান করেন। আমীন।

আল্লাহওয়ালাদের অবস্থা

সুখ-শান্তি ও স্বস্তিতে ভরা আল্লাহওয়ালাদের জীবন নিশ্চয় আপনারা দেখেছেন। দুঃখ-বেদনা ও দুঃশ্চিন্তার মত বিষয়গুলো ছিলো তাদের থেকে অনেক দূরে। কারণ, তারা একথা ভালো করেই আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন যে, যা হওয়ার তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। সুতরাং অহেতুক দুঃশ্চিন্তা করে লাভ কী? আল্লাহর ওলীদের মত এরূপ সবরের জীবন অবলম্বন করুন, দেখবেন, জীবন সুখ-শান্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠবে। কুরআন মজীদে রয়েছে–

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔

'সবরকারীদেরকে অগণিত প্রতিদান দেয়া হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে।'

কেউ বেদনামুক্ত নয়

প্রতিটি মুসিবতের সময় ভাবুন, পৃথিবীটা এমনই। এখানে প্রতিটি মানুষ দুঃশ্চিন্তা বা বেদনায় জর্জরিত। বিত্ত-বৈভবের মালিক, বিশাল ক্ষমতার অধিকারী, পদমর্যাদার মহান মানুষ, আল্লাহওয়ালা, মোটকথা কেউই দুঃখ-বেদনা থেকে মুক্ত নয়। এমনকি নবীরাও নন। কারণ, সুখ-দুঃখ, স্বস্তি-পেরেশানি, বিপদ ও নিরাপত্তা এ দুনিয়াতে হাত ধরাধরি করে চলে। নিরঙ্কুশ শান্তি ও স্বস্তি কারো ভাগ্যে নেই। এসব কথা সার্বজনীন ও চিরসত্য। এমনকি নাস্তিকরাও এসব কথা মানতে বাধ্য।

সুতরাং যখন এটা চূড়ান্ত হয়ে গেলো যে, এ জগতে দুঃখ-কষ্ট আসবেই, তখন প্রশ্ন হলো, কোন ধরনের কষ্ট আসবে আর কোন ধরনের কষ্ট আসবে না? এর একটা পথ হতে পারে যে, নিজেরটা নিজে ফয়সালা করে নেয়া– আমার উপর অমুক মুসিবতটি আসুক আর অমুকটি না আসুক। কিন্তু এ পথ অবলম্বন করা তো সম্ভব নয়। কারণ, এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার শক্তি মানুষের নেই। কোন্ মুসিবতের পরিণাম ভালো আর কোন্ মুসিবতের পরিণাম ভালো নয়, তা যেহেতু মানুষ জানে না তাই কোনো মুসিবত কামনা করা আর কোনোটিকে কামনা না করার যোগ্যতাও মানুষের নেই। অতএব, সিদ্ধান্ত বা ফয়সালার ভার আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। কাজেই আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিয়ে এই দু'আ করুন যে, হে আল্লাহ! আপনার ফয়সালামতে যদি দুঃখ-মুসিবত আসে, তাহলে তার উপর সবর করার তাওফীক আমাকে দান করুন।

ছোট্ট মুসিবত বড় মুসিবতকে হটিয়ে দেয়

দুর্বল মানুষ নিজের বুদ্ধির সীমানায় আবদ্ধ। একটি ছোট্ট মুসিবতে পড়ে সে কাতরিয়ে ওঠে। অথচ তার জানা নেই যে, এ ছোট মুসিবতটি বড় কত মুসিবতকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। জ্বর হলে মানুষ কাতর হয়ে পড়ে। প্রত্যাশিত চাকুরি না পেলে হতাশ হয়ে পড়ে। ঘরের কিছু খোয়া গেলে কষ্ট অনুভব করে। অথচ সে জানে না, এসব মুসিবত তার জন্য বড় নাকি অনাগত মুসিবতটি বড়। কিন্তু সে এটাকেই বড় মনে করে। এটার কথাই আলোচনা করে বেড়ায়। তার তো উচিত ছিলো, এই চিন্তা করা যে, ভালোই হয়েছে, এ ক্ষুদ্র মুসিবতের মাধ্যমে না-জানি আল্লাহ কত বড় মুসবিত থেকে রেহাই দিয়েছেন। এ জাতীয় চিন্তা করলে সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও

আমাদের সান্ত্বনার জন্য আল্লাহর রাসূল (সা.) দুআও শিক্ষা দিয়েছেন- لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ 'আশ্রয়স্থল ও পরিত্রাণের জায়গা তো আল্লাহর রহমতের দরবারই। এছাড়া অন্য কোথাও আশ্রয়স্থল নেই, পরিত্রাণেরও জায়গা নেই।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী (রহ.) একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেমন একজন তীরন্দাজ। বিশাল কামান নিয়ে বসে আছে। কামানটি গোটা পৃথিবীর প্রতিটি খণ্ডের দিকে তাক করে আছে। যেকোনো সময় যেকোনা জায়গাতে ওই কামান থেকে তীর ছুটে আসতে পারে। তীরন্দাজের পক্ষে সম্ভব যে কোনো টার্গেটে আঘাত হানার।

প্রশ্ন হলো, এমন মহান শক্তিধরের তীরের আঘাত থেকে বাঁচার উপায় কী? উপায় একটিই। তাহলো, তীরন্দাজের একেবারে কাছে গিয়ে আশ্রয় নাও। অনুরূপভাবে যাবতীয় বালা-মুসিবতও আল্লাহর তাকদীরের একেকটি তীর। এর আঘাত থেকে বাঁচতে হলে সরাসরি আল্লাহর রহমতের কোলে আশ্রয় নিতে হবে। এ ছাড়া বিকল্প কোনো উপায় নেই। তাই প্রিয়নবী (সা.) উম্মতকে উক্ত দুআ শিক্ষা দিয়েছেন।

একটি অবুঝ শিশু থেকে শিক্ষা নাও

একটি অবুঝ শিশু মায়ের হাতে মার খায়। কিন্তু তখনও সে মায়ের কোলেই আশ্রয় নেয়। মাকে জড়িয়ে ধরে। মায়ের মার খাওয়া সত্ত্বেও সে মায়ের কোলকেই মনে করে নিজের আশ্রয়স্থল। কারণ, শিশুটি জানে, মা

মারছেন ঠিকই, তবে এ থেকে বাঁচার উপায়ও মায়ের কাছেই রয়েছে। আদর, স্নেহ ও মমতার জোয়ার 'মা' নামক ছোট্ট কথাটিতেই রয়েছে।

অনুরূপভাবে যদিও আল্লাহ বিপদ দেন, কিন্তু তিনিই তো আমাদের রব। তাঁর রহমতের কোলে আশ্রয় নেয়া ছাড়া বিপদ থেকে মুক্তির দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। সুতরাং বিপদের মুহূর্তেও আশ্রয়স্থল মনে করতে হবে তাঁকেই। একেই বলে তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহ তাআলা আমাদের কাঙ্ক্ষিত রহমত দান করুন। আমীন।

আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকার সফলতার নিদর্শন

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন–

إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِعَبْدٍ خَيْرًا أَرْضَاهُ بِمَا قَسَمَ لَهُ وَبَارَكَ لَهُ فِيْهِ،

وَإِذَا لَمْ يُرِدْ بِهٖ خَيْرًا لَمْ يُرْضِهٖ بِمَا قَسَمَ لَهُ وَلَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِيْهِ-

আল্লাহ যখন কোনো বান্দার জন্য কল্যাণ চান, তখন তাকে নিজ তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট করে দেন এবং এরই মাঝে তার জন্যে বরকত দান করেন। পক্ষান্তরে যখন তিনি কোনো বান্দার জন্য মঙ্গল কামনা করেন না, তখন তাকে নিজ তাকদীরের উপর অসন্তুষ্ট করে দেন এবং এর মাঝে বরকত দান করেন না।

এ হাদীস থেকে এ শিক্ষা পেলাম যে, তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা আল্লাহর কল্যাণকামিতারই নিদর্শন। এভাবেই মানুষ কামিয়াব হয় এবং আল্লাহর বরকত লাভে ধন্য হয়।

বরকতের মর্মার্থ

সংখ্যাধিক্য গণনার পেছনে আমরা আজ ঘুরপাক খাচ্ছি। কেউ বলে, আমি এক হাজার টাকা উপার্জন করি। কেউ বলে, আমি দু'হাজার টাকা কামাই। অপরজনের দাবী হলো, মাস প্রতি দশ হাজার টাকা উপার্জন করা তো আমার জন্য সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু কেউই এই চিন্তা করে না যে, সুখ-শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার দৌলত তার কপালে জুটেছে কিনা। আসলে সুখ টাকায় কেনা যায় না। একজন উপার্জন করে প্রতি মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিন্তু তার ঘরে সুখ নেই। বলুন, টাকার এ আধিক্যের তখন কী-ই বা মূল্য আছে? আরেকজন এক হাজার টাকা উপার্জন করে, তার ঘরে সুখও আছে। একেই বলে বরকত। বরকত কেনা যায় না; বরং চেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে।

এক নবাবের ঘটনা

ঘটনাটি লিখেছেন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)। এক নবাবের ঘটনা। লাখনৌতে থাকতেন তিনি। জায়গা-জমি, চাকর-নওকরসহ কোনো কিছুর অভাব ছিলো না তাঁর। একবার তার সঙ্গে আমার দেখা হলো। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত কণ্ঠে আমাকে জানালেন, এই যে আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন যে, ধন-দৌলত, অর্থ-কড়ি এ সবই আমার। কোনো কিছুর অভাব নেই। কিন্তু এরপরেও আমি অসুখী। কারণ, চিকিৎসক আমাকে সুস্বাদু খাবার খেতে নিষেধ করেছেন। শুধু একটি খাবারের অনুমতি দিয়েছেন। গোশতের কিমা কাপড়ে বেধে চিবিয়ে তার রস বের করে চামচে করে শুধু সেই রসটুকু খাওয়ার অনুমতি আমি পেয়েছি।

দেখুন, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য নবাব সাহেব শুধু চোখেই দেখছেন, ভোগ করতে পারছেন না। অপরদিকে একজন দিনমজুর, দিন এনে দিন খায়, শাক-সবজি দিয়ে পেট ভরে খায়। তারপর দিব্যি আরামে ঘুমায়। বলুন, কে সুখী– নবাব সাহেব না দিনমজুর? একেই বলে বরকত। নবাবের বেলায় যা জোটেনি, দিনমজুরের ভাগ্যে তা জুটেছে।

তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাক

আল্লাহ বলেন, যে বান্দা তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকবে, আমি তাকে বরকত দান করবো। তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হাত গুটিয়ে বসে থাকা নয়। বরং চেষ্টা করবে, এরপর যা মিলবে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে– এরই নাম তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা। এর দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত আসে। পক্ষান্তরে তাকদীরের উপর অসন্তুষ্ট হলে, প্রাপ্ত নেয়ামতের উপর শোকর আদায় না করলে, আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। না পাওয়ার বেদনায় যদি আহত হও, তাহলে কী ফায়দা! কারণ, যা তোমার ভাগ্যে আছে, সেটাই তুমি পাবে, তোমার কান্নাকাটি আর হা-পিত্যেসের কারণে অবস্থার পরিবর্তন হবে না। যা হবে, তাহলো, আল্লাহর বরকত চলে যাবে। সুতরাং তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকাটাই শ্রেয়।

আমার পেয়ালা নিয়েই আমি সন্তুষ্ট

ধন-সম্পদ, চাকুরি, টাকা-পয়সা, সুস্থতা-সৌন্দর্য– এসবই আল্লাহর নেয়ামত। যে নেয়ামতই তোমার ভাগ্যে জুটবে, সেটার উপরই সন্তুষ্ট থাক। আর এটা ভাবো যে, আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা-ই আমার জন্য উত্তম। এ প্রসঙ্গে ডা. আব্দুল হাই (রহ.) চমৎকার একটি কবিতা বলতেন–

مجھکو اس سے کیا غرض جام میں ہے کتنی مے

میرے پیمانے میں لیکن حاصل میخانہ ہے

'অপরের পেয়ালা উপচানো- এতে আমার কী আসে যায়। আমার পেয়ালার পানীয়টুকুই আমার জন্য যথেষ্ট।

সুতরাং লাখপতি বা কোটিপতিকে দেখে আফসোস করার কিছুই নেই। তার ভাগ্যে যা আছে, তা সে পাবেই। অপরের ধন-সম্পদ দেখে নিজের মনকে অশান্ত করে তোলার কোনো অর্থ নেই। নিজের তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকার মাঝেই রয়েছে শান্তি ও স্বস্তি। আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা নিয়েই তুষ্ট থাকবে। এ পথেই শান্তি পাবে। কষ্ট ও বেদনা দূর হবে। অল্পেতুষ্টি নসিব হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন সুন্দর ফিকির দান করুন এবং এর দ্বারা নিজের অবস্থাকে সমৃদ্ধ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

ফেতনার যুগ : চেনার উপায় ও বাঁচার কৌশল

"রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার উদাহরণ যেন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো। সেই আগুন বিশাল এলাকাকে আলোকিত করে তুললো। আলোর এ নাচন দেখে কীট-পতঙ্গগুলো ধোঁকায় পড়ে গেলো। তারা এর মাঝে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়তে লাগলো। আর যে ব্যক্তি আগুন জ্বালিয়েছিলো, সে এ কীট-পতঙ্গগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। অনুরূপভাবে আমিও তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাধা দিচ্ছি। তবুও তোমরা জাহান্নামের পাড়ে চলে যাচ্ছো।"

মূলত এমনই ছিলো আমাদের নবীজী (সা.) এর ফিকির ও দরদ। এ ফিকির শুধু তাঁর যামানার লোকদের জন্য ছিলো না, ছিলো সব যুগের সব মানুষের জন্য- বর্তমানের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য এবং ফেতনার যুগের জন্যও।"

ফেতনার যুগ : চেনার উপায় ও বাঁচার কৌশল

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًاكَثِيْرًا ـ اَمَّابَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ (سورة المائدة ، ايت ـ ٥)

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اِذَارَاَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبِعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَاِعْجَابَ كُلِّ ذِىْ رَاىٍ بِرَايِهٖ ـ فَعَلَيْكَ يَعْنِىْ نَفْسَكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَّامَ ـ (ابوداود ، كتاب الملاحم ، باب الامر والنهي)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

হামদ ও সালাতের পর!

রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মতের জন্য তাঁর শিক্ষামালা রেখে গিয়েছেন। আজ তা থেকে এমন এক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবো, যার প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে তীব্র; অথচ এ সম্পর্কে আলোচনা খুব একটা হয় না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) শেষ নবী। নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা তাঁর পর্যন্ত এসে পূর্ণতা লাভ করেছে। তিনি অন্যান্য নবীর মত এলাকাভিত্তিক বা যুগভিত্তিক বা জাতিভিত্তিক নবী নন। বরং তিনি সর্বকালের নবী, বিশ্বনবী। এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র তাঁর। যেমন মূসা (আ.) মিসরের বনী-ইসরাঈলের নবী ছিলেন। এর বাইরে তাঁর নবুওয়াতের পরিধি ছিলো না। কিন্তু আমাদের রাসূল (সা.) এমন নন। তাঁর নবুওয়াত ব্যাপক। তিনি বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত মহান নবী। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ পাক বলেছেন–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا۔

'আমি আপনাকে গোটা মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি।' (সূরা সাবা ২৮)

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) শুধু আরবের নবী ছিলেন না বা শুধু একটি নির্দিষ্ট যুগের নবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন গোটা বিশ্বের নবী। কেয়ামত পর্যন্ত অনাগত সকল জাতির নবী। বর্তমান ও ভবিষ্যত জাতিসমূহেরও নবী। সর্বকালের জন্য সব জাতির জন্য রাসূল হিসাবে আল্লাহ তাঁকেই পাঠিয়েছেন আর কাউকে নয়।

পরিস্থিতি সম্পর্কে আগাম সতর্কবাণী

বোঝা গেলো, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা ও তাঁর নির্দেশিত বিধিবিধান কেয়ামত পর্যন্ত কার্যকর। তাঁর শিক্ষামালা নির্দিষ্ট যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। আমাদের জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে তাঁর শিক্ষা ও নির্দেশনা অপরিহার্য। তাঁর শিক্ষামালা দু'প্রকার। প্রথম ভাগে রয়েছে, শরীয়তের বিস্তারিত বিবরণ। অর্থাৎ– হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব ইত্যাদির বিবরণ। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে ভবিষ্যতে উম্মতের মাঝে যেসব ঘটনা ঘটবে এবং উম্মত যে সকল পরিস্থিতি ও দুর্ঘটনার শিকার হবে, সেসব প্রেক্ষাপটের বিবরণ এবং তা থেকে উত্তরণের সঠিক পথ নির্দেশ।

দ্বিতীয়ভাগের শিক্ষামালাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এগুলো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দূরদর্শিতার প্রমাণ। ভবিষ্যতের ঘটনাগুলো কী হতে পারে এবং সে পরিস্থিতিতে সত্যানুসন্ধানীরা কোন পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করবে– এ সব প্রশ্নেরই উত্তর রয়েছে তাঁর দ্বিতীয়ভাগের শিক্ষামালাতে। আজ এ প্রসঙ্গে কিছু কথা আপনাদের সামনে আরয করতে চাই।

উম্মতের মুক্তির চিন্তা

উম্মতের জন্য দরদ ও ফিকির সর্বদা কাজ করতো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মাঝে। যেমন এক হাদীসে এসেছে—

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِمَ الْفِكْرَةِ مُتَوَاصِلَ الْاَحْزَانِ-

'আল্লাহর রাসূল (সা.) সব সময় চিন্তিত ও পেরেশান থাকতেন।'

কিসের এ চিন্তা, কিসের এ পেরেশানি? টাকার জন্য? না শান-শওকত বৃদ্ধির জন্য? এ পেরেশানি তো শুধু এজন্য ছিলো যে, যে জাতির কাছে তিনি প্রেরিত হয়েছেন, সে জাতিকে কিভাবে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন, কিভাবে বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে তাদেরকে সরল পথে দাঁড় করাবেন। তাঁর এ জাতীয় চিন্তার চিত্র কুরআন মজীদের একাধিক আয়াতে ফুটে উঠেছে। যেমন এক আয়াতে এসেছে—

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ-

'এরা মুমিন না হলে মনে হয় আপনি নিজেকে মৃত্যুর কোলে নিয়ে যাবেন।'

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার উদাহরণ যেন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো। সে অগ্নিকুণ্ডলি বিশাল এলাকাকে আলোকিত করে তুললো। আলোর এ নাচন দেখে কীট-পতঙ্গগুলো ধোঁকায় পড়ে গেলো। তারা এর মাঝে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়তে লাগলো। আর যে ব্যক্তি আগুন জ্বালালো, সে এসব কীট-পতঙ্গকে বাঁচানোর চেষ্টা শুরু করলো। অনুরূপভাবে আমিও তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি এবং তোমাদের কোমর ধরে ধরে তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাধা দিচ্ছি। তবুও তোমরা জাহান্নামের পাড়ে চলে যাচ্ছ।

এটি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ফিকির ও দরদ। এ ফিকির শুধু তাঁর যামানার লোকদের জন্য ছিলো না। এ ফিকির ছিলো সবযুগের সব মানুষের জন্য— বর্তমানের জন্য এবং ভবিষ্যতের জন্যও।

ভবিষ্যতে যেসব ফেতান দেখা দিবে

হাদীসের প্রায় প্রতিটি কিতাবেই ফিতনাসমূহের আলোচনার জন্য পৃথক অধ্যায় রাখা হয়েছে। এ বিষয়ের উপর হাদীসমূহের এক বিশাল সংকলন রয়েছে। সেসব হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) অনাগত ফেতনাসমূহ সম্পর্কে

উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন। সব ধরনের ফেতনার যাবতীয় দিক সম্পর্কে উম্মতকে অবহিত করেছেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে উম্মতের জন্য করণীয় কী, তাও তিনি বলে দিয়েছেন। যেমন এক হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেন–

تَقَعُ الْفِتَنُ فِيْ بُيُوْتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ۔

'বৃষ্টির বিরামহীন ফোঁটার মত ফেতনাও তোমাদের ঘরে ঘরে পড়তে থাকবে।'

অর্থাৎ– বৃষ্টির ফোঁটা যেমন অসংখ্য, অনুরূপভাবে ফেতনাও হবে ব্যাপক এবং বৃষ্টির ফোঁটা যেমনিভাবে বিরামহীনভাবে পড়ে, অনুরূপভাবে ফেতনাও আসবে বিরামহীন।

অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন–

سَتَكُوْنُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ۔

'রাতের অন্ধকারের টুকরোর মতো তমসাচ্ছন্ন ফেতনা অচিরেই আসবে।'

অর্থাৎ– অন্ধকার রাতে পথিক যেমনিভাবে পথের দিশা পায় না, তেমনিভাবে ফেতনার যুগে মানুষ তাদের করণীয় খুঁজে পাবে না। ফেতনা সমাজ ও পরিবেশকে অন্ধকার চাদরের মত ঘিরে ফেলবে। মানুষ দিশেহারা হয়ে যাবে। পথ খুঁজে পাবে না। রাসূল (সা.) বলেন, এ জাতীয় ফেতনা থেকে মুক্তির জন্য এভাবে দুআ কর–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔

'হে আল্লাহ! দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকল ফেতনা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

ফেতনা কাকে বলে?

আমরা প্রায় বলে থাকি, এ যুগ ফেতনার যুগ। কুরআন মজীদেও 'ফেতনা' শব্দটি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আয়াত– اَلْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ফেতনা হত্যার চেয়েও মারাত্মক। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ফেতনা কাকে বলে এবং ফেতনার যুগে আমাদের করণীয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনা কী?

'ফেতনা' শব্দটি আরবী, যার আভিধানিক অর্থ হলো স্বর্ণকে আগুনে উত্তপ্ত করা। ভেজাল-নির্ভেজাল যাচাই করা। এ কাজ দ্বারা যেহেতু স্বর্ণকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাই প্রত্যেক পরীক্ষাকে ফেতনা বলা হয়। মানুষ দুঃখ-বিপদে পড়লে তার ভেতরগত অবস্থা কেমন হয়– এ সময়ে সে কোন পথ

অবলম্বন করে– ধৈর্যের না হা-পিত্যেসের? অনুগতদের পথ না অকৃতজ্ঞদের পথ? এ ধরনের পরীক্ষাকেও ফেতনা বলা হয়।

হাদীসে শব্দটি যে অর্থে এসেছে

হাদীসে ফেতনা শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা হলো, ওই পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে ফেতনা বলে, যখন মানুষ সত্য ও মিথ্যার মাঝে তালগোল পাকিয়ে ফেলে। অর্থাৎ– সঠিক কোনটি আর ভুল কোনটি এবং হক কোনটি আর বাতিল কোনটি– এ পার্থক্য নির্ণয়ে যখন মানুষ ব্যর্থ হয়, তখন তাকে ফেতনা বলা হয়। যে যুগে এ করুণ অবস্থাটা প্রকট হয়, সে যুগকে বলা হয় ফেতনার যুগ।

অনুরূপভাবে অন্যায়-অশ্লীলতা, অবৈধতা, হঠকারিতাসহ যাবতীয় গুনাহ যখন সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তাকেও ফেতনা বলা হয়। যেমন বর্তমানের অবস্থা হলো, যদি কাউকে বলা হয়, অমুক কাজটি গুনাহ, তখনই সে পাল্টা উত্তর দিয়ে দেয়, এ কাজটি তো সবাই করে। কাজটা যদি হারাম হতো, তাহলে গোটা দুনিয়ার মানুষ নিশ্চয় করতো না। তাছাড়া এটা তো সৌদি আররবেও দেখেছি। বর্তমানে সৌদি আরবও স্বতন্ত্র দলীল হিসাবে অনেকের কাছ থেকে শোনা যায়। মনে হয় যেন সৌদি আরবের সব কাজ সঠিক। মনে রাখবেন, এটাও একপ্রকার ফেতনা। সত্যের দলীল হিসাবে পেশ করার উপযুক্ত নয়– এমন বিষয়কে দলীল হিসাবে পেশ করাও একপ্রকার ফেতনা। অনুরূপভাবে আজকাল বিভিন্ন রকম দল-উপদল দেখা যায়। বলা কঠিন হয়ে পড়েছে যে, কোন দলটি হক আর কোনটি বাতিল– কোনটি সঠিক আর কোনটি গলদ? অর্থাৎ হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা বর্তমানে কঠিন হয়ে গিয়েছে। এটাও ফেতনা।

দুই দলের কোন্দল ফেতনা

মুসলমানদের মধ্য থেকে দু'টি ভিন্ন দল যদি কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে এবং একদল অপরদলের খুনপিয়াসী হয়, কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা– এটা নির্ণয় করারও কোনো পথ না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে এটাও ফেতনা। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ كِلَاهُمَا فِى النَّارِ-

যখন দুইজন মুসলমান পরস্পরে লড়াইতে জড়িয়ে পড়বে, তখন ঘাতক ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামে যাবে।

এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঘাতক যেহেতু হত্যাকারী, তাই সে জাহান্নামে যাবে– এটা তো যুক্তিসঙ্গত কথা; কিন্তু নিহত

ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে কেন? রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন, নিহত ব্যক্তি জাহান্নামের যাবে তার কারণ, সেও তো হত্যা করার উদ্দেশ্যেই তরবারি বের করেছিলো। শক্তির এ লড়াইয়ে হত্যাকারী সফল হয়েছে, তাই সে হত্যা করেছে। আর নিহত ব্যক্তি হেরে গেছে, তাই সে নিহত হয়েছে। অন্যথায় বস্তুত উভয়ই দোষী। পার্থিব স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে, যেমন ধন-সম্পদের লোভে বা রাজনৈতিক স্বার্থে তারা লড়াই করেছিলো। তাদের একজনও আল্লাহর জন্য লড়াই করেনি। একজন অপরজনের খুনপিয়াসী ছিলো শুধু জাগতিক কারণে। তাই উভয়েই জাহান্নামে যাবে।

হত্যা-অরাজকতাও ফেতনা

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

اِنَّ مِنْ وَّرَا ئِكُمْ اَيَّامًا يُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرَجُ , قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَاالْهَرَجُ ؟ قَالَ : اَلْقَتْلُ (ترمذى)

'তোমাদের পরে এমন এক যামানা আসবে, যখন ইলম তুলে নেয়া হবে এবং ব্যাপকভাবে 'হারাজ' হবে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'হারাজ' কি? তিনি বললেন, হত্যাযজ্ঞ। অর্থাৎ ওই যামানায় মানুষের প্রাণের মূল্য মশা-মাছির প্রাণের মূল্যের সমানও মনে করা হবে না। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَايَدْرِى اَلْقَاتِلُ فِيْمَ قَتِلَ ، وَلَا الْمَقْتُوْلُ فِيْمَ قُتِلَ فَقِيْلَ : كَيْفَ يَكُوْنُ ذَالِكَ؟ قَالَ : اَلْهَرَجُ، اَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ كِلَاهُمَا فِى النَّارِ- (صحيح مسلم)

'মানুষ এমন এক যামানার মুখোমুখী হবে, যখন হত্যাকারী কেন হত্যা করে তা জানবে না। নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে, তাকে কেন হত্যা করা হয়েছে। প্রশ্ন করা হলো, এটা কিভাবে হবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন, হারাজের তাড়নায়। হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী।'

উল্লিখিত হাদীসদ্বয়কে সামনে রেখে বর্তমান যমানাকে যাচাই করুন। মনে হবে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অন্তর্দৃষ্টি আজকের পরিবেশকে প্রত্যক্ষ করছে।

মক্কা শরীফ সম্পর্কে একটি হাদীস

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন–

إِذَا رُعِيَتْ كَظَائِمُ وَسَاوَى اَبْنِيَتُهَا رُؤُوْسَ الْجِبَالِ فَعِنْدَ ذَالِكَ اَزِفَ الْاَمْرُ-

'যখন দেখবে, পবিত্র মক্কার পেট চিরে নদীর মতো পথ বানানো হয়েছে এবং মক্কার ভবনসমূহ পাহাড়ের চূড়ার মত উঁচু হয়ে গিয়েছে, তখন বুঝে নিবে, ফেতনার যামানা চলে এসেছে।'

হাদীসটি শত শত বছর ধরে হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়ে আসছে। কিন্তু হাদীস বিশারদগণ এর মর্ম উদ্ধারে রীতিমত হিমশিম খেয়েছেন যে, পবিত্র মক্কার পেট চেরার অর্থ কী? তার পেট চিরে নদীর মত পথ কিভাবে বানানো হবে? কিন্তু বর্তমানে যে ব্যক্তিই পবিত্র মক্কার যিয়ারতের সুযোগ লাভ করেছে, সেই দেখতে পায় যে, পবিত্র মক্কার পাহাড়ের পেট চিরে কত ভূগর্ভস্থ পথ ও সুড়ং তৈরি করা হয়েছে। মক্কার ভেতরে এসব সুড়ঙ্গপথ আজ জালের মত বিস্তৃত। নদীর মত পরিচ্ছন্ন পথ ও সুড়ঙ্গ দিয়ে আজ কীভাবে গাড়িসমূহ ধেয়ে চলে। তাছাড়া মক্কার ভবনগুলো যে পাহাড়ের চূড়া পরিমাণ উঁচু হয়েছে শুধু তাই নয়, বরং কোনো কোনো জায়গায় পাহাড়ের চূড়াও অতিক্রম করে গেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন এক যুগে এ হাদীসটি বলেছিলেন, যখন ভূগর্ভস্থ পথের কল্পনাও কেউ করেনি। মানুষের তৈরি ভবনগুলো পাহাড়ের চূড়ার সমান হতে পারে– এ ধারণাও সে যুগে কেউ করেনি। এমনি এক পরিবেশে এমন দৃঢ়তার সঙ্গে এরূপ অকল্পনীয় কথা কেবল তিনিই বলতে পারেন, যিনি সত্য নবী এবং যাঁর দূরদৃষ্টি স্থানকালের সীমানাকেও অতিক্রম করেছে।

হাদীসের আলোকে বর্তমান যুগ

এসব ফেতনা সম্পর্কে যেসব হাদীসে আলোকপাত করা হয়েছে, সেগুলো প্রত্যেক মুসলমানদের জেনে রাখা প্রয়োজন। মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী সাহেব 'হাদীসের আলোকে বর্তমান যুগ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে এ সংক্রান্ত সকল হাদীস সংকলন করার চেষ্টা করেছেন তিনি। সেখানে একটি হাদীস তিনি এনেছেন, যে হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ফেতনার যুগ সম্পর্কে বাহাত্তরটি বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন, যেগুলো একের পর এক প্রকাশ পাবে। এগুলোকে সামনে রেখে এর আলোকে বর্তমান যুগের পরিবেশ ও পরিস্থিতি যাচাই করলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আমরা কোন যুগে বাস করছি।

ফেতনার বাহাত্তরটি নিদর্শন

হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের পূর্ববর্তী সময়ে বাহাত্তরটি বিষয় সংঘটিত হবে–

১. লোকেরা নামাযের ব্যাপারে অবহেলা করবে। বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ নামাযের ব্যাপারে গাফলতি করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে এটা ছিলো অকল্পনীয় বিষয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাযকে ঈমান ও কুফরের সাথে পার্থক্যকারী বিষয় হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। এজন্য দেখা যায়, ইসলামের সোনালী যুগে মানুষ যত বড় পাপিষ্ঠই হোক না কেন, তবুও তারা নামাযের ব্যাপারে অবহেলা করার কল্পনাও করতে পারতো না।

২. আমানত নষ্ট করা শুরু করবে। অর্থাৎ– আমানতে খেয়ানত করা আরম্ভ করবে।

৩. সুদ খাবে।

৪. মিথ্যাকে হালাল মনে করবে। অর্থাৎ– মিথ্যা বলাটা একটা শিল্পে পরিণত হবে।

৫. ছোট ও সাধারণ বিষয়েও খুনাখুনি আরম্ব করবে।

৬. উঁচু উঁচু ভবন তৈরি করবে।

৭. দ্বীন-ধর্ম বিক্রি করে দুনিয়া উপার্জন করবে।

৮. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। অর্থাৎ– মানুষ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার আরম্ভ করবে।

৯. ন্যায়বিচার একেবারে কমে যাবে।

১০. মিথ্যা সত্যে পরিণত হবে।

১১. রেশমের পোশাক পরিধান করবে।

১২. অত্যাচার ব্যাপকতা লাভ করবে।

১৩. তালাকের ঘটনা অধিকহারে ঘটবে।

১৪. আকস্মিক মৃত্যু ব্যাপকভাবে দেখা দিবে। অর্থাৎ– ক্ষণিকপূর্বের সুস্থ-সবল মানুষটি সম্পর্কেও মানুষ সংবাদ পাবে যে, সে মৃত্যুবরণ করেছে।

১৫. খেয়ানতকারীদেরকে বিশ্বস্ত মনে করা হবে।

১৬. আমানতদার ব্যক্তিকে খেয়ানতকারী মনে করা হবে। অর্থাৎ– বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপর খেয়ানতের অপবাদ দেয়া হবে।

১৭. মিথ্যাকে সত্য মনে করা হবে।

১৮. সত্যকে মিথ্যা আখ্যা দেয়া হবে।

১৯. অপবাদ দেয়া ব্যাপক হবে। অর্থাৎ– লোকেরা পরস্পরকে মিথ্যা অপবাদ অধিকহারে দিবে।

২০. বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও উত্তাপ থাকবে।

২১. লোকেরা সন্তান-সন্ততি কামনা করার পরিবর্তে সন্তান না হওয়ার কামনা করবে। অর্থাৎ– আগেকার যুগের মত সন্তানাদির জন্য দুআ করা হবে না; বরং জন্মনিয়ন্ত্রণের হার বেড়ে যাবে। যেমন– বর্তমানে স্লোগান দেয়া হয়– ছেলে হোক মেয়ে হোক দু'টি সন্তানই যথেষ্ট।

২২. নিচু ও অসভ্যদের চলাফেরা খুব জাঁকালো হবে।

২৩. সভ্য মানুষের দাম কমে যাবে।

২৪. মিথ্যা বলা নেতা-মন্ত্রীদের অভ্যাসে পরিণত হবে এবং দিন-রাত শুধু মিথ্যাকে কপচাবে।

২৫. বিশ্বস্ত লোকও খেয়ানত শুরু করে দিবে।

২৬. নেতা প্রকৃতির লোকেরা যুলুমের আশ্রয় নিবে।

২৭. আলেম ও কারী বদকার হবে।

২৮. লোকেরা পশু-পাখির চামড়ার পোশাক পরিধান করবে।

২৯. কিন্তু তাদের অন্তর লাশের চেয়েও দুর্গন্ধযুক্ত হবে। অর্থাৎ– লোকেরা পশুর চামড়া দ্বারা তৈরি উন্নত পোশাক পরিধান করে ফিটফাটভাবে চলাফেরা করবে; কিন্তু তাদের অন্তর হবে গলিত লাশের চেয়েও দুর্গন্ধযুক্ত। এবং

৩০. খুব তিক্ত হবে।

৩১. স্বর্ণের ব্যবহার বেড়ে যাবে।

৩২. রুপার দাম বেড়ে যাবে।

৩৩. গুনাহ ব্যাপক হবে।

৩৪. নিরাপত্তা হ্রাস পাবে।

৩৫. কুরআন মজীদের কপিসমূহ সুসজ্জিত করা হবে এবং বিভিন্ন কারুকার্যময় করা হবে।

৩৬. সুন্দর সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করা হবে।

৩৭. উঁচু উঁচু মিনার তৈরি করা হবে।

৩৮. কিন্তু মানুষের অন্তর অনাবাদ হবে।

৩৯. মদ পান করা হবে।

৪০. ইসলামের দণ্ডবিধি অকার্যকর করে দেয়া হবে।

৪১. বাঁদী নিজ মনিবকে জন্ম দিবে। অর্থাৎ– ছেলে মেয়ে নিজেদের মায়ের সঙ্গে চাকরানীর মত ব্যবহার করবে।

৪২. যাদের পায়ে জুতা ছিলো না, গায়ে বস্ত্র ছিলো না, অসভ্য ছিলো তারা বাদশাহ বনে যাবে। অসভ্য ও অভদ্র লোকেরা সমাজের নেতৃত্ব হাতে নিয়ে নিবে।

৪৩. নারী পুরুষের সাজে সাজবে।

৪৪. পুরুষ নারীর সাজে সাজবে।

৪৫. ব্যবসা-বাণিজ্যে নারীরা পুরুষদের সঙ্গী হবে।

৪৬. গাইরুল্লাহর নামে কসমের প্রচলন হবে। যেমন বর্তমানে বলা হয়, তোমার মাথার কসম ইত্যাদি।

৪৭. মুসলমানরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। 'ও' শব্দ যুক্ত করার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, মিথ্যার সঙ্গে যুক্ত থাকা তো অন্য জাতির কাজ; কিন্তু কেয়ামতের পূর্বে এ কাজটি মুসলমানরাও করবে।

৪৮. শুধু পরিচিত লোককে সালাম দিবে। অর্থাৎ পথচলাকালীন শুধু পরিচিত লোককে দেখলে সালাম দিবে এবং অপরিচিত লোককে সালাম দিবে না। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষা হলো–

اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

অর্থাৎ চেনা-অচেনা সকলকেই সালাম দিবে।

৪৯. দুনিয়ার জন্য ইসলামের ইলম শিখবে। অর্থাৎ সার্টিফিকেট, ডিগ্রি, চাকুরি, পদ, প্রসিদ্ধি ইত্যাদি লাভের উদ্দেশ্যে ইলমে-দ্বীন শিখবে।

৫০. আখেরাতের কাজ দ্বারা দুনিয়া কামাবে।

৫১. গনীমতের সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করবে। গনীমতের সম্পদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাতীয় সম্পদ।

৫২. আমানতের সম্পদকে লুটের সম্পদ মনে করা হবে।

৫৩. যাকাতকে জরিমানা মনে করবে।

৫৪. জাতির মধ্যে সব অসৎ চরিত্রের অধিকারী লোক জাতির নেতা বনে যাবে।

৫৫. মানুষ নিজ পিতার নাফরমানি করবে।

৫৬. মানুষ নিজ মায়ের সঙ্গে খারাপ আচরণ করবে।

৫৭. বন্ধুর ক্ষতি করার ব্যাপারে কোনো পরওয়া করবে না।

৫৮. স্ত্রীর আনুগত্য করবে।

৫৯. দুষ্ট লোকদের আওয়াজ মসজিদের মধ্যে উঁচু হবে।

৬০. গায়িকাদের প্রতি সম্মান দেখানো হবে।

৬১. গানের যন্ত্রাদি ও বাদ্যযন্ত্র মানুষ যত্নসহকারে রাখবে।

৬২. প্রকাশ্যে মদ পান করা হবে।

৬৩. যুলুমকে গর্বের বিষয় মনে করা হবে।

৬৪. বিচার বেচাকেনা হবে। মানুষ পয়সা দিয়ে আইন বেচাকেনা করবে।

৬৫. পুলিশ বাহিনীর সংখ্যা বেড়ে যাবে।

৬৬. কুরআন মজীদকে গানের বস্তু মনে করা হবে। অর্থাৎ গানের পরিবর্তে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা হবে। এতে গানের মজা লাভ করা উদ্দেশ্য হবে। কুরআন মজীদকে দাওয়াতের বিষয়, তেলাওয়াতের বিষয় ও অনুধাবনের বিষয় মনে করা হবে না।

৬৭. মানুষ হিংস্রপ্রাণীর চামড়া ব্যবহার করবে।

৬৮. উম্মতের শেষ দিকের লোকেরা প্রথম দিককার মানুষদেরকে তিরস্কার ও অভিসম্পাত করবে। তাদেরকে বিশ্বস্ত মনে করবে না, বরং তাদের বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি বের করার অন্বেষায় থাকবে। যেমন– বর্তমানের বিশাল একটি দল সাহাবায়ে কেরামদের কটাক্ষ করে। অনেকে মাযহাবের ইমামগণকে কটাক্ষ করে কথা বলে। অথচ এঁদের মাধ্যমে আমরা দ্বীন পেয়েছি। যাঁদেরকে বাদ দিলে দ্বীনের সবকিছুই নড়বড়ে হয়ে যায়, আজ তাঁদেরকেই নির্বোধ ভাবা হয়।

উক্ত নিদর্শনগুলো উল্লেখ করার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যখন এসব নিদর্শন প্রকাশ পাবে, তখন এ অপেক্ষা করবে যে, হয়ত

৬৯. তোমাদের উপর লাল ঘূর্ণিঝড় আল্লাহর পক্ষ থেকে চলে আসবে। অথবা–

৭০. ভূমিকম্প আসবে। অথবা–

৭১. লোকদের চেহারা বিগড়ে যাবে। অথবা–

৭২. আসমান থেকে পাথর-বৃষ্টি আসবে কিংবা আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্য কোনো আযাব আসবে। 'নাউযুবিল্লাহ'!

এবার আমাদের বর্তমান সমাজের চিত্র ও উল্লিখিত হাদীসের একেকটি কথাকে পাশাপাশি রাখুন, তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে, এ হাদীসে যেসবের উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রতিটি বিষয় বর্তমান সমাজে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। মূলত বর্তমানে যেসব আযাবের মাঝে আমরা জর্জরিত রয়েছি, এর একমাত্র কারণ আমাদের এসব বদআমল।

বিপদ-আপদের পাহাড় ধসে পড়বে

এক হাদীসে হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন আমার উম্মতের মাঝে পনেরটি কাজ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে, তখন তাদের উপর মুসিবতের পাহাড় ধসে পড়বে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওই পনেরটি কাজ কী কী? রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন–

জাতীয় সম্পদের চোর কে?

(১) যখন সরকারী সম্পদকে লোকেরা লুটের মাল মনে করবে। দেখুন, জাতীয় সম্পদ অক্ষত অবস্থায় থাকার কল্পনা বর্তমানে কেউ করে কি? বর্তমানে প্রশাসনের লোকজন তো রাষ্ট্রের সম্পদকে মনে করে লুটের সম্পদ। যেখানে যেভাবে পায়, সেখানেই বসিয়ে দেয় নিজের চোরা থাবা। বর্তমানে এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ পিছিয়ে নেই। অনেক ক্ষেত্রে তো চুরিকে চুরিই মনে করা হয় না। এ নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না। যেমন, অবৈধভাবে বিদ্যুতের লাইন ব্যবহার করা জাতীয় সম্পদের চুরির অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে টেলিবিভাগের কর্মকর্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে যদি কেউ অবৈধভাবে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করে, তাহলে এটাও চুরি ধরা হবে। অথবা যদি কেউ সাধারণ টিকেট কেটে ভি.আইপি. কক্ষে গিয়ে নিজের আসন তৈরি করে নেয়, তাহলে এটাও চুরির শামিল হবে। অথচ এসব নিয়ে যেন আমাদের মাথাব্যথা নেই।

এটা মারাত্মক চুরি

রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরি করা এটা সাধারণ চুরির চেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক। কেননা, ব্যক্তির সম্পদ চুরি করলে পরবর্তীতে তাওবা করার ইচ্ছা হলে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে চাইলে দেয়া সম্ভব। যার মাল চুরি করা হয়েছে, ক্ষতিপূরণ দিয়ে তার কাছে মাফ চেয়ে নিলে 'ইনশাআল্লাহ' এটা মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সম্পদের মালিক তো জনগণ। একেকটি সম্পদের মালিক লক্ষ-কোটি মানুষ। সুতরাং পরবর্তী সময়ে তাওবার ইচ্ছা জাগলেও এটা মাফ করানো এক কঠিন ব্যাপার। কারণ, কতজনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে? যতক্ষণ পর্যন্ত এ লক্ষ-কোটি মানুষ মাফ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত চুরির গুনাহ মাফ হবে না। সুতরাং রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরি সাধারণ কোনো চুরি নয়। এটা আরো জঘন্য ও মারাত্মক চুরি।

২. যখন মানুষ আমানতকে লুটের মাল মনে করবে আর তাই আমানতের খেয়ানত শুরু করে দিবে।

৩. যখন যাকাতের মালকে মানুষ নিজের জন্য জরিমানা মনে করবে।

৪. স্বামী যখন স্ত্রীর অনুগত হবে আর মায়ের নাফরমানি শুরু করবে। অর্থাৎ– মানুষ যখন স্ত্রীকে খুশি করার জন্য মায়ের সঙ্গে অসদাচরণ করবে। যেমন– স্ত্রী এমন কাজের প্রতি আহ্বান জানালো, যেটি করলে মায়ের সঙ্গে অসদাচারণ হয়ে যায়, তখন সে মায়ের প্রতি লক্ষ না করে স্ত্রীর কথাকে প্রাধান্য দিলো– এটাই হলো, স্ত্রীর আনুগত্য করা এবং মায়ের নাফরমানি করা।

৫. আর মানুষ যখন বন্ধুর সঙ্গে কোমল আচরণ করবে আর পিতার সঙ্গে করবে রুক্ষ আচরণ। অর্থাৎ– বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করবে; অথচ পিতার সঙ্গে পুত্রসুলভ আচরণ করবে না।

মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ

৬. মসজিদসমূহে যখন উঁচুস্বরে আওয়াজ হবে। মসজিদ বানানো হয়েছে আল্লাহর যিকর ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে। সুতরাং সেখানে এমন কাজ করা নিষেধ, যার ফলে যিকিরকারী ও ইবাদতকারীর আমলের মাঝে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু বর্তমানে মানুষ এর বিপরীত কাজ করে। বিশেষ করে মসজিদে বিয়ে পড়ানোর সময় হট্টগোল বেশি হয়। এ দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। কারণ, বিনা কারণে মসজিদে জোরে কথা বলা গুনাহ।

৭. সবচে নীচু লোকটি নিজ জাতির নেতা বনে যাবে।

৮. মানুষকে সম্মান করা হবে তার অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য। অর্থাৎ– যদি অমুককে সম্মান না করা হয়, তাহলে হয় ফেঁসে যাবো– এ ভয়ে তাকে সম্মান করা।

৯. মদপান ব্যাপক হবে।

১০. রেশমের কাপড় পরিধান করবে।

বাসা-বাড়িতে গায়িকা

১১. বাসা-বাড়িতে গায়িকা রাখা হবে।

১২. বাদ্যযন্ত্রের প্রতি খুব যত্ন নেয়া হবে।

এ কথাগুলো রাসূলুল্লাহ (সা.) সে যুগে বলেছেন, যে যুগে এর কল্পনাও করা যেতো না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, প্রত্যেকে নিজের বাসা-বাড়িতে গায়িকা রাখবে কিভাবে? বর্তমানের রেডিও, টিভি, ভিসিডি, এমপিথ্রি- ফোর-ফাইভ এ প্রশ্নের উত্তর একেবারে সহজ করে দিয়েছে। এগুলো ব্যবহার করে যখন ইচ্ছা মানুষ গান শুনে এবং গায়িকাকেও দেখে।

অনুরূপভাবে বাদ্যযন্ত্রও প্রত্যেকের কাছে কিভাবে থাকবে– এর উত্তরও একেবারে স্পষ্ট। কারণ, এসব যন্ত্র প্রতিটিই বাদ্যযন্ত্র।

১৩. এ উম্মতের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে লা'নত করবে, গালি দিবে।

মোটকথা, যখন এসব বিষয় প্রকাশ পাবে, তখন আমার উম্মতের উপর যাবতীয় মুসিবতের পাহাড় ধসে পড়বে।

উক্ত হাদীসের প্রতিটি বিষয় আজ আমাদের সমাজে বিদ্যমান।

মদপান করবে পানীয়ের নামে

অপর হাদীসে এসেছে, যখন আমার উম্মত মদকে পানীয় মনে করে পান করবে। মনে করবে, এটা তো সাধারণ পানীয়, সুতরাং হালাল। যেমন– বর্তমানে এ বিষয়ে এমন কিছু উদ্ভট গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ আমরা পাই, যার মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, 'প্রচলিত মদ হারাম নয়। কেননা, প্রকৃতপক্ষে ওটা মদ নয়। যথা বিয়ার হলো ভুট্টার নির্যাস, গমের নির্যাস ইত্যাদি। যেমনিভাবে অন্যান্য ফলের জুস হালাল, তেমনিভাবে গম, ভুট্টার নির্যাসও হালাল।' মনে রাখবেন, ইসলামী শরীয়তে এ জাতীয় গবেষণার কোনো মূল্য নেই। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে বলেছেন, মদকে পানীয় বা জুসের নামে হালাল করা হবে– এদের এসব গবেষণা এরকমই এক অপচেষ্টা। দেড় হাজার বছর পূর্বেই আমাদের নবীজী (সা.) এদের ব্যাপারে সতর্ক করে গিয়েছেন।

সুদকে ব্যবসার নামে চালানো হবে

আর যখন আমার উম্মতের লোকেরা সুদকে হালাল মনে করে চালাবে। বলবে, সুদ মানে ব্যবসায়িক মুনাফা। যেমন বর্তমানে বলা হয়ে থাকে, ব্যাংকের সুদ 'সুদ' নয়। এটা ব্যবসায়িক পলিসি। এ পলিসি বন্ধ করে দিলে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে।

ঘুষকে হাদিয়া বলা হবে

আর যখন আমার উম্মতের লোকেরা ঘুষকে হাদিয়ার নামে হালাল মনে করবে। যেমন ঘুষদাতা এই বলে ঘুষ দিবে যে, এটা আপনার জন্য হাদিয়া। আর ঘুষগ্রহীতাও একে হাদিয়া মনে করে নিজের পকেটে রেখে দিবে। এরূপ ঘটনা বর্তমানে অহরহ ঘটছে।

আর যখন যাকাতের মালকে উম্মত জরিমানা হিসাবে গ্রহণ করবে, তখন এ উম্মতের ধ্বংস ঘনিয়ে আসবে।

উক্ত চারটি বিষয়ও আমাদের সমাজে পুরোপুরি বিদ্যমান। (কনযুল উম্মাল, হাদীস নং ৩৮৪৯৭)

শানদার যীনপোশের উপর বসে মসজিদে আসবে

অপর হাদীসে এসেছে, শেষ যমানায় তথা ফেতনার যুগে মানুষ আড়ম্বরপূর্ণ শানদার যীনপোশের উপর বসে মসজিদের সামনে অবতরণ করবে।

আগের যুগে এ হাদীসটির মর্ম দুর্বোধ্য ছিলো। কিন্তু বর্তমানের বিভিন্ন মডেলের কার ও গাড়ি দেখলে হাদীসটি অনুধাবন করা সহজ হয়ে যায়। বর্তমানে মানুষ শানদার গাড়িতে চড়ে মসজিদের সামনে অবতরণ করে।

নারীরা পোশাক পরবে, তবুও উলঙ্গ হবে

আলোচ্য হাদীসের পরবর্তী অংশে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তাদের স্ত্রীলোকেরা পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ হবে।

পূর্ববতী যুগে এটা অনুধাবন করা কষ্টকর ছিলো যে, পোশাক পরা সত্ত্বেও উলঙ্গ হয় কিভাবে? কিন্তু বর্তমানে নারীদের শরীরের পিনপিনে, পাতলা, শর্ট ও আঁটশাট পোশাক দেখলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পোশাক পরা সত্ত্বেও উলঙ্গ হয় কিভাবে। (মুসলিম শরীফ কিতাবুললিবাস)

নারীদের মাথায় উটের কুঁজের মত চুল থাকবে

তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'ওসব নারীর মাথায় উটের কুঁজের মত চুল থাকবে। হাদীসের এ অংশের ব্যাখ্যায়ও পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম স্পষ্ট কিছু চিহ্নিত করতে পারেন নি। কারণ, উটের কুঁজ তো উঁচু হয়। নারীদের চুল এরকম কিভাবে উঁচু হবে। কিন্তু আজকের যুগের নারীদের চুলের ফ্যাশন দেখলে বোঝা যায়, হাদীসের বক্তব্য কত সুস্পষ্ট ও সত্য।

এরা অভিশপ্ত নারী

তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এসব নারীর প্রতি অভিসম্পাত কর। কারণ, এরা অভিশপ্ত। আল্লাহ নারীদেরকে পর্দাবৃত করেছেন। পর্দা নামক বৃত্তের মধ্যে থাকার নির্দেশ তাদেরকে তিনি দিয়েছেন। এরা যখন উক্ত বৃত্তের বাইরে এসে দেহ-প্রদর্শনীতে লিপ্ত হয়, তখন শয়তান তাদের কাঁদের উপর চড়ে বসে।

এক হাদীসে এসেছে, নারীরা যখন সুগন্ধি প্রসাধনী মেখে মার্কেটে যায়, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর লা'নত আসে, ফেরেশতারাও লা'নত পাঠায়।

পোশাকের মৌলিক উদ্দেশ্য

পোশাকের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, সতর ঢেকে রাখা। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

يَابَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ـ

'হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের সতর আবৃত রাখবে।'

সুতরাং সতর ঢাকা ফরজ। যে পোশাক সতর আবৃত রাখতে ব্যর্থ, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে পোশাকই নয়। অথচ বর্তমান যুগের ফ্যাশন হলো নগ্ন পোশাক। বর্তমানে অনেক দ্বীনদার পরিবারেও ফ্যাশনের আগ্রাসন লেগেছে, যার অশুভ পরিণামে আজ আমরা ভুগছি। আল্লাহর ওয়াস্তে পোশাকের ব্যাপারটিতে পূর্ণ মনোযোগ দিন। কমপক্ষে নিজের পরিবারে হলেও এ ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। পর্দাকে আহত করে– এমন পোশাক বর্জন করুন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর লা'নত থেকে বেঁচে থাকুন।

অন্যান্য জাতি মুসলমানদের খাবে

হযরত ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এমন একটা সময় আসবে, যখন দুনিয়ার অন্যান্য জাতি তোমাদেরকে খাওয়ার জন্য একে অপরকে এমনভাবে আহ্বান করবে, যেমনিভাবে মানুষ দস্তরখানে বসে একে অপরকে খাবারের প্রতি আহ্বান করে। যেমন বিছানো দস্তরখানা, যার উপর নানারকম খাবার সাজানো, এক ব্যক্তি সেগুলো খেতে বসেছে, ইতোমধ্যে যদি আকে ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তখন যেমনিভাবে তাকেও দস্তরখানের প্রতি আহ্বান করা হয়, তেমনিভাবে এমন একটা সময় আসবে যখন মুসলমানদের অবস্থান দস্তরখানে খাবারের মতোই দুর্বল হবে। বড় বড় পরাশক্তি ও জাতি মুসলমাদেরকে খাবে। আর তারা অপরকেও এর মাঝে শরিক হওয়ার জন্য আহ্বান জানাবে। খাবে– এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাবে। (সুনানু আবী দাউদ)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত যে ইতিহাস বিশ্বমঞ্চে চিত্রিত হয়েছে, সে সম্পর্কে যার সম্যক ধারণা আছে, তার কাছে এ হাদীসের ব্যাখ্যা একেবারে স্পষ্ট।

মুসলমান খড়কুটোর মত হবে

সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন আমাদের সংখ্যা কি নিতান্ত কম হবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন, সে সময় তোমাদের সংখ্যা অনেক হবে।

যেমন– বর্তমানে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক। পৃথিবীর মোট সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশই হলো মুসলমান। রাসূল (সা.) বলেন, কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে স্রোতে ভাসমান খড়কুটোর মত। ভাসমান খড়কুটোর যেমনিভাবে নিজস্ব

কোনো ইচ্ছা থাকে না, শক্তি থাকে না, সিদ্ধান্ত থাকে না, অনুরূপভাবে তোমাদেরও 'নিজস্বতা' বলতে কিছুই থাকবে না।

মুসলমান কাপুরুষ হয়ে যাবে

তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের দুশমনের অন্তর থেকে তোমাদের ভীতি দূর করে দিবেন আর তোমাদের অন্তরে কাপুরুষতা ও দুর্বলতা স্থান করে নিবে। এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ দুর্বলতা কী জিনিস? এ প্রশ্ন সাহাবীর মনে এজন্য জেগেছে যে, মুসলমান আর দুর্বলতা এবং মুসলমান আর কাপুরুষতা তো সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর বিষয়। মুসলমান কিভাবে দুর্বল কিংবা কাপুরুষ হয়। রাসূল (সা.) উত্তর দিলেন, দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা তোমাদের অন্তরে চলে আসবে। এখানে 'মৃত্যু' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত। অর্থাৎ– আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত লাভ করতে তোমাদের মন চাইবে না। কারণ, আল্লাহর প্রতি তোমাদের কোনো আকর্ষণ থাকবে না। টাকা-পয়সা, মান-সম্মান ইত্যাদির প্রতি তোমাদের প্রচণ্ড আকর্ষণ তখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

সাহাবায়ে কেরামের বীরত্ব

এক যুদ্ধের ময়দানে এক সাহাবী তিন-চারজন দুশমনের ঘেরাওয়ে পড়ে গেলেন। দুশমনরা ছিলো অস্ত্রসজ্জিত। তারা তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। ইতোমধ্যে আরেকজন সাহাবী সেখানে উপস্থিত হলেন। শত্রুবাহিনীর মাঝে দাঁড়িয়েও ওই সাহাবী একটুও ঘাবড়ালেন না। তখন কেউ একজন তাঁকে বললো, তুমি যেহেতু একাকী আর দুশমনরা অনেক শক্তিশালী, তাই তোমার বাহিনী আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর, আপাতত এদেরকে আক্রমণ করো না। উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি আমার এবং জান্নাতের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না। এসব কাফের তো আমার জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ।

এ ছিলো সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা। তাঁরা মৃত্যু থেকে পালাতেন না, বরং আলিঙ্গন করতেন। কারণ, রাসূল (সা.) এর বরকতে তাঁদের অন্তর থেকে মৃত্যুভয় দূর হয়ে গিয়েছিলো। জান্নাত-জাহান্নাম যেন তাঁরা সচক্ষে দেখতেন।

শাহাদাত লাভের প্রতি আগ্রহ

এক সাহাবী। যুদ্ধের ময়দানে তিনি। দেখলেন তাঁর সামনে কাফের বাহিনী। সকলেই অস্ত্রসজ্জিত। তখন স্বতস্ফূর্তভাবে তার মুখ থেকে নিম্নোক্ত কবিতাটি বের হয়ে গিয়েছে–

غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةْ ۞ مُحَمَّدًا وَصَحْبَهْ -

'আহ! কী চমৎকার দৃশ্য। আগামীকাল আমি আমার প্রিয়তম মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি।

আরেক সাহাবী তীর দ্বারা আহত হয়েছেন। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিলো। তখন তিনি স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন– فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ 'কাবার প্রভুর কসম! আজ আমি সফল হয়ে গিয়েছি।'

এ ছিলো সাহাবায়ে কেরামের দৃশ্য, যাঁরা দুনিয়ার মহব্বতকে অন্তর থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

ফেতনার যুগের জন্য প্রথম নির্দেশ

ফেতনার যুগে একজন মুসলমানের করণীয় কী? এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

فَلْيَلْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِمَامَهُمْ -

'সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ও তাদের নেতার সঙ্গে নিজেকে জুড়ে রাখবে।' যারা বিদ্রোহী তাদের পথ অবলম্বন করো না, বরং তাদেরকে উপেক্ষা কর। এটা হলো ফেতনার যুগের জন্য একজন মুসলমানের প্রতি তাঁর নবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে প্রথম নির্দেশ। এক সাহাবী হাদীসটি শোনার পর প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! যদি মুসলমানদের এরূপ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল না থাকে এবং তাদের নেতাও না থাকে, তখন আমি কী করবো? অর্থাৎ– ফেতনার যুগ যদি আমি পাই আর মুসলমানদের এরূপ কোনো দল ও নেতা যদি না পাই, যারা বিশ্বস্ততা, তাকওয়া, সহনশীলতা, বিচক্ষণতা ও কর্মপন্থায় বিবেচনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আস্থাভাজন, তখন আমি কী করবো? রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন, এমতাবস্থায় সকল দল ও ফেরকা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে নির্জনে চটের উপর বসে থাকবে। আগেকার যুগে চটকে কার্পেট বা জায়নামায হিসাবে ব্যবহার করা হত। আলোচ্য হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য তুমি বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয়ো না। দল ও ফেরকাবাজির মধ্যে নিজেকে জড়িও না। বরং একাকী নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা কর।

দ্বিতীয় নির্দেশ

অপর হাদীসে এসেছে, যখন তোমরা নির্জনতা অবলম্বন করবে, যদি তখন মুসলমানরা পরস্পর লড়াইতে লিপ্ত হয়, তাহলে তামাশা দেখার জন্যও বের হয়ো না। কারণ, যে ব্যক্তি ফেতনাকে উঁকি দিয়ে দেখতে যাবে, ফেতনা তাকেও টেনে নিয়ে যাবে। কাজেই এ সময়েও ঘরে বসে থাকবে। তামাশা দেখার জন্যও বের হবে না।

তৃতীয় নির্দেশ

অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) এ মর্মে বলেছেন–

اَلْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِيْ وَالْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ -

'ফেতনার যুগে চলমান ব্যক্তি থেকে দণ্ডায়মান ব্যক্তি উত্তম এবং দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়েও ওই ব্যক্তি উত্তম যে বসে থাকবে।'

অর্থাৎ– ফেতনার সঙ্গে নিজেকে কোনোভাবে জড়াবে না, বরং ঠায় বসে থাকবে। ঘরে বসে নিজের ফিকির করবে। আত্মশুদ্ধি ও পরিবারকে শোধরানোর কাজে লিপ্ত থাকবে।

ফেতনার যুগের সর্বোত্তম সম্পদ

মনে করুন, ফেতনার যুগে এক ব্যক্তি কিছু ছাগল নিলো। সেগুলো নিয়ে পাহাড়ে চলে গেলো। শহরের জীবন সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করলো। ছাগল-নির্ভর উপার্জন দ্বারা দিনগুলো সে কাটিয়ে দিচ্ছিলো। তবে এমন ব্যক্তিই ফেতনা থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকলো। কারণ, শহর মানেই কোলাহল ও ফেতনার ছড়াছড়ি। আর এ ব্যক্তির ছাগলগুলো পৃথিবীর সকল সম্পদের তুলনায় অনেক উত্তম।

একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ

আলোচ্য হাদীসগুলো সামনে রাখলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে কী করতে বলেছেন? এতে স্পষ্ট হয় যে, ফেতনার যুগ মানে সম্মিলিত কাজ করার যুগ এটা নয়। বরং ইজতেমায়ী কাজ করতে গেলে নানা সমস্যা ও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে তখন। ফলে তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং নির্দিষ্ট কোনো দলের উপর নির্ভরতা খুঁজে পাবে না। হক ও বাতিলের মাঝে তখন পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়বে। সুতরাং ফেতনার যুগে তোমার কর্মপন্থা হবে একটাই, তাহলো, নিজেকে ফেতনা থেকে বাঁচিয়ে রেখে আল্লাহর আনুগত্য করে যাবে। এভাবে কোনো রকম জীবনটা পার করে দিয়ে কবরে যেতে পারলেই হলো। 'ইনশাআল্লাহ' আল্লাহ এর উত্তম পুরস্কার দিবেন।

এ মর্মে আল্লাহর নির্দেশনাও লক্ষ্য করুন, সূরা মায়েদাতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَااهْتَدَيْتُمْ

اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা কর, তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ, তখন কেউ পথভ্রষ্ট হলে তাতে তোমাদের ক্ষতি নেই। (সূরা মায়েদা-১০৫)

হাদীস শরীফে এসেছে, আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ আয়াতটিতে তো বলা হয়েছে নিজের ফিকির করার জন্য এবং অপরের ফিকির না করার জন্য। অথচ অন্যত্র তো সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সুতরাং এতদুভয়ের মাঝে সামঞ্জস্যবিধান করা হবে কিভাবে?

ফেতনার যুগের চারটি নিদর্শন

রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ তথা দাওয়াত ও তাবলীগ-সংক্রান্ত আয়াতগুলো যথাস্থানে সঠিক। কিন্তু এমন একটা যমানা আসবে, যখন মানুষের জিম্মায় শুধু নিজের ফিকির করার দায়িত্ব থাকবে। আর সেটা ওই যামানায় হবে যখন চারটি আলামত প্রকাশ পাবে–

(১) প্রথম আলামত হলো, যখন মানুষের সকল আবেগ, আগ্রহ ও উদ্দীপনা হবে শুধু সম্পদকে কেন্দ্র করে। মানুষ কৃপণতার স্বভাবের অনুসরণ করবে। মানুষ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু টাকার ধান্ধায় থাকবে। সর্বাবস্থায় সম্পদ উপার্জন ও পার্থিব ফায়দা লাভই একমাত্র উদ্দেশ্য হবে।

(২) দ্বিতীয় আলামত হলো, যখন মানুষ শুধু প্রবৃত্তির কামনার পেছনে লেগে থাকবে। হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে শুধু নফসের অনুসরণ করবে। জান্নাত-জাহান্নাম, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর অসন্তুষ্টির পার্থক্য ভুলে গিয়ে কেবল প্রবৃত্তির পেছনে ঘুরবে।

(৩) তৃতীয় আলামত হলো, যখন মানুষ দুনিয়াকে আখেরাতের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিবে। আখেরাতের আযাবের ভয় অন্তর থেকে উঠে যাবে। মৃত্যুর ভয়, কবরের আযাবের ভয় ও আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় সম্পর্কে যখন তাদেরকে বলা হবে, তখন দুনিয়ার নগদ প্রাপ্তির আশায় এগুলোকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে। ওয়াজ-উপদেশের প্রতি কান দিবে না।

(৪) চতুর্থ আলামত হলো, যখন মানুষ নিজের রায়, মত, পথ ও অভিপ্রায়কে মনে করবে এটাই সঠিক। এছাড়া অন্যের বক্তব্য ও মন্তব্যকে কিছুই মনে করবে না। যেমন আজকাল অনেক মানুষকে দেখা যায়, হালাল-হারামের কথা বলা হলে হঠকারিতা দেখায়। জীবনে কুরআন-হাদীস খুলেও দেখেনি, অথচ ফতওয়া দেওয়ার ব্যাপারে পণ্ডিতি দেখায়।

মোটকথা, যখন এ চারটি আলামত প্রকাশ পাবে, তখন নিজের ফিকির করবে। সাধারণ মানুষ কোথায় যাচ্ছে সে ফিকির তোমাকে করতে হবে না।

কারণ, এটাও একপ্রকার ফেতনা হতে পারে তুমি যাদের ফিকির করবে, তাদেরকে প্রভাবিত করার পরিবর্তে নিজেই তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাবে। সুতরাং নির্জনে বসে থাক, ইবাদত কর, নিজের ফিকির কর, ফেতনার যুগের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষা এটাই।

দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতিতে সাহাবায়ে কেরামের কর্মকৌশল

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পরের যুগ ছিলো সাহাবায়ে কেরামের যুগ। খেলাফতে রাশেদার শেষ দিকে মুসলিম উম্মাহর মাঝে দেখা দিয়েছিলো পারস্পরিক মতানৈক্য। হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুআবিয়া (রা.) এর মাঝে যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিলো, তা যুদ্ধ পর্যন্ত গড়িয়েছিলো। এ ছাড়াও হযরত আলী (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.) এর মাঝেও দেখা দিয়েছিলো রাজনৈতিক মতপার্থক্য। সে সময় সাহাবায়ে কেরাম কী কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, আল্লাহ তাআলা অনাগত মুসলিম উম্মাহর জন্য সে আদর্শ সৃষ্টি ও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের আদর্শই আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। আর সেই দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতিতে আমরা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিঈনে কেরামকে দেখতে পাই যে, যারা মনে করেছেন, আলী (রা.) সত্যের উপর আছে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীস–

فَيَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِمَامَهُمْ -

'ফেতনার সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দলভুক্ত থাকবে এবং তাঁদের নেতার অনুসরণ করবে।' এর উপর আমল করতে আলী (রা.) এর সঙ্গ দিয়েছেন এবং তাঁকে নিজেদের নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছেন। পক্ষান্তরে যাঁরা মুআবিয়া (রা.)-কে সত্যের প্রতীক মনে করেছেন, তারাও উক্ত হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে মুআবিয়া (রা.) এর পক্ষাবলম্বন করেছেন এবং তাঁকে নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছেন। আর সাহাবা ও তাবিঈনের মধ্য থেকে তৃতীয় আরেকটি দল ছিলো, যাঁরা কারো পক্ষাবলম্বন করেননি; বরং তখন তাঁদের বক্তব্য ছিলো, এ মুহূর্তে কে হকের উপর আছেন আর কে বাতিলের পক্ষে আছেন– এটা বলা মুশকিল, কাজেই এটা ফেতনা। আর এরূপ পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নির্দেশ হলো ঘরে বসে থাকা। এজন্য তাঁরা উভয় পক্ষের কারো পক্ষই নেননি, বরং নির্জনতার পথকেই বেছে নিয়েছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) যা করেছিলেন

হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর পুত্র। জালীলুল কদর সাহাবী ও ফকীহ হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি তখনও জীবিত ছিলেন। তখন

তিনি কারো পক্ষ না নিয়ে ঘরে বসে ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, আপনি ঘরে বসে আছেন কেন? বের হোন, হযরত আলী (রা.) ও মুআবিয়া (রা.) এর মধ্যে যুদ্ধ চলছে। আর আলী (রা.) আছেন সত্যের উপর। সুতরাং তাঁর দলে যান, যুদ্ধ করুন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) উত্তর দিলেন, এটা ফেতনার যুগ। হক-বাতিল চেনা কষ্টকর হলে তাকে বলা হয় ফেতনার যুগ। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে এমনটিই শুনেছিলাম। আরো শুনেছি, তিনি বলেছেন, এমন যুগে ঘরে বসে 'আল্লাহ-আল্লাহ' করবে, তাই আমি ঘরে বসে আছি।

লোকটি বললো, আপনার কথা অসত্য। কেননা, কুরআন মজীদে রয়েছে–

قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ۔

'ফেতনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত লড়াই কর।'

সুতরাং ফেতনা শেষ হয়ে গেলে আপনি জিহাদ থেকে হয়ত অব্যাহতি পেতে পারেন; এর আগে নয়।

প্রতিউত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এক বিস্ময়কর বাক্য বলেছেন। তিনি বলেন–

قَاتَلْنَا حَتّٰى لَمْ تَكُوْنُوْا فِتْنَةٌ وَقَاتَلْتُمْ حَتّٰى كَانَتِ الْفِتْنَةُ۔

'আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করেছি, তখন আল্লাহ তাআলা ফেতনা দূর করে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে তোমরা যুদ্ধ করছো, ফেতনা বাড়ছে বৈ কমছে না। তোমরা তো ফেতনাকে আরো তেজস্বী করে দিলে! কাজেই আমি তোমাদের কথা শুনবো না; বরং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আদর্শ অনুযায়ীই চলবো।

রোমসম্রাটকে মুআবিয়া (রা.)-এর উত্তর

যুদ্ধ চলাকালীন রোমের খ্রিস্টান সম্রাট এ মর্মে হযরত মুআবিয়া (রা.) এর কাছে সংবাদ পাঠালো, হে মুআবিয়া! আপনি আপনার দাবীর উপর শক্ত থাকুন। আমি শুনেছি, আপনার ভাই আলী (রা.) উসমান (রা.) হত্যার বিচার করছে না। এ ব্যাপারে আলী (রা.) আপনার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করছে। আপনি আপনার দাবী আদায়ে কোমর বেঁধে নামুন। প্রয়োজনে আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য আমি আপনাকে সৈন্য ও অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করবো।

এ সংবাদটি হযরত মুআবিয়া (রা.) এর কানে পৌঁছলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলে দিলেন, হে খ্রিস্টান বাদশাহ! স্মরণ রেখো! আমি মুসলমান,

আমার ভাই আলীও মুসলমান। সুতরাং আমি এবং আলী (রা.) এর মধ্যকার মতানৈক্য নিতান্তই মুসলমানদের ঘরোয়া ব্যাপার। মুসলমানদের ঘরোয়া ব্যাপারে কোনো ইহুদী-খ্রিস্টানের নাক গলানোর অধিকার নেই। সুতরাং হযরত আলী (রা.) এর বিরুদ্ধে যদি তুমি অস্ত্র ও সৈন্য পাঠাও, তাহলে তোমার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম তরবারি উত্তোলিত হবে আমি মুআবিয়ার।'

সাহাবায়ে কেরাম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র

সাহাবায়ে কেরামের মান-মর্যাদা সঠিকভাবে অনুধাবন করা সহজ কথা নয়। বর্তমানে কিছু লোক এ বিষয়ে ভ্রান্তির কবলে আবদ্ধ। তারা সাহাবায়ে কেরামের সমালোনায় লিপ্ত। আমাদের যুদ্ধ ও সাহাবায়ে কেরামের যুদ্ধ এবং আমাদের মতানৈক্য ও সাহাবায়ে কেরামের মতানৈক্যের মাঝে তারা পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না বিধায় সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করতে তাদের এতটুকু বুক কাঁপে না। অথচ আমরা আর সাহাবায়ে কেরাম এক কথা নয়। সাহাবায়ে কেরামের প্রতিটি কাজ আমাদের জন্য আদর্শ। তাঁদের প্রত্যেকেই মর্যাদার পাত্র। মূলত তাদের মধ্যে ঘটে যাওয়া দ্বন্দ্ব-লড়াইও আমাদের জন্য আদর্শ। এর মধ্যেও হেকমত আছে। মুসলিম-উম্মাহর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও মতানৈক্যের সময় উম্মাহর সদস্যরা কী করবে– এর উত্তর আল্লাহ তাআলা আলী (রা.), মুআবিয়া (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর মাধ্যমে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকেই আমল করার চেষ্টা করেছেন প্রিয় নবী (সা.) এর সুন্নাতের উপর। মূলত এ বিষয়গুলো যারা বুঝতে চায় না, তারা সাহাবা-সমালোচনায় ব্যস্ত থাকে। এটা এদের হঠকারিতা। আরে আমরা কোথায় আর সাহাবায়ে কেরাম কোথায়?

মুআবিয়া (রা.) এর ইখলাস

হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর পুত্র ইয়াযিদ। তিনি নিজের এ সন্তানকে ইসলামী-রাষ্ট্রের প্রধান বানিয়েছেন। এজন্য সাহাবা-সমালোচকরা কত রকম কথা বলে। অথচ মুআবিয়া (রা.) এর ইখলাস দেখুন। একবারের ঘটনা। জুমার দিন জুমার নামাযের সময় নিজেই তিনি মিম্বরের উপর উঠলেন এবং দুআ করলেন, হে আল্লাহ! আমি আমার সন্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বভার দিয়েছি। আমি কসম করে বলছি, এ দায়িত্ব দেয়াকালে আমি কেবল মুসলিম-উম্মাহর কল্যাণই দেখেছি। এ ছাড়া অন্য কোনো কিছু আমার অন্তরে ছিলো না। যদি এ ছাড়া অন্য কোনো কিছু আমার অন্তরে থাকে, তাহলে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ! আমার সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার পূর্বেই আপনি ইয়াযিদের রুহ ছিনিয়ে নিন।

দেখুন! একজন পিতা নিজ পুত্রের জন্য এরূপ দুআ কখন করতে পারে! এখান থেকেই তো প্রতীয়মান হয়, মুআবিয়া (রা.) যা করেছেন, ইখলাস ও আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করেছেন। মানুষ ভুল করতে পারে। নবীগণ ছাড়া সকল মানুষ থেকেই ভুল প্রকাশ পেতে পারে। মানুষের সিদ্ধান্ত ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তিনি যা করেছেন, ইখলাসের সঙ্গে আল্লাহর জন্যই করেছেন।

নির্জনতার পথ অবলম্বন কর

আসলে আল্লাহর হেকমত বোঝা বড় কঠিন। হযরত আলী (রা.) ও মুআবিয়া (রা.)-এর মাঝে যখন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সহ অনেক সাহাবী নির্জনতার পথকে বেছে নেন। তাঁরা কোনো পক্ষাবলম্বন করেননি। এতে ইসলামের অনেক ফায়দা হয়েছে। সকল সাহাবা যদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তেন, তাহলে শাহাদাতের ঘটনা আরো ব্যাপক হতো। জামাত তখন ইসলামের এ খেদমতগুলো হতো না। সাহাবায়ে কেরামের এক বিশাল জামাত এই পথ অবলম্বন করার কারণেই আজ আমরা হাদীস শাস্ত্রের এ বিশাল সম্পদ পেয়েছি। তাঁরা ঘরে বসে অধ্যবসায়ে নিয়োজিত হয়েছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের ইলমের এক বিশাল ভাণ্ডার রেখে গিয়েছেন।

নিজেকে শুদ্ধ করার চিন্তা কর

ফেতনার যুগে ঘরের দরজা বন্ধ করে নির্জনে বসে থাকার জন্য বলা হয়েছে, যেন নিজেকে শুদ্ধ করার ফিকিরের পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে সংশোধন করার ফিকির করা যায়। আসলে একজন নবীর পক্ষেই সম্ভব এ জাতীয় নির্দেশনা দেয়ার। দেখুন, সমাজ কাকে বলে? ব্যক্তির সমষ্টিকেই তো সমাজ বলা হয়। এভাবে সমাজের একজন মানুষ যদি শুদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে কমপক্ষে ফেতনায় জড়িয়ে পড়ার মত একজন তো কমে গেলো। আর প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বলে। সুতরাং এ পথেই গোটা সমাজের শুদ্ধি রয়েছে।

নিজের দোষ দেখ

বর্তমানে আমরা যে যুগে বাস করছি, এটি প্রচণ্ড ফেতনার যুগ। এ যুগের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষামালা প্রয়োজনীয়তা আরো অনেক বেশি তীব্র। তাঁর শিক্ষা হলো, ফেতনার যুগে কোনো পার্টিভুক্ত হওয়া যাবে না। যথাসম্ভব ঘরে বসে থাকতে হবে। তামাশা দেখার জন্যও বের হওয়া যাবে না। বরং শুধু নিজেকে সংশোধন করার চিন্তা করতে হবে। ভাবতে হবে, নিজের মধ্যে কোন্

কোন্ দোষ-ক্রটি বিদ্যমান। এমনও হতে পারে, সমাজে বিদ্যমান ফেতনা আমার গুনাহর কারণেই ছড়িয়েছে। হযরত যুন্নুন মিসরী (রা.) এর কাছে লোকেরা অনাবৃষ্টির অভিযোগ করেছিলো। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, এসব কিছু আমার গুনাহর কারণেই হচ্ছে। তাই আমি এ এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। হয়ত আল্লাহ রহমত নাযিল করবেন। এ মহান বুযুর্গের মত আজ প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিত। অপরকে শুদ্ধ করার পেছনে না পড়ে নিজেকে শুদ্ধ করা উচিত।

হে আল্লাহ! গুনাহ থেকে বাঁচান

নিজেকে সংশোধন করার সর্বনিম্ন স্তর হলো, সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত যত গুনাহ করেছ, সেগুলো একটি একটি করে ছেড়ে দেয়ার ফিকির কর এবং প্রতিদিন আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা ও ইসতেগফার কর। আর এ দুআ কর যে, হে আল্লাহ! এটা ফেতনার যুগ। দয়া করে আমাকে, আমার পরিবারকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে এ ফেতনা থেকে দূরে রাখুন।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ-

'হে আল্লাহ! প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল ফেতনা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

দুআ করার পাশাপাশি গীবত থেকে, দৃষ্টির গুনাহ থেকে, অশ্লীলতা থেকে অপরকে কষ্ট দেয়া থেকে ও সুদ-ঘুষ থেকে যথাসম্ভব নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু উদাসীনতা ও অলসতার মাঝে জীবন কাটালে– আল্লাহ না করুন, পরিণাম অত্যন্ত করুণ মনে হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাদেরকে একথাগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন

وَاٰخِرُدَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

মরার পূর্বে মরো

নিঃসন্দেহে মৃত্যু আসবে, মৃত্যুর ব্যাপারে সকলেই একমত। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। নাস্তিকরা আল্লাহকে অস্বীকার করে, রাসূলকে অস্বীকার করে; কিন্তু মৃত্যু? বিজ্ঞানের এ উৎকর্ষের যুগেও মৃত্যুর সময় নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। বস্তুত যুলুম, নাফরমানি, অশ্লীলতা ও অবৈধতাসহ যাবতীয় গুনাহ মানুষ তখনই করে, যখন মন থেকে মৃত্যুর চিন্তা চলে যায়। মানুষের স্বভাব হলো, যখন সে সুস্থ ও সবল থাকে, তখন উদ্দাম স্বাধীনতা ও উপচানো খুশি তাকে পেয়ে বসে। এভাবেই মৃত্যুর কথা সে ভুলে যায়।

মরার পূর্বে মরো

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًاكَثِيْرًا ـ اَمَّابَعْدُ!

فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا وَحَاسِبُوْا قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا ـ (كشف الخفاء ـ ٢:٢,٤)

হামদ ও সালাতের পর!

'মরার পূর্বে মরো। কিয়ামত দিবসের হিসাবের পূর্বে নিজের হিসাব করো।'

নিঃসন্দেহে মৃত্যু আসবেই। মৃত্যুর ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। অতীতে ছিলো না, বর্তমানে নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। মৃত্যু এক অনস্বীকার্য বিষয়। নাস্তিকরা আল্লাহকে অস্বীকার করে, রাসূলকে অস্বীকার করে, কিন্তু মৃত্যু? মৃত্যুকে অস্বীকার করে না। মোটকথা মৃত্যুকে সবাই স্বীকার করে, মৃত্যুর নির্দিষ্ট কোনো সময়ক্ষণ নেই। বিজ্ঞানের এ উৎকর্ষের যুগেও মৃত্যুর 'সময়' নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। কে কখন মরবে তার কোনো ঠিকানা নেই। এখন মরবে না এক মিনিট পরে, না এক ঘণ্টা পরে, না একদিন পরে, না এক মাস পরে, নাকি এক বছর পরে মরবে কেউই বলতে পারে না।

মরার পূর্বে মরো

সুতরাং মৃত্যু যখন আসবেই এবং এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়ও নেই, তাহলে মানুষ যদি গাফলতির চাদর পরে বসে থাকে আর এভাবেই আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়, তবে তাঁর কাছে কী জবাব দিবে? মৃত্যুর পর যেন আল্লাহর গযব ও আযাবের সম্মুখীন হতে না হয়, তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে বলেছেন, বাস্তব মৃত্যু আসার পূর্বে মরো। কিভাবে মরবে? উলামায়ে কেরাম বলেছেন, দু'টি পদ্ধতিতে মরো। প্রথমত, গুনাহর প্রতি নফসের আকর্ষণকে পিষে ফেলো। প্রবৃত্তির তাড়নাকে খুন করে দাও। আল্লাহর নাফরমানি ও অশ্লীলতার হাতছানি যেন তোমার নফসের ভেতর মাথাচাড়া না দেয়, এজন্য তাকে শাসন কর– এভাবে গুনাহপ্রার্থী নফসটাকে মেরে ফেলো। এটাই হলো মরার পূর্বে মরো– এর মর্মার্থ।

একদিন আমাকে মরতেই হবে

একদিন আমাকে মরতেই হবে। এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। সম্পূর্ণ খালি হাতে যেতে হবে। আমার টাকা-পয়সা, অর্থ-বাংলো, গাড়ি-বাড়ি, সন্তান-সন্ততি কেউ আমার সঙ্গে যাবে না; বরং আমাকে যেতে হবে সম্পূর্ণ একা। এ কথাগুলো প্রকৃত মৃত্যু আসার পূর্বেই ধ্যান কর। আর এটাই হলো, মরার পূর্বে মরার দ্বিতীয় পদ্ধতি।

বস্তুত যুলুম, নাফরমানি, অশ্লীলতা, অবৈধতাসহ যাবতীয় গুনাহ মানুষ তখনই করে, যখন মন থেকে মৃত্যুর চিন্তা চলে যায়। মানুষের স্বভাব হলো, যখন সে সুস্থ ও সবল থাকে, তখন উদ্দাম স্বাধীনতা ও উপচানো খুশি তাকে পেয়ে বসে। সে তখন মনে করে, আহ জীবন, যৌবন, শক্তি, সাহস ও সামর্থ কখনও শেষ হবে না। এভাবে মৃত্যুর কথা সে ভুলে যায় এবং গাফলতির সাগরে ডুবে থাকে। আখেরাতের কোনো প্রস্তুতি তখন সে নেয় না।

বিশাল দু'টি নেয়ামত সম্পর্কে আমাদের উদাসীনতা

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত চমৎকারভাবে আমাদের সতর্ক করে বলেছেন–

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهَا كَثِيْرٌمِّنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ ـ (صحيح بخاري' كتاب الرقائق ' باب ماجاء في الصحة والفراغ ـ حديث نمبر٦٤٩)

অর্থাৎ- আল্লাহর মহান দু'টি নেয়ামত আছে। অনেক মানুষই এ ব্যাপারে ধোঁকায় পড়ে আছে। তন্মধ্যে একটি নেয়ামত হলো সুস্থতা। অপর নেয়ামত হলো অবসরতা।

এ দু'টি নেয়ামতের ব্যাপারে মানুষ ধোঁকায় পড়ে যায়। মনে করে, এগুলো আজীবন কাছে থাকবে। সুস্থাবস্থায় কল্পনায় আসে না যে, সে অসুস্থ হবে। রোগ-ব্যাধি তাকে আক্রমণ করবে। কিংবা অবসর মানুষ এ কল্পনা করে না যে, সে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে। তাই সে এ দু'টি নেয়ামতের কদর করে না। নেক কাজের সুযোগ এ দু'টি সময়ে বিদ্যমান। কিন্তু সে সুযোগকে হটিয়ে দিতে থাকে। মনে করে, এখনও তো যুবক। এখনও হাতে অনেক সময় আছে। সময়-সুযোগ হলে আল্লাহর দিকে ফিরবো। নিজেকে শুদ্ধ করার চিন্তা করবো। এ জাতীয় ভাবনার মূল হচ্ছে নফসের ধোঁকা। এ ধোঁকার জালে আটকা পড়ে মানুষ ধর্ম-কর্ম ছেড়ে দেয়। অথচ যৌবন মানে নেক কাজ করার, ইবাদত করার, রিয়াযত-মুজাহাদা করার, মানবসেবা করার এবং এ সবের মাধ্যমে আল্লাহকে রাজি-খুশি করার এক মহান সুযোগ।

যৌবনে ইচ্ছা করলে অনেক আমল করা যায়। নেক আমলের পাহাড় গড়া যায়। কিন্তু মানুষ তা করে না। কারণ, মৃত্যুর চিন্তা তার অন্তরে থাকে না। সকাল-সন্ধ্যায় প্রতিদিন কমপক্ষে এক-দু'বারও যদি মানুষ মৃত্যুর ধ্যান করতো, তাহলে নফসের ধোঁকার জালে আবদ্ধ হয়ে যেতো না। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বাস্তব মৃত্যু হানা দেয়ার পূর্বে মৃত্যুর ধ্যান কর।

বাহলুল (রহ.)-এর একটি গল্প

হযরত বাহলুল মাজযুব (রহ.) নামে এক বুযুর্গ ছিলেন। তখন ছিলো খলীফা হারুনুর রশীদের যুগ। এ বুযুর্গ একটু মাজযুব ধরনের ছিলেন। তাঁর সঙ্গে খলীফার খুব সখ্য ছিলো। তাই দরবারের লোকজনকে তিনি বলে রেখেছিলেন, এ লোকটি যখনই আমার কাছে আসতে চাইবে, তাকে বাঁধা দিও না। এজন্য এ বুযুর্গ খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতেন।

একদিনের ঘটনা। তিনি যথারীতি খলীফার দরবারে গেলেন। তখন খলীফার হাতে ছিলো একটি লাঠি। খলীফা লাঠিটি বুযুর্গের হাতে দিয়ে বললেন, মাজযূব সাহেব! আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ যে, এ লাঠিটি আমি আপনার কাছে আমানত হিসাবে দিলাম। পৃথিবীর বুকে যদি আপনার চেয়েও বোকা কাউকে পান, তাকে লাঠিটি আমার পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসাবে দিয়ে দিবেন। বাহলুল বললেন, ঠিক আছে আমি রেখে দিলাম।

মূলত খলীফা হাস্যরসের উদ্দেশ্যে তাকে লাঠিটি দিয়েছিলেন। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন, দুনিয়াতে আপনিই সবচে নির্বোধ। যাক, বাহ্‌লূল লাঠিটি নিয়ে চলে গেলেন।

এ ঘটনার কয়েক বছর পর একদিন বাহ্‌লুল জানতে পারলেন, খলীফা খুব অসুস্থ– শয্যাশায়ী। চিকিৎসা চলছে, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। বাহ্‌লুল খলীফাকে দেখতে গেলেন। শিয়রে বসে জিজ্ঞেস করলেন, আমীরুল মুমেনীন! কী অবস্থায় আছেন? খলীফা উত্তর দিলেন, সফর তো তৈরি, কাজেই অবস্থা আর কেমন হবে! বাহ্‌লূল বললেন, কোথাকার জন্য সফর? খলীফা উত্তর দিলেন, আখেরাতের সফর। কারণ, দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছি। বাহ্‌লুল বললেন, কতদিন পর ফিরে আসবেন? খলীফা উত্তর দিলেন, ভাই! এটা আখেরাতের সফর। এ সফর থেকে কেউ ফিরে আসে না। বাহ্‌লূল বললেন, তাহলে আপনি এ সফর থেকে ফিরে আসবেন না? তাহলে সফরের আরাম-আয়েশের জন্য কোনো সৈন্য-সামন্ত পাঠিয়েছেন কি? খলীফা উত্তর দিলেন, বোকার মত কথা বলছ কেন, এটা আখেরাতের সফর। আখেরাতের সফরে কেউ সাথী হয় না। কোনো বডিগার্ডও থাকে না। সিপাহী থাকে না। সেখানে মানুষ একাকী যায়। বাহ্‌লুল বললেন, আপনার এর আগের সফরগুলো তো এমন ছিলো না। সেসব সফরে তো আপনি আগে সৈন্য-সামন্ত পাঠাতেন। তারা আপনার আরাম-আয়েশের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতো। কিন্তু এ সফরের বেলায় ব্যতিক্রম হলো কেন? খলীফা উত্তর দিলেন, দেখুন, আপনি অনর্থক প্যাচাল পাড়ছেন। বললাম তো, এ সফর আখেরাতের সফর। এ সফরে এ সবের কোনো বালাই নেই।

এবার বাহ্‌লূল বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনার খেয়াল আছে কি না জানি না, বহু বছর পূর্বে এ লাঠিটি আপনি আমার কাছে আমানত রেখে বলেছিলেন, আমার চেয়ে নির্বোধ কাউকে পেলে তাকে যেন লাঠিটি দিই। এ পর্যন্ত আমি এমন ব্যক্তির সন্ধান পাইনি। কিন্তু আজ পেয়েছি। আপনি আমার চেয়েও নির্বোধ। কারণ, দুনিয়ার এক-দুই মাসের সফরের জন্য আপনার কত প্রস্তুতি আমরা দেখেছি। অথচ আখেরাতের এ দীর্ঘ সফরের জন্য আপনার কোনো প্রস্তুতি নেই। সুতরাং আপনি বোকা। আমার চেয়েও বোকা। কাজেই নিন, লাঠিটা আপনাকেই দিলাম। বাহ্‌লুলের উত্তর শুনে খলীফা কান্না জুড়ে দিলেন। বললেন, বাহ্‌লুল! আপনি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলেছেন। সারা জীবন আমি আপনাকে বোকা ভেবেছি। এখন দেখি, প্রকৃত বোকা তো আমি নিজেই।

কে বুদ্ধিমান?

মূলত বাহলুলের কথাগুলো ছিলো হাদীস শরীফেরই কথা।রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ـ

'বুদ্ধিমান ওই ব্যক্তি, যে নিজেকে চিনেছে এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করেছে।

আমরা সবাই বোকা

অথচ বর্তমান সমাজে ওই ব্যক্তিকে বুদ্ধিমান মনে করা হয়, যে সম্পদ উপার্জন করতে পারে। বাহলুল খলীফা হারুনুর রশীদকে যে উত্তর দিয়েছিলেন, একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে আমরা প্রত্যেকেই একেকজন জীবন্ত বোকা। আমাদের সার্বক্ষণিক চিন্তা একটাই– খাও, দাও, ফূর্তি করো, বাড়ি বানাও, গাড়ি কেনো ইত্যাদি। অথচ আখেরাতের কোনো প্রস্তুতি আমাদের নেই। দুনিয়ার সফর আরামদায়ক হওয়ার জন্য আমরা আগেভাগেই টিকেট বুকিং দিয়ে রাখি। আরো কত রকম প্ল্যান- প্রোগ্রাম করি। কিন্তু যে সফর চিরস্থায়ী সফর, সেখানকার জন্য আমাদের মাঝে কোনো ফিকির নেই। দু'-চারদিনের সফরের জন্য প্রস্তুতির শেষ নেই, অথচ চিরস্থায়ী সফরের জন্য প্রস্তুতির কোনো নাম নেই। সুতরাং আমরা বোকা না হলে কে বোকা হবে? এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সেই ব্যক্তি প্রকৃত বুদ্ধিমান, যে আখেরাতের জন্য আমল করেছে।

মৃত্যু ও আখেরাতের ধ্যান কিভাবে করবে?

এ প্রসঙ্গে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেছেন, দিনের একটা সময়কে এর জন্য নির্ধারিত কর। তারপর একাকী বসে সে সময়টাতে এভাবে ধ্যান করো যে, আমার জীবন ফুরিয়ে গেছে। ফেরেশতা চলে এসেছে। এখনই প্রাণটা কেড়ে নিয়ে যাবে। এখন আমার প্রাণ বের হয়ে গিয়েছে। আমার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব আমার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করছেন। অবশেষে আমাকে গোসল করিয়ে কাফন পরিয়ে দেয়া হয়েছে। জানাযার নামায পড়ে এখন কবরে রাখা হয়েছে। তারপর কবর মাটি দিয়ে ভর্তি করে দেয়া হয়েছে। কযেক মন মাটির নীচে আমাকে চাপা দিয়ে সবাই আপন কাজে চলে গিয়েছে। আমি একাকী পড়ে আছি। চারিদিকে অন্ধকার। প্রশ্নোত্তরের জন্য ফেরেশতা চলে এসেছে। আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে।

তারপর আখেরাতের ধ্যান কর এভাবে– দ্বিতীয়বার আমাকে কবর থেকে উঠানো হয়েছে। এখন আমি হাশরের ময়দানে। সকল মানুষ হাশরের ময়দানে একত্র হয়েছে। প্রচণ্ড গরম, ঘাম টপটপ করে ঝরে পড়ছে। গনগনে সূর্য একেবারে মাথার উপরে। প্রত্যেকেই দুঃশ্চিন্তা ও পেরেশানির জগতে আছে। লোকেরা আম্বিয়ায়ে কেরামের কাছে যাচ্ছে যেন আল্লাহর কাছে বিচারকার্য শুরু করার জন্য সুপারিশ করেন। তারপর অনুরূপভাবে হিসাব কিতাব, পুলসিরাত ও জান্নাত-জাহান্নামের ধ্যান করবে। প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর তেলাওয়াত, মুনাজাতে মকবুল পাঠ ও যিকির-আযকার থেকে ফারেগ হওয়ার পর কিছুক্ষণ ধ্যান করে নাও যে, এমন একটা সময় অবশ্যই আসবে। জানা নেই, কখন আসবে। এমনও তো হতে পারে যে, আজই আসবে। এভাবে ধ্যান করার পর দুআ কর যে, হে আল্লাহ! আমি দুনিয়ার কাজ-কারবারের উদ্দেশ্যে বের হতে যাচ্ছি। এমন কাজ যেন না করি, যার কারণে আমার আখেরাত ক্ষতির সম্মুখীন হবে। প্রতিদিন এরূপ ধ্যান কর। যখন একবার মৃত্যুর ধ্যান অন্তরে বসাতে সক্ষম হবে, তবেই 'ইনশাআল্লাহ' নিজেকে শুদ্ধ করার ফিকির তোমার মাঝে চলে আসবে।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবী নু'ম (রহ.)

আব্দুর রহমান ইনে আবী নু'ম (রহ.) ছিলেন একজন বড় মাপের বুযুর্গ ও মুহাদ্দিস। তাঁর সময়ের এক ব্যক্তির ঘটনা। এ ব্যক্তির মনে খেয়াল এলো যে, আমি বিভিন্ন মুহাদ্দিস, আলেম, ফকীহ ও বুযুর্গের কাছে যাবো। তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করবো, যদি কোনোভাবে এটা জানতে পারেন যে, আপনার মৃত্যু আগামীকালই হবে, তখন মৃত্যুর পূর্বে যে দিনটি পাবেন, সেদিনটি কিভাবে কাটাবেন। এ ব্যক্তির উদ্দেশ্য ছিলো, যেন বুযুর্গদের বিভিন্ন উত্তর থেকে নির্যাস বের করে সে উত্তম আমলগুলো খুঁজে বের করতে পারে এবং সে অনুযায়ী জীবনটা কাটাতে পারে।

অবশেষে তৎকালীন খ্যাতনামা আলেম, মুহাদ্দিস ও বুযুর্গদের কাছে এ প্রশ্নটি করলো। একেকজন একেকভাবে উত্তর দিলেন। অবশেষে লোকটি আব্দুর রহমান ইবনে নু'ম (রহ.) এর নিকট এলো এবং এ প্রশ্নটি করলো। আব্দুর রহমান ইবনে নু'ম (রহ.) উত্তর দিলেন, আমি প্রতিদিন যে কাজ করি, সে কাজই করবো। কারণ, আমি প্রতিদিনের জন্য এমনভাবে একটা রুটিন তৈরি করে নিয়েছি যে, প্রতিটি দিনকেই আমি আমার জীবনের শেষ দিন মনে করি। প্রতিদিনই আমি ভাবি, হয়ত আজকের দিনটাই আমার জীবনের শেষ দিন। তাই আমার রুটিনের মধ্যে কোনো কিছু নতুন করে বাড়ানোর মত স্থান নেই। প্রতিদিন যে আমল করি, জীবনের শেষদিনও সেই আমলই করবো।

এটাই মূলত আলোচ্য হাদীস- مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا মৃত্যু পূর্বে মৃত্যুবরণ কর।' এ বাস্তব নমুনা।

আল্লাহর সাক্ষাত লাভের স্পৃহা

এদের সম্পর্কেই হাদীস শরীফে এসেছে-

مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهٗ - (صحيح البخاري، كتاب الرقاق)

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত লাভের আশা করে, আল্লাহও আগ্রহী হন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত লাভ করার জন্য।'

তাই তো এমন লোকেরাই সর্বদা মৃত্যুর অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে বসে থাকে। এঁদের অবস্থা দেখে মনে হবে যেন তাঁদের মনের ভাষা হলো-

غَدًا نَلْقِى الْاَحِبَّهْ ۞ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهْ -

'আগামীকালই আমরা প্রিয়তম মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাহাবাদের সঙ্গে মিলিত হবো।'

এরূপ চিন্তা-চেতনার কারণে এদের জীবন হয় পরিশুদ্ধ ও পরীশীলিত।

আজই নিজের হিসাব নাও

আলোচ্য হাদীসের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে-

حَاسِبُوْا قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا -

'আখেরাতে তোমার প্রতিটি আমলের হিসাব নেয়া হবে।'

এর পূর্বে তুমি নিজের হিসাবটা নাও।' কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে-

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ -

'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে আখেরাতের দিন তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।'

জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন-

تم آج ہوا سمجھو جو روز جزا ہو گا

কেয়ামতের দিন যে হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে, তুমি মনে কর তা আজই হচ্ছে। রাতে একটু সময়ের জন্য হলেও এ হিসাবটা নাও যে, আজকের দিনে আমি যেসব কাজ করেছি, সেখানে এমন কোনো কাজ আছে কি যে, আল্লাহ যদি জিজ্ঞেস করেন, তাহলে এর কোনো উত্তর আমি দিতে পারবো না?

প্রতিদিন সকালে নফস থেকে অঙ্গীকার নাও

ইমাম গাযালী (রহ.) আত্মশুদ্ধির জন্য খুব সুন্দর ও বিস্ময়কর পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। আত্মশুদ্ধির জন্য তাঁর এ ব্যবস্থাপত্রটা দারুণ কার্যকর। তিনি বলেন, প্রতিদিন কয়েকটি কাজ কর। ভোরে যখন ঘুম থেকে উঠবে, তখন নিজের নফস থেকে এ অঙ্গীকার নাও যে, আজ সকাল থেকে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত কোনো গুনাহর কাজ করবো না। আমার দায়িত্বে অর্পিত সকল ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত ঠিকমত আদায় করবো। আমার দায়িত্বে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের যেসব হক রয়েছে, সবগুলো পরিপূর্ণভাবে আদায় করবো। যদি এ অঙ্গীকার-বিরোধী কোনো কাজ করে ফেলি তাহলে হে নফস! তোমাকে শাস্তি দিবো।

অঙ্গীকারের পর দুআ

ডা. আব্দুল হাই (রহ.) ইমাম গাযালী (রহ.) এর উক্ত ব্যবস্থাপত্রের সঙ্গে আরেকটু যোগ করেছেন। তিনি বলেন, উক্ত অঙ্গীকার করার পর আল্লাহর কাছে দুআ কর যে, হে আল্লাহ! আমি তো অঙ্গীকার করলাম, কিন্তু আপনি তাওফীক না দিলে তো এটা পূরণ করা অসম্ভব হয়ে যাবে। অতএব আমার এ অঙ্গীকারের মান রাখুন। আমাকে অঙ্গীকার মতো চলার এবং তার উপর অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন। অঙ্গীকার-পরিপন্থী কাজ থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

পুরো দিন নিজের কাজের মধ্যে মুরাকাবা

দুআ করার পর নিজের কাজে বের হয়ে যাও। চাকুরি, ব্যবসা বা দোকানে– মোটকথা যেখানে যাওয়ার সেখানে যাও। তারপর একটি কাজ কর– প্রতিটি কাজ শুরু করার পূর্বে একটু চিন্তা করে নিবে যে, এখনকার এ কাজটি আমার অঙ্গীকারের অনুকূলে আছে তো না অঙ্গীকারের পরিপন্থী এটি? যদি অঙ্গীকারের পরিপন্থী হয়, তাহলে ছেড়ে দাও। একে বলা হয়, মুরাকাবা, দ্বিতীয়ত, এ মুরাকাবা কর।

ঘুমানোর পূর্বে মুহাসাবা

তৃতীয় কাজ হলো, রাতে ঘুমানোর পূর্বে মুহাসাবা করবে। অর্থাৎ– রাতে ঘুমানোর পূর্বে নিজের হিসাবটা নিবে যে, পুরো দিন আমার কিভাবে কেটেছে? অঙ্গীকারমাফিক কেটেছে কিনা? হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েযের তোয়াক্কা করা হয়েছে কিনা? মানুষের হক আদায় করেছি কিনা? বিবি-বাচ্চাদের হক আদায় হয়েছে কিনা? এসব বিষয়ের হিসাব নাও। একে বলা হয় মুহাসাবা।

তারপর শোকর আদায় কর

এসব প্রশ্নের উত্তর যদি ইতিবাচক হয়, ভোরের অঙ্গীকারের সঙ্গে এগুলো যদি মিলে যায়, তাহলে اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ বলে শোকর আদায় করবে। ফলে আরো বেশি নেক হওয়ার তাওফীক আল্লাহ তোমাকে দান করবেন। উপরন্তু শোকর আদায়ের সাওয়াবও পাবে। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ -

'যদি তোমরা আমার শোকর আদায় কর, তাহলে আমি ওই নেয়ামত আরো বাড়িয়ে দিব।

অন্যথায় তাওবা কর

পক্ষান্তরে যদি এসব প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক হয় তথা ভোরের অঙ্গীকারের পরিপন্থী কাজ যদি কর, তাহলে মুহাসাবার সময় তাওবা করবে। বলবে, হে আল্লাহ! আমি অঙ্গীকার তো করেছিলাম, কিন্তু শয়তানের জালে আটকা পড়ে তা রক্ষা করতে পারিনি। এজন্য আপনার কাছে মাফ চাচ্ছি এবং তাওবা করছি যে, ভবিষ্যতে এমনটি আর হবে না।

নিজের নফসকে সাজা দাও

তাওবা করার পাশাপাশি নিজের নফসকে শাস্তি দাও। শাস্তি কী হবে– তা সকালে অঙ্গীকার করার সময়ই নির্ধারণ করে নিবে। যেমন বলবে, যদি অঙ্গীকার মত চলতে না পারি, তাহলে শাস্তি হিসাবে আট রাকাত নফল নামায পড়ব। তারপর বাস্তবেই যদি অঙ্গীকার পালন না হয়, তাহলে প্রথমে এ শাস্তিটাই কার্যকর কর, তারপর ঘুমাও। এর পূর্বে ঘুমানো নিষেধ।

শাস্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা উচিত

হযরত থানবী (রহ.) বলেন, এ শাস্তিটা খুব বেশি হওয়া উচিত নয় যে, নফস বিগড়ে যাবে। আবার এত কম হওয়াও উচিত নয় যে, নফস সুযোগ পাবে। বরং নফস কিছুটা কষ্ট পায় এবং খুব আরাম না পায়– শাস্তি এমন হওয়াটাই কাম্য। মরহুম স্যার সাইয়েদ যখন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অথচ সকল ছাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে পড়া বাধ্যতামূলক ছিলো। না পড়লে তার জন্য জরিমানা নির্ধারণ করা হয়েছিলো। জরিমানার পরিমাণ ছিলো সম্ভবত এক আনা। পরবর্তীতে দেখা যায়, পয়সাওয়ালা ছাত্ররা

নামায পড়তো না; বরং মাসের শুরুতে এক মাসের অগ্রিম জরিমানা দিয়ে দিতো। এজন্যই থানবী (রহ.) বলেন, এত কম জরিমানা হওয়া উচিত নয়, যা অনায়াসে করা সম্ভব। আবার এত কঠিনও করা যাবে না যে, যা কার্যকর করা মোটেও সম্ভব নয়। বরং ভারসাম্য রক্ষা করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত।

হিম্মত করতে হবে

নিজের শুদ্ধ করতে হলে কিছুটা হিম্মত করতে হবে। হাত-পা কিছুটা চালাতে হবে। কষ্ট করতে হবে। অলসতা করে আত্মশুদ্ধি করা সম্ভব হবে না। নফসের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করতে পারলে সে ভয় পাবে। কারণ, শাস্তি ভোগ করা, যেমন আট রাকাত নামায পড়া তার জন্য আরেক বিপদ বিধায় সে চাইবে এ বিপদে যেন না পড়ি। ফলে সে অঙ্গীকার মত চলার ব্যাপারে তখন তোমার সঙ্গ দিবে। অনাগত বিপদ থেকে বাঁচার জন্য সে নেক কাজের প্রতি তোমাকে উৎসাহিত করবে। এভাবে সে ধীরে ধীরে শুদ্ধ হয়ে যাবে।

চারটি কাজ করবে

ইমাম গাযালী (রহ.) এর উপদেশের সারকথা হলো, চারটি কাজ করবে।

১. ভোরে অঙ্গীকার করবে– মুশারাতা।

২. প্রত্যেক কাজের সময় একটু চিন্তা করবে– মুরাকাবা।

৩. রাতে শোয়ার পূর্বে হিসাব নিবে– মুহাসাবা।

৪. নফস বিগড়ে গেলে তখন শোয়ার পূর্বে কিছুটা শাস্তি দিবে– মুআকাবা।

এ কাজগুলো সবসময় করবে

এ আমলগুলো কিছুদিন করলে চলবে না। এমন যেন না হয় যে, কিছুদিন আমলগুলো করেছ, তারপর ভাবলে, বুযুর্গ হয়ে গিয়েছি। বরং আমলগুলো সবসময় করবে। কোনো সময় দেখবে, তুমি জয়ী হয়েছ আবার কখনও দেখবে শয়তান জয়ী হয়েছে। এতেও ঘাবড়াবার কিছু নেই। বরং যেদিন সফল হবে, সেদিন শোকর আদায় করবে। আর যেদিন বিফল হবে, সেদিন তাওবা করবে। তবুও এ আমল অব্যাহতভাবে করে যাবে। লাগাতার দু-একদিন সফল হলে কখনও একথা মনে করবে না যে, জুনাইদ বা শিবলী বনে গিয়েছ। আবার বিফল হলেও হাত-পা ছেড়ে বসে যাবে না।

হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর ঘটনা

হযরত থানবী (রহ.) মুআবিয়া (রা.) এর একটি ঘটনা লিখেছেন। তিনি প্রতি রাতে তাহাজ্জুদ পড়তেন। একরাতে তার তাহাজ্জুদ ছুটে গিয়েছিলো। কারণ, সে রাতে ঘুমের চাপটা একটু বেশি ছিলো। এজন্য পুরো দিন কাঁদলেন,

তাওবা করলেন, ইসতেগফার করলেন। পরের রাতে যখন তিনি ঘুমালেন, তাহাজ্জুদের সময় যখন হলো, তখন এক ব্যক্তি এলো এবং তাঁকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগালো। তিনি জেগে উঠে দেখলেন, এক অপরিচিত লোক তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি? সে উত্তর দিলো, আমি ইবলিস। তিনি বললেন, যদি তুমি ইবলিস হও, তাহলে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য জাগানো এটা তো তোমার কাজ নয়। আজ তুমি এ ঠেকায় পড়লে কেন? ইবলিস উত্তর দিলো, মূলত ব্যাপার হলো, গত রাতে আমি আপনাকে তাহাজ্জুদ থেকে ভুলিয়ে দিয়েছিলাম। যার কারণে আপনি খুব কান্নাকাটি ও তাওবা-ইসতেগফার করেছিলেন। ফলে আপনার মর্যাদা আরো বেড়ে গিয়েছে। অথচ তাহাজ্জুদ পড়লে এত পর্যাদার অধিকারী হতে পারতেন না। তাই ভাবলাম, আমি নিজেই আজ আপনাকে জাগিয়ে তুলি, যেন পুনরায় মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে না পারে।

লজ্জা ও তাওবার কারণে মর্যাদা বৃদ্ধি

ডা. আব্দুল হাই (রহ.) বলেন, কোনো বান্দা যখন ভুল করে ফেলে, তারপর আল্লাহর কাছে তাওবা করে, মাফ চায়, তখন আল্লাহ তাআলা ওই বান্দার উদ্দেশে বলেন, তুমি যে ভুলটি করেছো এর কারণে তুমি আমার সাত্তার, গাফফার ও রহমান নামক গুণের হয়েছ। আর ভুলটাও তোমার জন্য ফায়দাজনক হয়ে গিয়েছে।

হাদীস শরীফে এসেছে ঈদুল ফিতরের দিন আল্লাহ তাআলা নিজের বড়ত্ব ও মহত্বের কসম খেয়ে ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন, আজ আমার এসব বান্দা একত্র হয়ে আমার বিধান আদায় করছে, আমাকে ভাবছে, আমার কাছে মাফ চাচ্ছে এবং নিজের প্রয়োজনের কথা আমাকে জানাচ্ছে। আমার ইজ্জত ও মহত্বের কসম! আমি আজ অবশ্যই এদের দুআ কবুল করবো। এদের গুনাহগুলোকে নেক দ্বারা পরিবর্তন করে দেবো।

প্রশ্ন হয়, গুনাহ নেক দ্বারা পরিবর্তিত হবে কিভাবে? এর উত্তর হলো, গাফলতি বা না জানার কারণে যখন বান্দা গুনাহ্ করে ফেলে, তারপর জানার পর আল্লাহর কাছে তাওবা করে ও লজ্জিত হয়, তখন এর কারণে শুধু গুনাহই মাফ হয় না; বরং তার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়। আর এভাবে ওই গুনাহটি তার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়। এ মর্মে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে–

فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ـ

'আল্লাহ তাআলা তাদের গুনাহগুলোকে নেকসমূহ দ্বারা পরিবর্তন করে দেন।' (ফুরকান-৭০)

নফসের সঙ্গে আজীবন যুদ্ধ

এ জীবনটাই একটা লড়াই। নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে এ লড়াই অব্যাহত রাখতে হয়। আর লড়াইয়ের মাঝে হারজিত অবশ্যই আছে। সুতরাং কখনও তুমি জিতবে, কখনও নফস ও শয়তান জিতবে। এ কারণে হিম্মতহারা হলে চলবে না। বরং এ লড়াই অব্যাত রাখতে হবে। হেরে গেলে পুনরায় উঠে দাঁড়াতে হবে। নফস ও শয়তান নামক শত্রুর বিরুদ্ধে বারবার আঘাত হানতে হবে। এভাবে অবশেষে তোমার জয় সুনিশ্চিত হবে। কারণ, এটা আল্লাহর ওয়াদা। তিনি বলেছেন– وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ 'বিজয় মুত্তাকীদের জন্যই।'

(সূরা কাসাস-৮৩)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔

অর্থাৎ– যারা আমার রাস্তায় যুদ্ধ করেছে অর্থাৎ নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে যারা লড়াই অব্যাহত রেখেছে, তারা একদিকে টেনে নেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে, আর তুমি তাদের চেষ্টাকে বারবার নস্যাত করে দিচ্ছ; আল্লাহ বলেন, তাহলে অবশ্যই তাকে আমি আমার হিদায়াতের পথ দেখাবো।

হযরত থানবী (রহ.) বলেন, আমি এ আয়াতটির অর্থ এভাবে করি যে, যারা আমার পথে চেষ্টা-প্রয়াস চালায়, আমি তার হাত ধরে আমার পথে চালাই।

হযরত থানবী (রহ.) বিষয়টি বুঝাতে গিয়ে বলেন, এর উদাহরণ হলো একটি শিশুর মতো। যে চলার উপযুক্ত হয়নি। চলার জন্য বারবার চেষ্টা করছে। একবার পড়ে যায়, দ্বিতীয়বার উঠে। এরই মাঝে এক-দু'বারের পর মা তার হাত ধরে এবং হাটতে শিখায়। অনুরূপভাবে মানুষ যখন আল্লাহর পথে চলে তখন তাকে সহযোগিতা করেন বরং তিনি তাকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসেন। কবির ভাষায়–

سوئے مایوسی مرو امید ہاست

سوئے مایوسی مرو خورشید ہاست

তাঁর দরবারে নিরাশার কোনো স্থান নেই। সুতরাং নফস ও শয়তানের মোকাবেলা করতে থাক। ভুল হলে, বিফল হলে বা ব্যর্থ হলেও চেষ্টা অব্যাহত রাখ। লড়াই চালিয়ে যাও। ইনশাআল্লাহ একদিন সফল হবেই।

মোটকথা তুমি তোমার কাজ কর, আল্লাহ তাঁর কাজ অবশ্যই করবেন। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا وَحَاسِبُوْا قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا۔

মরার পূর্বে মরো, হিসাবের পূর্বে হিসাব দাও।

আল্লাহর কাছে হিম্মত চাও

হিম্মত ও সাহসের জন্যও আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে। অক্ষম হলে, ব্যর্থ হলে এজন্যও আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। যে গুনাহ থেকে বাঁচতে চাও, তার জন্য কদম বাড়াতে হবে এবং আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে।

আল্লাহর কাছে চাও। অভিজ্ঞতার কথা হলো, যে বান্দা আল্লাহর কাছে কামনা করে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই দান করেন। আর না চাইলে মোটেও দান করেন না।

কবির ভাষায়–

کوئی حسن شناس ادا نہ ہو تو کیا علاج
ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں

সুতরাং তাঁর কাছে চাইতে হবে। তাঁর রহমতের আঁচল অনেক প্রশস্ত। যে চারটি কাজের কথা একটু পূর্বে বলা হয়েছে, সকাল-সন্ধ্যা এগুলো করতে পারলে 'ইনশাআল্লাহ' আলোচ্য হাদীসের উপর আমল হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে মাফ করুন। এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন থেকে বেঁচে থাকুন

"আল্লাহ মহান, তাঁর কুদরত রহমত ও জ্ঞানের পরীসীমা অনুমান করারও যোগ্যতা আমাদের নেই। গোটা বিশ্ব তাঁর রহমতের কাছে ঋনী। সেই আল্লাহ যদি বলেন, এ কাজটি করো এবং ওই কাজটি করো না, তাহলে তাঁর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও মহব্বতের দাবী হলো, মানুষ এ কথা বলতে পারবে না যে, তিনি এ কাজটি কেন করতে বলেছেন এবং ওই কাজটি থেকে কেন নিষেধ করেছেন, এটাই মূলত দ্বীনের সারকথা, দ্বীন মানার জিন্দেগীর নাম, নিজেকে আল্লাহর কাছে পুরোপুরি সপে দেয়ার নাম।"

বর্তমানে নানামুখী ভ্রষ্টতার উন্মেষ ঘটার পেছনে অন্যতম কারন এটাই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর কোনো বিধান সামনে এলে মানুষ নিজ মেধা দিয়ে তার যৌক্তিকতা যাচাই করে দেখতে চায়। যুক্তির অনুকূলে হলে গ্রহন করে; প্রতিকূলে হলে অস্বীকার করে।"

অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন থেকে বেঁচে থাকুন

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًاكَثِيْرًا۔ اَمَّابَعْدُ!

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : دَعُوْنِيْ مَاتَرَكْتُمْ اِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤْلِهِمْ وَاِخْتِلَافُهُمْ عَلٰى اَنْبِيَاءِ هِمْ، فَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ، وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍفَاتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔

হামদ ও সালাতের পর!

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যতক্ষণ না কোনো বিশেষ বিষয়ে আমি তোমাদের কিছু বলবো, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দাও এবং আমাকে কোনো প্রশ্ন করো না। অর্থাৎ– যে কাজ সম্পর্কে আমি কোনো সিদ্ধান্ত দেই নি যে, এটা ফরয না ওয়াজিব কিংবা হারাম না হালাল,সেই কাজের ব্যাপারে আমাকে অহেতুক প্রশ্ন করো না, কারণ, তোমাদের পূর্বসূরী উম্মতরা যেসব কারণে নিজেদের পতন ডেকে এনেছে, তন্মধ্যে অধিক প্রশ্ন করা ছিলো অন্যতম কারণ। দ্বিতীয় কারণ ছিলো, তারা নবীদের কথা মানে নি। সুতরাং আমি যে বিষয় সম্পর্কে তোমাদেরকে 'না' বলবো, তোমরা তা থেকে বেঁচে থাকবে আর যে বিষয় করতে বলবো, তা তোমরা সাধ্যানুযায়ী করবে।

দেখুন, প্রিয়নবী (সা.) আমাদের ওপর কী পরিমাণ স্নেহ দেখিয়েছেন যে, তিনি 'সাধ্যানুযায়ী' শব্দ যোগ করেছেন। বোঝা গেলো, সাধ্যের বাইরে কোনো কাজের জবাবদিহি আমাদেরকে করতে হবে না।

কী ধরনের প্রশ্ন করা যাবে না?

অহেতুক প্রশ্নের নিন্দাবাদ উক্ত হাদীসে ফুটে ওঠেছে। অথচ অন্যান্য হাদীসে প্রশ্ন করার ফযিলত বিবৃত হয়েছে। যেমন এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

إِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّوَالُ -

'পিপাসার্তের পিপাসা প্রশ্ন করা দ্বারা নিবারণ হয়।'

এ উভয় ধরনের হাদীস যথাস্থানে সঠিক। এখানে কোনো সংঘাত নেই। বরং সামঞ্জস্যবিধান এভাবে করা হয় যে, মানুষ নিজে যেসব বিষয়ের মুখোমুখি হয়, বাস্তবজীবনে যেসব বিষয়ের বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরি হয়ে পড়ে, সেসব বিষয়ের বিধান জানা তথা সেসব বিষয়ের হালাল-হারাম সম্পর্কে অবগত হওয়ার লক্ষ্যে প্রশ্ন করার শুধু অনুমতিই নেই, বরং জরুরিও। কিন্তু যেসব বিষয়ের মুখোমুখি সে হয়নি, বাস্তবজীবনে যেসব বিষয় সম্পর্কে জানা জরুরি নয়। দ্বীন ও আখেরাতের সঙ্গে যেসব বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং শুধু খেয়ালিপনাবশত কিংবা সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে যেসব প্রশ্ন করা হয়– সেসব প্রশ্নেরই নিন্দাবাদ করা হয়েছে আলোচ্য হাদীসে।

শয়তানের চাতুরি

যেমন এক লোক আমাকে প্রশ্ন করলো, হযরত আদম (আ.) এর দু'সন্তান ছিলো– হাবিল ও কাবিল। উভয়ের মাঝে বিবাদ হয়েছিলো। ফলে কাবিল হাবিলকে হত্যা করেছিলো। এ লড়াই একটি মেয়ের কারণে হয়েছিলো। প্রশ্ন হলো, সেই মেয়ের নাম কী ছিলো?

এবার বলুন, যদি তাকে মেয়েটির নাম বলি, তাহলে এতে তার কী ফায়দা? কবরের ফেরেশতারা কি তাকে ওই মেয়েটির নাম জিজ্ঞেস করবে? হাশরের ময়দানে কি সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে? মেয়েটির নাম জানা কিংবা না জানার ওপর কি তার জান্নাত কিংবা জাহান্নাম নির্ভরশীল? আসলে এটাই হলো অহেতুক প্রশ্ন।

মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য শয়তানের চাতুরির অন্ত নেই। এটাও এক প্রকার চাতুরি। মানুষকে অর্থহীন কথা ও কাজের পেছনে

লাগিয়ে রাখা শয়তানেরই কাজ। ফলে মানুষ দ্বীন ধর্ম সম্পর্কে গাফেল হয়ে যায় এবং অযথা প্রশ্নের পেছনে শুধু ঘুরপাক খায়।

শরীয়তে বিধিবিধান সম্পর্কে যৌক্তিকতার প্রশ্ন

বর্তমানে তো যেন অর্থহীন প্রশ্ন করার হিড়িক পড়েছে। মানুষ আজ ব্যাপকহারে এ ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। শরীয়তের বিধিবিধান সম্পর্কে কথা ওঠলেই সেখানে যৌক্তিকতার প্রশ্ন তোলে। যদি বলা হয়, ইসলামের বিধান হলো, অমুক কাজ করা যাবে আর অমুক কাজ করা যাবে না, তখনই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া হয় যে, কেন করা যাবে আর কেন করা যাবে না? এটা হারাম হওয়ার কারণ কী আর ওটা হালাল হওয়ার কারণ কী?

এ জাতীয় প্রশ্ন শুনলে মনে হয়, প্রশ্নকারী যেন বোঝাতে চাচ্ছে যে, বিষয়টি আমাদের বুদ্ধিসমর্থিত হলে মানবো, অন্যথায় মানবো না। অথচ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, যখন আমি কোনো বিষয়ে তোমাদের না, করবো, তখন সেটা তোমরা করো না কেন নিষেধ করেছি এর পেছনেও পড়ো না।

এ জাতীয় প্রশ্নের চমৎকার উত্তর

একবার এক ভদ্রলোক হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এর দরবারে এলেন এবং শরীয়তের কোনো বিধান সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, অমুক জিনিস হারাম করা হয়েছে কেন? এর কারণ কী? কী রহস্য রয়েছে এতে? হযরত থানভী (রহ.) তাকে বললেন, এর আগে আপনি আমাকে একটি প্রশ্নের উত্তর দিন। তবেই আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবো। লোকটি বললেন, কী সে প্রশ্ন? হযরত থানভী প্রশ্ন করলেন, বলুন তো আপনার নাক সামনের দিকে কেন লাগানো হয়েছে? পেছনের দিকে লাগানো হয় নি কেন?

হযরত থানভী (রহ.) এর উক্ত প্রশ্ন দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলো, আল্লাহর কুদরতের এ কারখানা হেকমত বা রহস্য থেকে মুক্ত নয়। তবে সকল হেকমত আমাদের জানা থাকা জরুরি নয়।

আল্লাহর হেকমত অসীম, আমাদের মেধা সসীম। সসীম মেধা দিয়ে অসীম হেকমত অনুধারণ করা সম্ভব নয়। এ ছোট্ট মেধা দিয়ে আল্লাহর অসীম কুদরতের হিসাব নেওয়া বোকামি বৈ কিছু নয়। দেখুন, বর্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের যুগ। এ ক্ষুদ্র মেধার কাজ কি এবং এর কাজের পরিধি কতটুকু এসব প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ উত্তর আজকের বিজ্ঞানও দিতে পারেনি। বিজ্ঞানের বক্তব্য হলো,

মানব-মেধার অধিকাংশ অংশ সম্পর্কে মানুষ এখনও জানে না যে, তার কাজ কী? কাজেই এ মেধা দ্বারা মোটেও সম্ভব নয়। আল্লাহর প্রতি যাদের ভক্তি ও বিশ্বাস কম, তারাই মূলত এ জাতীয় প্রশ্ন করে।

আল্লাহর হেকমত ও অন্তর্নিহিত রহস্যসমূহের মাঝে দখলদারিত্ব করো না

যেমন এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ তা'আলা ফজরের নামায দুই রাকা'আত, যোহরের চার রাকা'আত, আসরের চার রাকা'আত এবং মাগরিবের তিন রাকা'আত ফরয করেছেন। কিন্তু কী কারণে এসব নামাযের মধ্যে পার্থক্য করেছেন? এতে কী রহস্য? ফজরের সময় মানুষ অবসর থাকে, তাই ফজর নামায যদি চার রাকাআত হতো এবং আসরের সময় মানুষ ব্যস্ত থাকে, তাই তা যদি দু'রাকা'আত তাহলে কতইনা ভালো হতো!

এ জাতীয় প্রশ্ন কিংবা যুক্তি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হেকমত ও কাজের মধ্যে দখলদারিত্বেরই নামান্তর। প্রশ্ন কিংবা যুক্তি আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে চলে না। এ ধরনের দখলদারিত্বের অবকাশ ইসলামে নেই। তাই আলোচ্য হাদীসে এ থেকে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। 'কেন' প্রশ্ন সাহাবায়ে কেরাম করতেন না।

সাহাবায়ে কেরামের জীবনী পর্যালোচনা করে দেখুন, কোথাও এটা পাবেন না যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে 'কেন' শব্দ দ্বারা প্রশ্ন করেছেন। অমুক বিধান কেন দেয়া হয়েছে-এ জাতীয় প্রশ্ন তাঁদের কাছ থেকে মোটেও পাওয়া যায় না। তাহলে তাদের মেধার কি কমতি ছিলো? তাঁরা কি শরীয়তের বিধিবিধানের হেকমত বুঝতে অপারগ ছিলেন? এমনটি মোটেও নয়; বরং মূলত তাঁদের মেধা, প্রতিভা ও বুদ্ধির পরিমাপ করার মত যোগ্যতাও আমাদের নেই। বর্তমানের বুদ্ধিজীবিদের মেধা তাঁদের মেধার ধারেকাছেও যেতে পারবে না। তবুও তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সামনে ছিলেন বিনীত ও নিশ্চুপ। অহেতুক প্রশ্ন কিংবা 'এ বিধান কেন' এ জাতীয় প্রশ্ন তাঁরা প্রিয়নবী (সা.) এর সামনে কখনও ছোঁড়েন নি। হ্যাঁ, শরীয়তের বিধিবিধান তাঁরা জিজ্ঞেস করেছেন অবশ্যই। কিন্তু বিধান জানার পর তার যৌক্তিকতা খোঁজেন নি। কারণ, তাঁরা আল্লাহকে মনে-প্রাণে মেনেছেন, স্রষ্টা ও মালিক হিসাবে আল্লাহকে তাঁরা জেনেছেন। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) কে আল্লাহর রাসূল হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং এর দাবী হলো, যে বিধানই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর পক্ষ থেকে আসে, সেটাই বিনা দ্বিধায় ও বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়া, এর মাঝে যৌক্তিকতা খুঁজে বের করার কোনো অবকাশ নেই। তাই সাহাবায়ে কেরাম 'কেন' প্রশ্ন থেকে বিরত থাকতেন।

আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা পরিপূর্ণ নয়, এটা তারই প্রমাণ

আব্বাজান মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.) প্রায় বলতেন, শরীয়তের বিধিবিধানের ব্যাপারে যাদের মাঝে শুধু সন্দেহ জাগে, তারা মূলত আল্লাহর তা'আলাকে পরিপূর্ণ ভক্তি করে না। আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা কম এটা তারই প্রমাণ। কারণ, যার প্রতি অগাধ ভক্তি ও নিখাঁদ ভালোবাসা আছে, তাঁরই দেয়া বিধিবিধান অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেয়াটাই কাম্য। তাঁর বিধিবিধানের ক্ষেত্রে সন্দেহ কখনও হতে পারে না। দুনিয়ার ব্যাপারেই দেখুন, যার প্রতি আমাদের ভক্তি থাকে, তিনি কোনো কথা বললে আমরা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করি, এর পেছনে যুক্তি থাকলেও গ্রহণ করি এবং না থাকলেও এ বলে গ্রহণ করি যে, এত বড় মানুষ একটা কথা বলেছেন, নিশ্চয় কোনো না কোনো কারণে বলেছেন।

আল্লাহ মহান। তাঁর কুদরত, রহমত ও জ্ঞানের পরিসীমা অনুমান করারও যোগ্যতা আমাদের নেই। গোটা বিশ্ব তাঁর রহমতের কাছে ঋণী। সেই আল্লাহ যদি বলেন, অমুক কাজটি করো এবং অমুক কাজটি করো না, তাহলে তাঁর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও মহব্বতের দাবী হলো, মানুষ এ কথা বলতে পারবে না যে, তিনি একাজটি কেন করতে বলেছেন এবং ওই কাজটি থেকে কেন নিষেধ করেছেন?

এটাই মূলত দ্বীনের সারকথা। দ্বীন মানার জিন্দেগীর নাম। নিজেকে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ সপে দেয়ার নাম দ্বীন। অন্তর থেকে সন্দেহ, সংশয় দূর করে দেয়ার নাম দ্বীন।

বর্তমানে নানামুখী ভ্রষ্টতার উন্মেষ ঘটার পেছনে অন্যতম কারণ এটাই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর কোনো বিধান সামনে এলে মানুষ নিজ মেধা দিয়ে তার যৌক্তিকতা বুঝতে চায়। যুক্তির অনুকূলে হলে গ্রহণ করে আর প্রতিকূলে হলে অস্বীকার করে।

শিশু ও চাকরের উদাহরণ

ছোট্ট শিশু এখনও কিছু বোঝে না। মা কিংবা বাবা যদি তাকে কোনো কাজ করতে, বলেন তখন সে যদি বলে, একাজটি আমি কেন করবো, এটা করলে কি ফায়দা হবে– তবে ওই শিশু কখনও সঠিক দীক্ষা পাবে না।

শিশুর কথা পরে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মেধাবী চাকরের কথাই ধরুন। মালিক যদি তাকে বলে, বাজারে যাও, অমুক জিনিসটি নিয়ে আস। তখন সেই চাকর যদি এ উত্তর দেয় যে, জিনিসটি কেন আনতে হবে, কি কারণে আমি জিনিসটি আনবো, এতে আমার কিংবা আপনার কি ফায়দা হবে? তাহলে সেই চাকর অবশ্যই বহিষ্কারযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কারণ, সে চাকরির ভাষা ও দাবী বোঝে না। চাকরের কাজ হলো শুধু মালিকের হুকুম পালন করা-এ কথা সে জানে না।

এতো গেলো একজন চাকরের কথা। চাকর মানুষ এবং মালিকও মানুষ। মেধার দিক থেকে উভয়ের মাঝে মিলও রয়েছে। চাকরের মেধা সীমিত এবং মালিকের মেধাও সীমিত। আর আমরা তো আল্লাহর গোলাম। কোথায় আমাদের সীমিত মেধা আর কোথায় তাঁর অসীম জ্ঞান। উভয়ের মাঝে তো আসমান-যমিন ফারাক। কাজেই একজন চাকরের বেলায় যদি 'কারণ' জিজ্ঞেস করার অহেতুক প্রবণতা দূষণীয় হতে পারে, তবে একজন গোলাম প্রভুর হুকুমের মাঝে 'অহেতুক প্রশ্ন' করার দুঃসাহস কিভাবে দেখাতে পারে?

সারকথা

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) তিন ধরনের প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছেন। এক. বাস্তবজীবনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এ জাতীয় প্রশ্ন করা। দুই. অপ্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা। তিন. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত বিধিবিধানে অহেতুক প্রশ্ন সৃষ্টি করা। যে প্রশ্নের উদ্দেশ্য এটা হয় যে, বুঝে এলে আমল করবে এবং বুঝে না এলে আমল করবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, পূর্ববর্তী উম্মতেরা এ তিন জাতীয় প্রশ্ন অধিক করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই তোমরাও অধিক প্রশ্ন থেকে বেঁচে থাক। আর কোনো বিষয় সম্পর্কে তোমাদেরকে যদি বলি, এটা করো না, তখন তোমরা তা থেকে দূরে থাকবে। কেন করবো না– এ জাতীয় প্রশ্ন কখনও করবে না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔

আধুনিক লেনদেন এবং উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব

"আধুনিক মাস'আলার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের কর্তৃত্ব সাধারণ জনগণের ওপর থেকে ফসকে গেছে। যে লোকগুলো সকাল-বিকাল উলামায়ে কেরামের হাতে চুমু খায়, নিজেদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন, ছেলে-মেয়ের বিয়ে-শাদি এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে দু'আ করায়, সেই লোকগুলোকেই যদি উলামায়ে কেরাম বলেন যে, ব্যবসা এভাবে নয়, এভাবে করুন অথবা নির্বাচনে ভোটটা একজন আলেমকে দিন, তাহলে এ জনসাধারণই উলামায়ে কেরামের কথাকে সাধুবাদ জানায় না। কারণ, তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে যে, দুনিয়াতে চলার জন্য আলেমসমাজ থেকে যথাযথ দিক-নির্দেশনা পাওয়া যাবে না। জনগণের মাঝে এবং আলেমসমাজের মাঝে এটা এক বিশাল দেয়াল। এ দেয়াল যতক্ষণ না ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হবে, সমাজের বিশৃঙ্খলা দূর হবে না।"

আধুনিক লেনদেন এবং উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًاكَثِيْرًا ـ اَمَّابَعْدُ!

হামদ ও সালাতের পর!

হযরত উলামায়ে কেরাম! আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনারা আমাদের দাওয়াত কবুল করেছেন, দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি সহ্য করে এ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। আল্লাহ আপনাদের ত্যাগ কবুল করুন, আমীন।

কেন এ প্রশিক্ষণকোর্স?

আমরা আজ এ প্রশিক্ষণকোর্স শুরু করতে যাচ্ছি। আজকের এ সেমিনারে আমি কোর্সের প্রয়োজনীয়তা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সংক্ষেপে উপস্থাপন করার আশা রাখি ইনশা'আল্লাহ।

মুসলমান মাত্রই অনুধাবন করছে, বিশেষ করে উলামায়ে কেরাম বিষয়টি তীব্রভাবে অনুধাবন করছেন যে, যখন থেকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্য লাভ করলো, তখন থেকেই দ্বীন-ধর্মকে অত্যন্ত কৌশলে ও স্থূল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শুধু মসজিদ-মাদরাসা এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে

দেয়া হলো। রাজনীতি এবং সমাজজীবনে দ্বীন ধর্মের ভূমিকা যে শুধু ঢিলেঢালা হয়ে গেলো তা নয়, বরং ধীরে ধীরে একেবারে শেষ হয়ে গেলো।

আসলে এটা ছিলো ইসলামের শত্রুদের একটা বিশাল ষড়যন্ত্র। এর মাধ্যমে তারা ধর্মের ব্যাপারে এক নেতিবাচক ধারণা দিতে চাচ্ছে, যে ধারণার প্রধান পতাকাবাহী হলো পশ্চিমাবিশ্ব। পশ্চিমাবিশ্বে ধর্ম সম্পর্কে ধারণা হলো, ধর্ম মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার তথা প্রাইভেট বিষয়। একজন মানুষ তার জীবনাচারে আদৌ কোনো ধর্মের অনুসরণ করবে কি-না কিংবা করলেও কোন্ ধর্মের করবে এ ব্যাপারে সে স্বাধীন। বর্তমানে ধর্ম সম্পর্কে তাদের ধারণা হলো, সত্য-মিথ্যার সঙ্গে ধর্মের কোনো বন্ধন নেই। ধর্ম মানে মানুষের আধ্যাত্মিক প্রশান্তির একটা মাধ্যম। আত্মিক প্রশান্তির জন্য মানুষ যে- কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। কারো কাছে যদি পৌত্তিলকতা ভালো লাগে, মূর্তিপূজায় যদি সে আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে, তাহলে সে সেটাই গ্রহণ করবে। এখানে সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন দেখার বিষয় নয়। কোন্ ধর্ম সত্য আর কোন্ ধর্ম মিথ্যা– এটা মোটেও বিবেচ্য নয়। বরং বিবেচ্য বিষয় হলো, কোন ধর্মের মাধ্যমে সে আত্মপ্রশান্তি বেশি অনুভব করছে। এ সুবাদে মানুষ যে ধর্মই গ্রহণ করবে, সেটাই সম্মান পাওয়ার যোগ্য। আর এটা যেহেতু একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়, তাই জীবনের অন্যান্য অঙ্গনে এর কার্যকারিতার প্রশ্নই ওঠে না।

ধর্মহীন গণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি

এখান থেকেই দৃষ্টিভঙ্গি অস্তিত্ব লাভক করেছে, যাকে আজকের পরিভাষায় 'সেক্যুলারিজম' বলা হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গির সারকথা হলো, মানবজীবনের যে বিষয়গুলো সামাজিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত– যেমন সমাজনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি–এগুলো সব ধর্মীয় বন্ধন থেকে মুক্ত। মানুষ নিজ বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষদর্শিতার মাধ্যমে যে পদ্ধতিকে নিজেদের জন্য ভালো মনে করবে, সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করবে। এতে ধর্মের কোনো খবরদারি করা উচিত নয়।

ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ যে ধর্ম অবলম্বন করে আত্মিক প্রশান্তি খুঁজে পাবে, সেটাই সে গ্রহণ করবে। কারো এ কথা বলার অধিকার নেই যে, তোমাদের এই ধর্ম বাতিল। প্রত্যেকেই নিজধর্ম পালনে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর এটা এজন্য নয় যে, এটা তার অধিকার। বরং এজন্য যে, এর মাধ্যমে সে আত্মপ্রশান্তি লাভ করে।

অন্য ভাষায় বলা যায়, ধর্মের ব্যাপারে পশ্চিমা চিন্তাধারা হলো, ধর্মের কোনো বাস্তবতা নেই। ধর্ম হচ্ছে আত্মপ্রশান্তির একটা মাধ্যম। অতএব জাগতিক কর্মব্যস্ততার ফাঁকে অবসর সময়ে কেউ যদি বানরের চাতুরি দেখে

আত্মপ্রশান্তি খুঁজে পায়, তাহলে তার জন্য বাদরের বাদরামিই উত্তম। আর বাঁদরের বাঁদরামির সঙ্গে যেমনিভাবে বাস্তব জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই, অনুরূপভাবে কারো কাছে যদি মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে ভালো লাগে, আত্মিক সুখ লাভ হয়, তাহলে সেটাই তার জন্য উত্তম। মসজিদের সঙ্গে বাস্তবজীবনের কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ ধর্ম পালনের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাওয়াটা ভালো না-কি মন্দ এটা বিবেচ্য বিষয় নয়, আলোচ্য বিষয়ও নয়। এটা মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। নাউযুবিল্লাহ।

উক্ত চিন্তাধারাই বর্তমানে পশ্চিমাবিশ্বে সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে। এর অপর নাম- সেক্যুলার ডেমোক্রোসি তথা ধর্মমুক্ত গণতন্ত্র।

চূড়ান্ত মতবাদ

এখন তো বলা হচ্ছে, বিশ্বের সব মতবাদ, সব চিন্তাধারা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। শুধু একটি মতবাদই এখন এমন আছে, যা অব্যর্থ, যা কখনও ব্যর্থ হবার নয়। আর তাহলো– সেক্যুলার ডেমোক্রেসি বা ধর্মহীন গণতন্ত্র। সোভিয়ত ইউনিয়নের যখন পতন শুরু হলো, তখন পশ্চিমা দেশগুলোতে যেন আনন্দের ঢেউ খেলা করছিলো। সে সময়ে তারা একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলো, যা বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগিয়েছিলো। গ্রন্থটির লাখ লাখ কপি বিক্রি হয়েছিলো এবং সমাকলীন যুগের সবচে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে বিশ্বব্যপী তাকে তুলে ধরা হয়েছিলো। গ্রন্থটি গবেষণাধর্মী নিবন্ধের আদলে লেখা হয়েছিলো। লিখেছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র। গ্রন্থটির নাম দেয়া হয়েছিলো– The end of the history and the last man অর্থাৎ– ইতিহাসের পরিসমাপ্তি এবং সর্বশেষ মানব।

গ্রন্থটির সারবক্তব্য ছিলো, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে একটি ইতিহাসের পরিসমাপ্তি হয়েছে এবং সব বিবেচনায় একজন পূর্ণাঙ্গ সর্বশেষ মানবের উদ্ভব ঘটেছে। অর্থাৎ– সেক্যুলার ডেমোক্রেসির চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটেছে। ভবিষ্যত পৃথিবীতে এর চেয়ে উত্তম কোনো মতবাদ অস্তিত্ব লাভ করবে না।

তোপ-কামানের মুখে কী বিস্তার লাভ করেছে?

পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ যখন মুসলিম বিশ্বের ওপর আধিপত্য বিস্তার করলো, তখন তারা এ সেক্যুলার ডেমোক্রেসি তথা ধর্মহীন গণতন্ত্রেরই প্রচার করেছে। এটা করেছে সম্পূর্ণ পেশীশক্তির জোরে।

মুসলমানদের ওপর এই অভিযোগ ছিলো যে, ইসলাম প্রচার-প্রসার লাভ করেছে তরবারির জোরে। অথচ খোদ পশ্চিমাবিশ্বই তাদের ধর্মহীন গণতন্ত্রকে জোর করে, তোপ কামানের মুখে বিশ্ববাসীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। এ দিকে ইঙ্গিত করে মরহুম আকবর ইলাহাবাদী কবিতা লিখেছিলেন যে–

اپنے عیبوں کی کہاں آپ کو کچھ پرواہ ہے

غلط الزام بھی اوروں پہ لگار کھا ہے

یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام

یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے

নিজেদের দোষ সম্পর্কে নেই কোনো পরোয়া,
তারপরও অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখেছে মিথ্যা অভিযোগ।
বলছে তারা ইসলাম প্রসার লাভ করেছে তরবারির জোরে,
এটা বলছে না যে, তোপের মুখে কী বিস্তার লাভ করেছে?

পশ্চিমারা প্রথমে তোপ কামানের মুখে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এরপর ধীরে ধীরে রাজনীতিসহ সামাজিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে ধর্মের বন্ধন ছিন্ন করেছে। আর এই বন্ধন ছিন্ন করার লক্ষ্যে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার জন্য দিয়েছে, লর্ড ম্যাকেলের এক উক্তির মাধ্যমে আমার যার অন্তর্নিহিত রূপরেখা জানতে পারি। তিনি কোনো রাখঢাক ছাড়াই সরাসরি বলেছিলেন, আমরা এক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাই, যার মাধ্যমে এমন এক প্রজন্ম সৃষ্টি হবে, যারা বর্ণ ও ভাষার দিক থেকে হিন্দুস্তানি হলেও চিন্তা-চেতনায় তারা হবে নিখাঁদ ইংরেজ। বাস্তবেই তারা শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে। এ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে। এর দ্বারা রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতিসহ জীবনের অন্যান্য অঙ্গণের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে এবং ধর্মকে একেবারে সঙ্কীর্ণ করে ফেলেছে।

কিছুটা দুশমনের ষড়যন্ত্র, কিছুটা আমাদের উদাসীনতা

একদিকে যেমনিভাবে ছিলো ইসলামের দুশমনদের এ ষড়যন্ত্র, অপরদিকে এ ষড়যন্ত্র সফল হওয়ার পেছনে আমাদের কর্মপদ্ধতিও তেমনিভাবে সমান অংশীদার। আমরা আমাদের জীবনে যতটুকু জোর ও গুরুত্ব ইবাদতের ওপর দিয়েছি, ততটা জোর ও গুরুত্ব জীবনের অন্যান্য বিভাগের ওপর দিই নি। অথচ ইসলাম পাঁচটি বিষয়ের সমন্বয়ের নাম। আকাইদ, ইবাদাত, মু'আমালাত,

মু'আশারাত এবং আখলাক। আকাইদ ইবাদাতের গুরুত্ব আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কিন্তু অবশিষ্ট তিনটি বিভাগের ওপর আমরা ততটা নজর দিইনি, যতটা দেয়া প্রয়োজন ছিলো। আর এই গুরুত্ব না দেয়ার কারণ দুটি–

প্রথম কারণ এই যে, আমরা আকাইদ এবং ইবাদাত ঠিক করার ক্ষেত্রে যতটা গুরুত্ব অনুভব করেছি, ততটা গুরুত্ব অনুভব করিনি মু'আমালাত মু'আশারাত এবং আখলাক শুদ্ধ করার ক্ষেত্রে। যার ফলে কেউ নামায ছেড়ে দিলে তাকে ধার্মিক-পরিবেশে মহা অপরাধী মনে করা হয়। অবশ্য এটা মনে করা উচিতও। কারণ, সে আল্লাহর একটি ফরয বিধান ছেড়ে দিয়েছে এবং দ্বীনের একটি ভিতকে নড়বড়ে করে দিয়েছে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি নিজের মু'আমালাত তথা লেনদেনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে কিংবা অমার্জিত চরিত্রগুলোকে সংশোধন না করে, তাহলে তাকে সমাজের চোখে ততটা খারাপ মনে করা হয় না।

দুই দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার ক্ষেত্রে ইবাদতের অধ্যায়গুলো যতটা গুরুত্বের সঙ্গে পড়ানো হয়, ততটা গুরুত্ব মু'আমালাত, মু'আশারাত ও আখলাক বিষয়ক অধ্যায়গুলোতে দেয়া হয় না। ফিকহশাস্ত্রে কিংবা হাদীস শাস্ত্রের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান, গবেষণা, পর্যালোচনা, ব্যাখ্যা, তাহকীক ও তাশরীহ ইত্যাদি পর্যন্ত এসে সকল তোড়-জোড় নিস্তেজ হয়ে যায়। খুব বেশি হলে 'নিকাহ' কিংবা তালাক পর্যন্ত চলে। আরো সামনে গেলে হয়ত 'কিতাবুল বুয়ু' পর্যন্ত হেলাফেলা অবস্থায় করা হয়। তবে আনুষঙ্গিক আলোচনার ক্ষেত্রে সে রকম গুরুত্ব দেয়া হয় না, যেমন গুরুত্ব দেয়া হয় ইবাদাতের জুযয়ী', ফুরঈ' তথা শাখা-প্রশাগত মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে। যেমন 'রফয়ে' ইয়াদাইন'-এর মাসআলা 'আওলা-খেলাফে আওলা'র চেয়ে বেশি কিছু নয়। অথচ এই একটিমাত্র মাস'আলার পেছনে তিন দিন পর্যন্ত চলে যায়। অথচ মু'আমালাত ও আখলাক বিষয়ে যে অধ্যায়গুলো আছে, সে সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ আলোচনা করা হয় না।

ছাত্রর ওপর শিক্ষাপদ্ধতির প্রভাব

আমাদের উক্ত শিক্ষাপদ্ধতি যেন বলে দিচ্ছে, বিষয়টা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। যার অনিবার্য ফল দাঁড়ায়, এ মাদরাসাগুলো থেকে একজন ছাত্র লেখাপাড়া শেষ করে বের হয়ে যখন দেখে যে, শিক্ষাবর্ষের দশ মাসের মধ্যে আট মাসই চলে গেলো আকাঈদ ও ইবাদাতের আলোচনায় আর দ্বীনের অবশিষ্ট অধ্যায়গুলো সম্পর্কে আলোচনা শেষ হলো শুধু দুই মাসে, তখন তার অজান্তেই তার মাঝে এই প্রভাব গেঁড়ে বসে যে, আকাইদ ও ইবাদাত ছাড়া দ্বীনের অবশিষ্ট

বিষয়গুলোর মর্যাদা বা গুরুত্ব হলো দ্বিতীয় স্তরের। অর্থাৎ– এর তেমন গুরুত্ব নেই।

এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার পেছনে অবশ্য কিছুটা অপারগতাও ছিলো। তাহলো, ইসলামের শত্রুদের চক্রান্তের কারণে মূলত বাজারে, অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে দ্বীনের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলো না। ফলে মু'আমালাত, মু'আশারাত ও আখলাক বিষয়ক মাসআলাগুলো কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিশাল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, যার কারণে যেসব মাসআলা এ বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেগুলো শুধু থিউরিক্যাল বিষয়ের ব্যাপারে সে ধরনের গুরুত্ব থাকে না, যে ধরনের থাকে প্র্যাকটিক্যাল বিষয়ে এবং জীবনঘনিষ্ঠ কর্মকাণ্ডে।

উক্ত অপারগতা যথাস্থানে বাস্তব। কিন্তু এটাও এক তিক্ত বাস্তবতা যে, আমাদের পড়া-শোনার ক্ষেত্রেও মু'আমালাত, মু'আশারাত ও আখলাকের অধ্যায়গুলো অনেক পেছনে পড়ে গিয়েছে। এমনকি এগুলো সম্পর্কে মৌলিক ধারণা পর্যন্ত আমাদের অনেকের নেই। এখন বড় বড় শিক্ষাবিদ, আলেম ও গবেষকও অনেক সময় এসব বিষয় সম্পর্কে হিমশিম খান। এটাই হলো আমাদের ভেতরগত অবস্থা। আর প্রশাসনের অবস্থা তো আরো নাজুক। ইংরেজ আর তাদের এসব ভাবশিষ্যের মাঝে বর্তমানে কোনো তফাৎ নেই। তারা যে চিন্তাধারা লালন করে, এরাও সেই একই চিন্তাধারার পরিচর্যা করে।

আর সাধারণ মুসলমানদেরকে দুই শ্রেণীতে চিহ্নিত করা যায়। এক শ্রেণী হলো, যারা ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় পড়া-শোনা করে এবং তাদের ষড়যন্ত্রের জালে আটকা পড়ে তাদেরই চিন্তা-চেতনায় বেড়ে ওঠেছে। আসলে তারা ধর্মের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। নামে মুসলমান হলেও বাস্তবে ইসলামের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা মনে করে, আদমশুমারিতে আমার নাম মুসলমান হিসাবে থাকলে থাক– তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আমাকে জীবন চালাতে হবে সেভাবেই, যেভাবে চলছে বর্তমানের দুনিয়া। আর আকাইদ, ইবাদাত, মুআমালাত ইত্যাদি ঠিক আছে কি-না এটা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। মনে হয়, এ শ্রেণীর মানুষ ধর্মকে নিয়ে ছেলেখেলায় মত্ত।

পক্ষান্তরে অন্য শ্রেণীটি হলো, যারা মুসলমান হিসাবে বেঁচে থাকতে চায়। ইসলামকে তারা ভালোবাসে। দ্বীনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আছে। দ্বীন থেকে ছিটকে পড়ুক–এটা তারা ভাবতেও পারে না। এ শ্রেণীর লোকেরা কোনো না কোনোভাবে উলামায়ে কেরামের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখেন। কিন্তু সেটা সর্বোচ্চ আকাইদ ও ইবাদাতের গণ্ডিতেই আবদ্ধ। আরেকটু অগ্রসর হলে বিবাহ কিংবা তালাক পর্যন্ত গড়াতে পারে। এরপর আর সামনে অগ্রসর হয় না।

দেশের দারুল-ইফতাগুলোতে খোঁজ নিলে দেখা যাবে, সেখানেউত্তাপিত অধিকাংশ ইসতিফতা' তথা প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা আকাইদ, ইবাদাত, বিবাহ ও তালাক সম্পর্কে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য লেনদেন সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন আসে না। এলেও তা হাতে গোনা। এর কারণ কি? অথচ এরাই তো আমাদের কাছে ইবাদাত বিষয়ক প্রশ্ন পাঠায়। বিবাহ-তালাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে! সেই এরাই মুআমালাত, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজ-কারবার সম্পর্কে আমাদের কাছে কিছু জানতে চায় না কেন?

সেক্যুলারিজমের প্রোপাগান্ডা

এর একটি কারণ সেক্যুলারিজমের প্রোপাগাণ্ডা। অর্থাৎ-'ধর্ম কিছু ইবাদত-বন্দেগীর নাম। এছাড়া জীবনের ব্যাপক পরিসরে এর কোনো ভূমিকা নেই।' এ প্রোপাগান্ডার অনিবার্য ফল দাঁড়িয়েছে, অনেকের মধ্যে এ চিন্তাই আসে না যে, আমি যে কাজটি করেছি-সেটি বৈধ না অবৈধ?

আমি আপনাদেরকে একটি বাস্তব ঘটনা বলছি। এক ভদ্রলোক আব্বাজান মুফতি শফি রহ. এর কাছে আসা-যাওয়া করতেন। ভদ্রলোক ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী। তার হাতে সবসময় তাসবীহ থাকতো, আব্বাজানের কাছ থেকে বিভিন্ন ওযিফা নিতেন। তাহাজ্জুদ নামাযও তিনি আদায় করতেন নিয়মিত। কিন্তু অনেক দিন পর জানা গেলো, তার সব ব্যবসা-বাণিজ্য সুদনির্ভর। তিনি অযিফা আদায় করতেন আর সুদের হিসাব কষতেন। সেক্যুলার-প্রোপাগাণ্ডার কু-প্রভাব এতটাই বিস্তৃত হয়েছে যে, এ লোকগুলো যদিও জানেন যে, লেন-দেনের মধ্যে হালাল হারাম বলতে একটা কিছু আছে। কিন্তু এই দীর্ঘদিনে উলামা এবং সাধারণ মানুষের মাঝে এত শোচনীয় দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে যে, এক শ্রেণী আরেক শ্রেণীর কথ বোঝে না। এদের চিন্তাধারা একরকম, তাদের চিন্তাধারা অন্যরকম। এদের ভাষা ভিন্ন, তাদের ভাষা ভিন্ন। যার কারণে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে নিজেদের বক্তব্য বোঝাতেও সক্ষম হয় না।

আমাদের মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় মু'আমালাত তথা লেন-দেনের বিষয়ের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শনের কারণে উলামায়ে কেরামেরও একটা বিশাল অংশ এমন আছেন, যাদের নামায-রোযা, বিবাহ-তালাক ইত্যাদি মাসআলাগুলো তো মনে থাকে; কিন্তু লেনদেনের মাসআলাগুলো তাদের স্মরণে থাকে না। বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের আধুনিক পদ্ধতি এবং তার শরঈ-বিধান বের করার যোগ্যতা তাদের নেই। যার ফলে একদিকে ব্যবসায়ীরা যেমনিভাবে একজন আলেমকে নিজেদের সমস্যা বোঝাতে পারেন না। যদি বুঝানোর চেষ্টাও করেন, তাহলেও কয়েক ঘন্টা চলে যায়। তেমনিভাবে অপরদিকে ওই আলেমও মাস'আলাটির সমাধান বের করা যায়, তা তার জানা নেই। যার কারণে একজন

আলেম সেই ব্যবসায়ীকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন না। পরিণতিতে ব্যবসায়ীর মনে এ ধারণাটিই জায়গা করে নেয় যে, এ সমস্যার কোনো সমাধান আলেমদের কাছে নেই। সুতরাং এ ব্যাপারে তাদের কাছে যাওয়াই অর্থহীন। কাজেই নিজেরা যা বুঝো-তাই কর। এর দুঃখজনক ফলাফল হলো, আজ আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, সমাজনীতি, রাজনীতি সব সেক্যুলার ডেমোক্রেসির নীতিমালার অধীনে চলছে। ইসলামের কোনো দখলদারিত্ব আজ এসব অঙ্গনে নেই।

জনগণ এবং উলামায়ে কেরামের মাঝে বিস্তর দূরত্ব

এটা বর্তমানে দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, এসব নিত্যনতুন উদ্ভূত মাসআলার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের কর্তৃত্ব সাধারণ জনগণের ওপর থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যে লোকগুলো সকাল-বিকাল আমাদের হাতে চুমু খায়, নিজেদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন, ছেলে-মেয়ের বিয়েশাদি এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে দু'আ করায়, সেই লোকগুলোকেই যদি উলামায়ে কেরাম বলেন যে, ব্যবসা এভাবে নয়, এভাবে করুন অথবা নির্বাচনে ভোটটা একজন আলেমকে দিন, তাহলে এ জনসাধারণই উলামায়ে কেরামের কথাকে সাধুবাদ জানায় না। কারণ, তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে যে, দুনিয়াতে চলার জন্য আলেম-সমাজ থেকে যথাযথ দিক-নির্দেশনা পাওয়া যাবে না।

তাদের আর আমাদের মাঝে এটা এক বিশাল দেয়াল। এ দেয়াল যতক্ষণ না ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজের বিশৃঙ্খলা দূর হবে না। বাধার এ প্রাচীর ভাঙ্গার জন্য আমাদের কর্মকৌশল বিভিন্ন ধরনের হতে পারো। কিন্তু এ মুহূর্তে আমার বিষয় সেটা নয়।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলে দিতে চাই। এ দেয়াল ভাঙ্গার কথা বিভিন্ন গোষ্ঠি থেকে আজ উত্থাপিত হচ্ছে। এমনকি আধুনিক শিক্ষিতদের পক্ষ থেকেও বলা হচ্ছে। কিন্তু মাওলানা ইহতেশামুল হক থানভী রহ. এর বক্তব্য ছিলো যে, এসব আধুনিক শিক্ষিত ও আধুনিকতাপ্রিয় মানুষ যে এ ব্যবধানের দেয়াল ভেঙ্গে দেয়ার কথা বলে- এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্যে হলো, এ দেয়ালের নিচে আলেম-সমাজকে দাফন করে দাও, তবেই সব বিভেদ ঘুচে যাবে।

যিনি যুগসচেতন নন, তিনি অজ্ঞ

উলামায়ে কেরামকে যুগসচেতন হতে হবে যে, সমাজে হচ্ছেটা কি? আমাদের পূর্বসুরী ফুকাহায়ে কেরাম অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন বিধায় তারা বলে গিয়েছেন–

مَنْ لَمْ يَعْرِفْ اَهْلَ زَمَانِهٖ فَهُوَ جَاهِلٌ۔

যে ব্যক্তি যুগসচেতন নন, তিনি অজ্ঞ– আলেম নন।'

কারণ, যেকোনো মাসআলার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তার 'সূরতে-মাসআলা' তথা বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া। তাই তো ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন–

اِنَّ تَصْوِيْرَا لْمَسْئَلَةِ نِصْفُ الْعِلْمِ۔

'সূরতে-মাসআলা হলো ইলমের অর্ধেক।' যতক্ষণ পর্যন্ত 'সূরতে-মাসআলা' স্পষ্ট না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক সমাধানও দেয়া যাবে না। আর সূরতে-মাসআলার সঠিক উপলব্ধির জন্য সমকাল ও আধুনিক লেনদেন সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া আবশ্যক। সম্ভবত আমি ইমাম সারাখসী'র কিতাব 'মাবসূত' এ পড়েছি যে, ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর অভ্যাস ছিলো, তিনি বাজারে ব্যবসায়ীদের কাছে যেতেন এবং তাদের পারস্পরিক লেনদেনের পদ্ধতি দেখতেন। একবার এক লোক তাকে বাজারে দেখে জিজ্ঞেস করলো, আপনি তো কিতাব পড়েন আর পড়ান, এখানে কীভাবে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি এখানে এসেছি ব্যবসায়ীদের ব্যবসাপদ্ধতি লেনদেন ও তার পরিভাষা ইত্যাদি জানার জন্য। অন্যথায় আমি সঠিক মাসআলা বলবো কীভাবে?

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর তিনটি চমৎকার কথা

ইমাম সারাখসী (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর তিনটি কথা উল্লেখ করেছেন। সবক'টি কথাই বেশ চমৎকার। তন্মধ্যে প্রথমটি হলো যুগ-সচেতনতা বিষয়ক, যার আলোচনা একটু পূর্বে হয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) কে এক লোক জিজ্ঞেস করলো, আপনি এত কিতাব লিখেছেন কিন্তু–

لِمَ لَمْ تُحَرِّرْ فِى الزُّهْدِ شَيْئًا۔

'যুহদ' ও 'তাসাউফ' সম্পর্কে কোনো কিতাব লেখেন না কেন?

তিনি উত্তর দিলেন, আমার লেখা কিতাবুলবুয়ূ'ই কিতাবুয যুহদ।

তৃতীয় কথা হলো, আমরা আপনাকে অধিকাংশ সময় দেখি যে, হাসির কোনো চিহ্ন আপনার মুখাবয়বে নেই। সব সময় কেমন যেন চিন্তাক্লিষ্ট থাকেন-এর কারণ কী? তিনি উত্তর দিলেন–

مَا بَالُ فِىْ رَجُلٍ جَعَلَ النَّاسُ قَنْطَرَةً يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا۔

'ওই ব্যক্তির অবস্থা আর কী জিজ্ঞেস করবে, লোকরা যার ঘাড়কে পুল বানিয়ে তার ওপর দিয়ে চলাফেরা করে।'

আমরা চক্রান্ত গ্রহণ করেছি

আমাদের পূর্বসূরী আকাবির যুগের চাহিদা, দাবী, আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য, তার পরিভাষা এবং অন্যান্য বিষয় জানার প্রতি এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, যেন সেগুলোর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন, বুঝতে পারেন এবং সমাধান দিতে পারেন। কিন্তু আমাদেরকে যখন সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাজার-মার্কেট এবং অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচী থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রে তাদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দেয়ার পরিবর্তে আমরা তাকে গ্রহণ করে বসে আছি। সেটা এভাবে যে, আমরা আমাদের ইলম, বুদ্ধি, মেধা, চিন্তা ও গবেষণার গণ্ডিকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। এ গন্ডি অতিক্রম করার কোনো সুযোগ যেন আমাদের নেই।

এহেন পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়া ছাড়া আমরা দ্বীনকে জীবনের ব্যাপক পরিসরে প্রতিষ্ঠা করতে পারবো না কখনও। অর্থাৎ– যতক্ষণ না আমরা এসব আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সঠিক ধারণা এবং সেগুলোর সঠিক মূলনীতি ও বিধান হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সফলতা নেই।

গবেষণার ময়দানে উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব

সম্ভবত একথা বললে বাড়াবাড়ি হবে না যে, এ ব্যাপারে আমাদের কর্মকাণ্ড এতটাই অসম্পূর্ণ যে, আজ যদি আমাদেরকে বলা হয়, রাষ্ট্রক্ষমতা পুরোপুরি তোমাদের হাতে দেয়া হলো, তোমরা রাষ্ট্র চালাও। অর্থাৎ– প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মন্ত্রী পর্যন্ত এবং উর্ধ্বতন আমলা থেকে সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত সব তোমাদের লোক নিয়োগ কর। তাহলে বাস্তব কথা হলো, আমাদের বর্তমান অবস্থান এ পর্যায়ে নেই যে, এক/দুই দিন, এক/দুই সপ্তাহ, এক/দুই মাস কিংবা এক বছরে অবস্থার পরিবর্তন করতে পারবো। কারণ, আধুনিক বিষয় ও নিত্যনতুন উদ্ভূত মাসআলা সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং সে সম্পর্কে পড়াশোনা ও গবেষণা আমাদের নেই। আর যদি মাসআলা সম্পর্কে ধারণা ও গবেষণাই না থাকে, তাহলে তা কার্যকর করা কিভাবে সম্ভব? অতএব উলামায়ে কেরামের মনোযোগ এদিকে ফেরানো প্রয়োজন। এটা উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব এবং সময়ের অনিবার্য দাবী। কিন্তু মনোযোগ দেয়ার অর্থ এ নয় যে, মূল মাসআলার বিকৃতকরণ শুরু হবে। বরং উদ্দেশ্য হলো, এই সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিয়ে সঠিক ফিক্হী উসূল ও মূলনীতির আলোকে তার সঠিক সমাধান ও বিধান জাতির সামনে পেশ করতে হবে।

বিকল্প পথ দেখিয়ে দেয়া ফকিহর দায়িত্ব

একজন ফকিহর শুধু এতটুকু দায়িত্ব নয় যে, তিনি শুধু বলে দিবেন–অমুক জিনিস হারাম। বরং আমাদের পূর্বসূরী ফুকাহায়ে কেরামের কর্মনীতি হলো, তাঁরা যেখানে বলেছেন যে, এটা হারাম; পাশাপাশি এও বলে দিয়েছেন যে, এর বিকল্প হলো এটা। কুরআন মজীদে হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাঁকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে–

اِنِّىْٓ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ۔

'আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভী–এদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে।' (সূরা ইউসুফ-৪৩)

তখন তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলার পূর্বে স্বপ্নে যে ক্ষতির ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিলো, সেই ক্ষতি থেকে বাঁচার পথ বাতলে দিয়েছেন যে–

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًاۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِىْ سُنْۢبُلِهٖٓ۔

'তোমরা সাতবছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে, অতঃপর যা কাটবে, তার থেকে সামান্য পরিমাণ খাবে। তাছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষসমেত রেখে দিবে।' (সূরা ইউসুফ–৪৭)

একজন ফকিহ দা'য়ীও

একজন ফকিহ শুধু ফকীহ নন; বরং তিনি একজন দা'য়ীও। আর দা'য়ীর কাজ শুধু এতটুকু নয় যে, তিনি শুষ্ক আইনের কথা শুনিয়ে দিয়ে বলবেন–এটা হালাল আর এটা হারাম। বরং দা'য়ীর কাজ হলো, তিনি বাতলে দিবেন, এটা হারাম এবং এর বিকল্প হালাল পথ হলো এটি।

কেন আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস?

হালাল ও হারামের পার্থক্য নিরূপণ করে হারামের বিপরীতে হালাল ও বৈধ পন্থা দেখিয়ে দেয়া একজন দা'য়ী হিসাবে ফকিহর অবশ্য কর্তব্য। আর যতক্ষণ পর্যন্ত যুগ ও সময় এবং আধুনিক লেনদেনের জ্ঞান আমাদের না থাকবে, কর্তব্য পালন করা সম্ভব হবে না।

এ উদ্দেশ্যে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস এবং আজকের এ আয়োজন। আমরা উলামায়ে কেরামের খেদমতে আধুনিক লেনদেনের তাৎপর্য এবং পদ্ধতি বলে দিতে চাই। এ আধুনিক যুগে কোন্ কোন্ ব্যবসা-বাণিজ্য কী কী পদ্ধতিতে

কীভাবে হচ্ছে, আমরা এসব বিষয় তাদেরকে জনাতে চাই। এ চেতনা ব্যাপকতা লাভ করুক এবং আমাদের মহলে এ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা শুরু হোক-এটাই কামনা করি।

অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের পর...

এ ময়দানে আমাকে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পোহাতে হয়েছে। কারণ, আমি এ ময়দানে তখন পা রেখেছি, যখন কোনো আলেম পা রাখেন নি। নতুন অতিথির মনে যে রকম শঙ্কা থাকার প্রয়োজন, আমার মাঝেও সেটা ছিলো। নিত্যনতুন পরিভাষা, বৈচিত্রময় উপাস্থাপনা ও আধুনিক বর্ণনাভঙ্গিতে পরিপূর্ণ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থগুলো পড়ে প্রথম প্রথম কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু এত কিছুর পরেও অন্তরে একটা ব্যথা ছিলো, যে ব্যথায় তাড়িত হয়েই অনেক গ্রন্থ পাঠ করেছি, অনেকের মুখোমুখি হয়েছি। তারপর দীর্ঘ পড়াশোনার পর মোটামুটি কিছু বুঝে এলো। একটা সারসংক্ষেপ যেহেনে বসলো। সেই সারসংক্ষেপ থেকে তালিবে-ইলমরা উপকৃত হতে পারবে বলে আশা করা যায়।

একটি জীবন্ত উদাহরণ

একটি জীবন্ত উদাহরণ আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি, যার মাধ্যমে আপনারা এই প্রশিক্ষণকোর্সের গুরুত্ব, উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবেন। আজ যেমন আমরা এ প্রশিক্ষণ কোর্স করছি, তেমনি এর আগেও 'মারকাযুল ইকতিসাদিল ইসলামী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছি, যার অধীনে সম্প্রতি ব্যবসায়ীদের নিয়ে মসজিদ বাইতুল মুকাররম (গুলশান ইকবাল)-এ আমরা একটা প্রশিক্ষণকোর্স করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিলো হারাম-হালাল সম্পর্কে যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করানো এবং বর্তমানে যেসব আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে, শরয়ী মূলনীতির অধীনে থেকে সেগুলো কীভাবে পরিচালনা করা যায়-এর একটা রূপরেখা দেয়া। প্রথমবার যখন আমরা কোর্সের উদ্যোগ নিলাম, তখন অনেকে বলেছিলেন, আপনি করছেনটা কী? নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান পাঠ ছেড়ে এখানে কে আসবে? আমি উত্তর দিয়েছিলাম, যে কয়জনই আসুক, আমরা আমাদের কাজ করে যাবো।

লোকদের জযবা

তখন আমরা মাত্র একশ' লোকের আয়োজন করেছিলাম। এজন্য কোনো পোস্টার-বিজ্ঞাপনও করিনি। শুধু মৌখিকভাবেই বলা হয়েছিলো যে, এ জাতীয় একটা কোর্স হতে যাচ্ছে। এরপরেও দেখা গেলো, একশ' ষাটজন ব্যবসায়ী ফি